কালাপাহাড়

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র।

কালাপাহাড়

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা-গ্রহণ।

আমার পুথি লেখার চটার কলমটা কে নিলে? আমার কস কালির দো'ত টাও ত দেখছিনে। আমার গৌতম-সূত্রখানা কে কোথায় ফেলে দিলে? আমার সটীক সাঙ্খ্য-দর্শনখানা কে মাটিতে ফেলে দিলে? বেদান্তের পুথি খানা কে এলিয়ে ফেলেছে? আমার প্রতি এ অত্যাচার—এ অন্যায় কে করে? আগামী বৎসরের যে একখানা পাঁজি করেছিলাম, সে পাতা কয়টা কে নিলে? ভারি উপদ্রব, বড় অত্যাচার—এক সুশ্রী ব্রাহ্মণ-যুবক উচ্চরবে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন।

দাদা, হয়েছে কি? ঐতো সবপুথি চালির উপর সাজানই রয়েছে, দো'ত কলম ত কেহ নাড়েও নি। পাঁজি কি এখানে ছিল? মিছেমিছি এত চীৎকার ক'চ্ছ কেন?—এক বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী যুবকের গৃহে আসিয়া এই উত্তর করিলেন।

যুবক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"কি পুথি মুথি কেহ নাড়ে নাই? দো'ত কলম এদিকে ওদিকে ফেলে নাই? পাঁজি এখানে ছিল না? আমি মিথ্যাবাদী? বুড়ো খুন পাকা চুল চুলিয়ে, শাদা শাঁখা বাজিয়ে নড়া দাঁত নাড়িয়ে এসে এখন আমার কাঁধে লাগলেন।"

বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"না ভাই, তোমায় কি আমি মিথ্যাবাদী বল্‌তে পারি? তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রণা গুরু রাধামোহন। তোমার চীৎকারের অর্থ বুঝতে পার্‌লে, সেই কৃষ্ণকেশীকেই পাঠায়ে দিতেম। সে তার রাঙ্গা শাঁখা বাজিয়ে, মুক্তার মত দাঁত বের করে, আর বাক্যের সুধার স্রোত গড়িয়ে, তোমার এ জলন্ত আগুন একেবারে নিবিয়ে দিত।"

যুবক হাসিয়া পুনরপি বলিলেন—"বুড়ো খুন, তুমি এখন বিদায় হও।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমিত এখন বিদায় হ'ব। আমার ভুল হয়েছে। আমিত বুড়ো মানুষ, আমাব ভুল হতেই পারে; দাদা, তুমি এ যুবা বয়সেও বড় ভুল করেছ। আকাশের দিকে কি চেয়ে দেখ নি, আকাশে ওটি চাঁদ নয় সুয্যি। রাত এক প্রহরের পরিবর্ত্তে বেলা এক প্রহর হয়েছে। সে নবীনা সুন্দরী এখন তোমার ঘরে আসবে কেন?"

যুবা। খুন, তুমি এখন চুপে চুপে বিদায় হও। আর জালিও না। পার যদি, তবে বড় বৌ ঠাকুরুণকে পাঠিয়ে দেবে।

বৃদ্ধা। তা দাদা, আমি পূর্ব্বেই বুঝেছি। এ রাগ যে রাগ নয়, এ চীৎকার যে চীৎকার নয়, এ যে কেবল সেই সুন্দরীর আহ্বান, আত-

যদি বুঝ্‌তে না পারব, তবে আর আমার তিন কুড়ি আড়াই গণ্ডা বৎসর বয়স হয়েছে কেন? বড় বৌ এখন কাজ কর্‌ছে, সে হয়ত এখন আস্‌তে পারবে না। হুকুমটা একেবারে আমার উপর হলেই ভাল হ'ত না? আমিই নয় বিন্দে হয়ে যেতেম। না, না, আমি আর বিন্দে হ'তে চাইনে—এ যে দিনের বেলা, এখন সে আসামী গ্রেপ্তার কর্‌তে গেলে কিল চড় অনেক খেতে হবে। এ বড় বো'য়েরি কাজ—

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ যুবক সেই নির্জ্জন গৃহে ক্ষণকাল একাকী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবিলম্বে বহুমূল্য ভূষণ রাশি শব্দিত করিয়া, রূপরাশি বিকিরণ করিতে করিতে এক পরম সুন্দরী যুবতী এক শিশু পুত্র ক্রোড়ে করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের দ্বার দেশে আসিয়াই বলিলেন—"কি ঠাকুরপো, কি চাই, এত চেঁচাচেঁচি কর্‌ছ কেন?"

যুবা। বড় বউ ঠাকুরণ, তোমার মত বুদ্ধিমতী বউ এ বাড়ীতে আর একটিও নাই। আমি কি চাই, তাত তুমি অনেকক্ষণই বুঝেছ।

যুবতী। ঠাকুরপো একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছ। রাত দিন ভেদও এখন গেল? তোমার দূতী হ'য়ে গেলে অনেক কিল চড় খেতে হবে।

যুবক। তা বউ ঠাকুরণ, একাজ তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্‌তে পার্‌বে না। আমি বিশেষ দায় ঠেকে এসেছি, নৈলে এত বেহায়া হতেম না।

এই কথার পরেই যুবতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অপরা নবীনা যুবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রথমা যুবতী সেই গৃহের দ্বার দেশে আসিয়া বলিলেন—"আসামী গ্রেপ্তার করে এনেছি, বক্‌সিস্ চাই।"

যু। তা বক্‌সিস্ নিশ্চয়ই পাবে। বৌ-ঠাকরুণ, যে কাজ করলেন তাঁকে

আমার একেবারে কিনে রাখ্‌লেন। মেজো বৌ কি সেজো বৌ এ কাজ কিছুতেই করতে পারতেন না।

যুবতী। আমার চামড়া পুরু তাই পেরেছি। নবীনা যুবতীকে বলিলেন—"রাধে, এখন কুঞ্জে প্রবেশ কর, আমি বিদায় হই।"

যু। এ কুঞ্জ নয়, এ মন্ত্রণাগৃহ।

যুবতী। এ মন্ত্রণা গৃহই হোক, আর কুঞ্জবনই হোক, আর দেবী পূজার মণ্ডপই হোক, তা আর আমার এখন জানবার দরকার নাই; আমি এখন আসি।

ব্রাহ্মণ-যুবক নবাগতা তরুণীকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিয়া এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। যুবতী পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া অবগুণ্ঠণ উন্মোচন করতঃ বলিলেন—"লজ্জা সম্ভ্রমের মাথা একেবারে খেলে! এই বেলা এক প্রহরের সময় মিন্‌ষে ছুতনতা করে চীৎকার করছ। ছি, ছি, দিদীমা বুড়ো মানুষ, তিনি এলেন, তাঁকে কত দুর্ব্বাক্যি বল্‌লে। তার পরে কিনা বড় দিদিকে দিয়ে আমাকে ধরে এনেছ।"

যু। তা যাক, ওসব কথা কিছু মনে করো না। আমি বড় বিষম বিপদে পড়ে এসেছি। সে বিপদে তোমার পরামর্শ ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই। বেশ ভেবে চিন্তে এই ঘোর বিপদে তোমার উচিত পরামর্শ দিতে হবে।

যুবতী যুবকের বিপদের কথা শুনিয়া স্থির হইলেন। বায়ু-হিল্লোলে প্রকম্পিত হাস্যময় পদ্মের ন্যায় তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ-কমল ঈষৎ ম্লান হইল। তিনি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিপদের উপর আবার বিপদ? আমি পরামর্শ দিব, সে কি? কি হয়েছে শীঘ্র বল।"

যু। এই প্রাতে আমি গঙ্গাতীরের বৈঠকখানায় বসে তানপুরাটা বেঁধে লয়ে অল্প দুই একটা রাগিণী গেয়ে যেই ভৈরবী রাগিণীটা আরম্ভ

কর্‌ছি, অমনি দেখি নবাবের ভাইঝির এক বাঁদি একটি বড় তরমুজ আর একখানি বড় ছুরি নিয়ে এসেছে। আমি বাঁদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —ওকি? বাঁদি উত্তর করিল,—নবাবের ভাইঝি এই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যা হয় তাই করুন। আমি বাঁদিকে বলে এসেছি আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চারি-দণ্ডের মধ্যেই তাকে বল্‌ব।

যুবকের এই কথায় যুবতীর মুখ অধিকতর ম্লান হইল। তাঁহার আরক্ত নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"এতদিনে ঠাকুরদাদার গণনা ঠিক হ'ল। তিনি আমার কোষ্ঠী লিখ্‌তে যেয়ে, খানিকটে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, পিসিমাকে বলেছিলেন, যে এমেয়েটি পরম সৌভাগ্যবান্ পতির পত্নী হবে; কিন্তু স্বামীর সৌভাগ্যের ভাগিনী হবে না। এর জন্তে বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার দেব দ্বিজের প্রতি অত্যাচার হবে। ইহার স্বামী স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম-দ্রোহী হ'বে।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার হাজার বুদ্ধি থাকলেও তুমি মেয়ে মানুষ ও বালিকা। সকল তাতেই ভয়ে কেঁপে উঠ। আমার আবার সৌভাগ্য হবে? পৈতৃক সম্পত্তিটুকুও নষ্ট হ'ল; এত মাথা কোটা কুটি করেও দরবার পাচ্ছি না। তুমি আর অমূলক ভয় না করে, তরমুজ ও ছুরি পাঠানর তাৎপর্য্যটা কি বল।"

যুবতী। ছুরি ও তরমুজ পাঠানর তাৎপর্য্য আমার মাথা খাওয়া। নবাবের ভাইঝির চরিত্র ভাল নয়। তোমার ইচ্ছা হইলে তরমুজ-রূপা তাহার সহিত আলাপের রস তুমি আস্বাদন করিতে পার। ছুরি রূপ আলাপের উপায় সেই করিতেছে। তুমি যদি তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তরমুজটি চিরিয়া নিজে অর্দ্ধেক খানা রাখবে, আর বাকী অর্দ্ধেক খানা তার নিকট পাঠিয়ে দিবে।

যুবক। তরমুজ পাঠালে কেন? অন্য কোন ফল দিলেও ত পারৃত?

যুবতী। অন্য ফল কাটলে ত্ দিন পরেও খাওয়া যায়; তার ইচ্ছা তোমার সহিত শীঘ্র আলাপ করে।

যুবতী সাশ্রু নয়নে গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন।

যুবক রাঢ় দেশীয় এক ব্রাহ্মণপুত্র, নাম নিরঞ্জন। যুবতী সেই যুবকের ধর্ম্মপত্নী। প্রথমোক্তা বৃদ্ধা যুবকের মাতামহী। অপরা যুবতী রমণী যুবকের মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহধর্ম্মিণী। যুবক যুবতীর কথোপকথনের স্থান জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী তাণ্ডা নগরীর এক সুরম্য অট্টালিকার দ্বিতল-ভবন। যুবক যুবতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যুবতী যুবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শত শত মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন—"সাবধান, ও তরমুজ ও ছুরি স্পর্শ করিও না। মনে থাকে যেন, তুমি নবাবের অনুগ্রহ প্রার্থী; মনে থাকে যেন, অগ্রদ্বীপের কাজির সহিত তোমার বিবাদ। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ। অনেক হিতোপদেশপূর্ণ গ্রন্থও তোমার পড়া আছে। দুষ্কর্ম্ম কখন ঢাকা থাকে না। যে দুষ্কর্ম্ম আজ করিবে, কাল তাহা বাঙ্গালাব সকল লোকে জানিবে। বড় ঘরে চুরি করিলে, দুর্নাম বড় হয়ে রটবে। এ কাজ করলে আর নবাবের অনুগ্রহ লাভের আশা থাকবে না। ধন সম্পত্তিও গিয়াছে, জীবন রক্ষাও কঠিন হবে।"

সে কাল ও একালে অনেক প্রভেদ। আমরা প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ের যুবক কুমুদিনীকান্ত সকল সময়ে আপন ইচ্ছামত যুবতী পত্নী নগেন্দ্রবালাকে আহ্বান-পূর্ব্বক যথেচ্ছ কথোপকথন করিতেছেন। প্রাচীন কালে যুবক পতি তরুণী সহধর্ম্মিণীর সহিত দিবাভাগে কথোপকথন করিতে পারিতেন না। দাম্পত্য প্রেম চিরকালই আছে। দাম্পত্য প্রেমরূপ কুসুমের সৌরভ ও সুধা-

সম্ভার সকল যুবক যুবতী সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সে কালের সে সম্ভার অনায়াস-লভ্য ছিল না বলিয়া, অধিকতর স্নিগ্ধ ও মধুর ছিল। তখন লজ্জারূপ সুদৃশ্য যবনিকা সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চের পতিরূপ দর্শক ও পত্নীরূপ অভিনেত্রীর মধ্যে দিবাভাগে দোলায়মান থাকিত। তৎকালে পতিকে এক পথে আসিতে দেখিলে পত্নী পথান্তর অবলম্বনে ক্ষিপ্র গতিতে পলায়নপরা হইতেন এবং পতির ব্যবহারও বিপরীতরূপ ছিল না। তৎকালে দৈবাৎ দিবাভাগে পতিপত্নীর দর্শন মিলিলে উভয়ের মুখের হাসি চঞ্চল বিদ্যুদ্দামের ন্যায় উভয়ের মুখে প্রকাশমান হইয়াই লয় পাইত। সে কি মনোহর দৃশ্য ছিল! কি মধুর ভাব ছিল! সুন্দর ও মনোহর বস্তু অনায়াস-লভ্য হইলে তাহার মধুরতা ও মনোহারিত্বের হ্রাস হইয়া পড়ে। লজ্জা নরভবনের ভূষণ,—নর চরিত্রের উজ্জ্বল রত্ন। বিকসিত কুসুম বায়ুভরে দুলিতেছে, ষট্‌পদ তাহার মধু হরণ করিতেছে, পান্থ তাহার রূপরাশি দর্শন করিতেছে—এদৃশ্য সুন্দর বটে, কিন্তু একটি সুদৃশ্য গোলাপ গাছের পত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি সুদৃশ্য গোলাপ ফুটিয়া আছে, বায়ুভরে সে কাঁপিতেছে না; অলি তাহার মধু পাইতেছে না, পান্থ তাহার রূপ দেখিতেছে না, যে উদ্যান স্বামীর ধন, উদ্যানস্বামী যখন পত্র-সিংহাসনে সেই রূপের রাশি গোলাপ-রাণীকে দেখিলেন, তখন তাঁহার কত আনন্দ। সে ফুলের সৌন্দর্য্য কি অতুলনীয় নহে? বধূ লজ্জাশীলতার সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, পুত্র লজ্জাশীল ভাবে আপন কর্ত্তব্যে রত আছেন ও পিতা মাতা দূরে থাকিয়া পুত্র ও বধূর লজ্জাশীল কার্য্য-তৎপর মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। কথোপকথনে উৎফুল্ল পুত্র ও বধূর মূর্ত্তি দর্শন অপেক্ষা পিতা মাতার নয়নে প্রথমোক্ত দৃশ্য কি অধিকতর প্রীতিপ্রদ নহে? লজ্জা বঙ্গ-গৃহের অমূল্য ধন! অবগুণ্ঠনাবৃত লজ্জাবনত বাঙ্গালী বধূর মুখ-কান্তি জগতের অতুলনীয় দৃশ্য! বাহা হউক

সৌন্দর্য্যের রুচি সমাজভেদে পৃথক রূপ হইয়া থাকে। লজ্জার উপকারিতা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। লজ্জাই নিরন্ন বঙ্গ যৌথ-পরিবারের বন্ধনরজ্জু। লজ্জা দিবাভাগে দম্পতী-কলহের অন্তরায়। লজ্জা বধূর শ্বশ্রুমাতার সহিত কলহ করিবার পথের কণ্টক। লজ্জা শ্বশুর বা শ্বশুরপরিবারের অপর পুরুষ মণ্ডলের প্রতি বাক্য-বিষ-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার পথের অবরোধ। যত দিন বাঙ্গালা গৃহের বধূর মুখে অবগুণ্ঠন আছে, যত দিন বঙ্গ-বধূর স্বর মৃদু আছে, ততদিনই বঙ্গগৃহে শান্তি— মধুর একতা জনিত শান্তি। লজ্জায় কিছুদিন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের অন্তরায় হইতেছে, লজ্জায় কিছুদিন পিতা পুত্রের কলহ নিবারণ করিতেছে, লজ্জায় কিছুদিন যৌথপরিবারের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। লজ্জা, তুমি বাঙ্গালীর গৃহ ছাড়িও না, বাঙ্গালী বধূকে পরিত্যাগ করিও না, নিরন্ন বাঙ্গালী ভ্রাতার অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ নষ্ট করিও না। আবার বঙ্গগৃহ লজ্জার কুসুম-সুষমায় সুশোভিত হউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী বক্ষে।

এক খানি ক্ষুদ্র তরণীর সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান এক কৃষ্ণকায় পুরুষ সভয়ে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পশ্চাৎদিকের অপর একটি লোককে ডাকিয়া বলিল—"সদু, আয়, ঐ দেখ।"

সদু নিকটে আসিল। উভয়ে সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া এক আলোকিত বজরার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"তাইত বটে, সেই নিরঞ্জন ঠাকুরই। অত গহনা গাটী, কাপড় চোপড় যখন, তখন ওই নবাবের ভাইঝি হবে।"

প্রথম ব্যক্তির নাম নিত্যানন্দ ও দ্বিতীয়ের নাম সদানন্দ। তাহারা দুই ভাই, জাতিতে ধীবর। নিত্যানন্দ আবার চুপে চুপে বলিতে লাগিল—"উভয় সঙ্কট। সত্যি কথা না বল্লেও পরিত্রাণ নাই এবং সত্যি কথা বলতি গেলেও নিরু ঠাকুর বাধে। নিরু ঠাকুরের মত লোক কি কলিকালে হয়? যেমন রূপ, তেমনি কথা, তেমনি দয়া মায়া। সেদিন যার কাপড় ছিল না, পুঁটিমাছের মত একটা চক্‌চকে টাকা কোমর থেকে

ফেলে দিলে। তার কদিন পরে একটা কাতলা মাছ দিতে গেলাম, তাও ঠাকুর নিলে না; বল্লে মাছটি বেচে তোমার মাকে কিছু মিষ্টান্ন দেও গে। ঠাকুর বাড়ী বাড়ী ঘুরে কার কোন ব্যামো দেখলে তখনি ঔষধ এনে দেন। ঠাকুরের ছোট বড় জ্ঞান নাই, সকলকেই সমান দেখেন।

সদানন্দ। তা বল্লেই হ'লো খুব জাঁকজমকওয়ালা কাপড় চোপড়-পরা স্ত্রীলোকটা আম্‌রা চিন্‌তে পার্‌লেম না।

নিত্যানন্দ। কাজি কি কম বান্দা। সেই কথায় আমাদিগকে ছাড়‌বে? তার পরে আবার সোণায় সোহাগা মিলেছে। কালী বাড়ীর সেই সারভোম ঠাকুর কাজির সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সদানন্দ। বলি, নিরু ঠাকুর সারভোম ঠাকুরের কি করেছে? সে ঠাকুর কাজির সঙ্গে যোগ দিলে কেনে?

নিত্যা। তা জানিস্ নে? আগে সকলেই সারভোম ঠাকুরকে বড় পণ্ডিত বল্‌ত। সেদিন রায় বাড়ীর পুকুর পিতিষ্ঠার সময় নিরু ঠাকুর সারভোম ঠাকুরকে এমন নাস্তা নাবুদ করেছিল যে, সারভোম শেষে সভা ছেড়ে রেগে গালাগালি দিতে দিতে পালিয়ে গেলেন।

সদা। যেই হ'ক দাদা কথাটা সাদা ভাবে বলা হবে না। নিরু ঠাকুরকে বাঁচাবার জন্য কথাটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌তে হ'বে।

নিত্যা। তুই কোন কথা বলিস না। যা হয় আমিই বল্‌ব।

ধীবর নিত্যানন্দ ও সদানন্দ তাহাদের ক্ষুদ্রতরী ভাগীরথীর স্রোতের প্রতিকূল দিকে উত্তর তীরাভিমুখে চালাইয়া দিল।

অদ্য বাসন্তী ত্রয়োদশী। চন্দ্রমা মধ্য আকাশের কিছু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিমল জ্যোতিতে জাহ্নবী জল ও তৎ তীরবর্ত্তী শ্যামল তরুবল্লরীমালা উদ্ভাসিত হইয়াছে। শশাঙ্ক গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, ভূপতিত বক্রকুঞ্চিত রৌপ্যহারে

পার্শ্বভঙ্গ গোলাকার হীরকখণ্ড সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মলয়ানিল কুসুম-সৌরভ-সম্ভার অঙ্গে মাখিয়া বিচরণ কালে সেই অপূর্ব্ব হার সন্দর্শনে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেছেন কিন্তু ভুজঙ্গ সন্দেহে সাহসে কুলাইতেছে না। সঞ্চরণ কালে এক একবার পরীক্ষা করিতেছেন,—চন্দ্রমা-খচিত জাহ্নবী নির্জ্জীব হার কি সজীব কালফণিনী! তদীয় ভাব দর্শনে তরঙ্গদল নাচিয়া উঠিল—তাহারা নাচিতে নাচিতে ছপ্ ছপ্ ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে তীরাভিমুখে ছুটিল। পবন অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। জাহ্নবী-তরঙ্গের খেলায়, স্রোতের সঙ্গীতে, চিন্তাশীল দর্শকের শ্রবণসুখ উৎপাদন করিতে করিতে, নিজের শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া—মানবকে তদীয় জীবন-স্রোতের প্রবাহের গতি বুঝাইয়া দিয়া অবিরাম-গতিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন।

এই সময়ে জাহ্নবীর উত্তর তীরস্থিত তাণ্ডা নগরীর বাজারের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কালীমন্দিরের কিঞ্চিৎ দূরে বিকশিত পুষ্প-সমন্বিত বকুলতরু-শ্রেণীর নিম্নে বসিয়া দিগম্বর সার্ব্বভৌম ও অগ্রদ্বীপের কাজি মহাশয় ধর্ম্মতর্ক করিতেছিলেন। দিগম্বর কাজির সহিত একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একমত হইয়া হিন্দুর পৌত্তলিকতার প্রয়োজনীয়তা ও সারবত্তা সপ্রমাণ করিতেছিলেন। কাজি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কাজির তীব্র প্রতিবাদে দিগম্বর বিষন্ন চাটুকারের ন্যায় চাটুবাক্যে স্বীয় মত যুক্তিতর্কের দ্বারা পোষণ না করিয়া, কাজির কথায় "আজ্ঞা আজ্ঞা" করিতেছিলেন। সংসারের গতি সাংসারিক নর চিনিয়া লও। তোমার পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম, সত্যবাদিতা, যুক্তি, তর্ক উঠাইয়া রাখ। যদি সংসারে ভালভাবে চলিতে চাও—হাসিয়া খেলিয়া মিলিয়া মিশিয়া চলিতে চাও,—অপমান বিড়ম্বনায় ভয় কর—তবে ধীর স্থির ভাবে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও সত্যে জলাঞ্জলি

হিয়া প্রবল ব্যক্তির সহিত কার্য্যে বা কথোপকথনে অতি সতর্কতার সহিত চলিবে। আর যদি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রাজ শক্তিধর হন, তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে। তৃতীয়তঃ যদি ঐ রাজশক্তিধর নীচ বংশীয় ধর্ম্ম হীন লোক হন, তবে তাহাকে এই সংসার পয়োধির হাঙ্গর কুম্ভীর অথবা সংসার প্রান্তরের তীব্র বিষধর উরগম মনে করিবে। এই বিজিত বঙ্গে দিগম্বর হইতে পারিলেই নাসিকা কর্ণ সম্পূর্ণ রাখিয়া চলিতে পারা যায়। দিগম্বরের ব্যবহারের বিপরীতাচরণে শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় নাই। যদি আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চাও তবে আধুনিক রাজ সভায় বা বিচারালয়ে গমন কর; তথায় স্তাবক ও স্তুত্য দেবতা দেখিবে। স্তব দেখিয়া তুমি ঘৃণায় অধোবদন হইবে। ঐ দেখ, বিচারালয়ের বিচারাসনে বিচারপতি উপবেশন করিয়া আছেন। ব্যবহারশাস্ত্রোপজীবিগণ ও অপরাপর কর্ম্মচারিগণ কেবল তাঁহার স্তব করিতেছেন। তুমি শুনিয়াছিলে, বিচারপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, উচ্চশিক্ষিত, ধার্ম্মিক; এখন দেখিলে, সে সব আর কোথায়? বিচারপতি রাজশক্তিতে শক্তিধর, রাজদণ্ড বিধান তাঁহার অস্ত্র, তাঁহার ক্ষমতা অসীম, অপার। সংসারে ক্ষমতা কে না চায়? শতপতি সহস্রপতি হইতে চাহে এবং লক্ষপতি কোটীপতি হইতে চাহে। ক্ষুদ্র বিচারক শতপতি, তিনি সহস্র পতি হইতে এখনও ভিখারী। তিনি ক্ষমতার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। তাহার ক্ষুদ্র মান বাড়াইতে ব্যতিব্যস্ত। বিজিত বঙ্গবাসী সাবধান! বিচারপতি তোমার সজাতীয় হইলেও সুবিধা পাইবার আশা করিও না। এ অরণ্যে যে প্রবেশ করে, সেই ব্যাঘ্র। তোমার ন্যায়বুদ্ধি রাখ, তোমার সদসৎ প্রবৃত্তি ফেলিয়া দেও, জানু পাতিয়া নীচাদপি নীচ স্তাবকের ন্যায়, চাটুকারের ন্যায় রাজশক্তিধরের উপাসনা করিতে শিক্ষা কর। তোমার আছে কি?

ধর্ম্ম ন্যায় কে মানে? একদিকে রাজশক্তিধরের রাজশক্তি, অধীন কত লোক, পার্শ্ববর্ত্তী কত লোক, ক্ষমতায় অনুচর সহচর কত, তাঁহার পাশবাচারে, তাঁহার তরক্ষুসদৃশ লম্ফঝম্প ও দংশনের অনেক সহায় আছে, বিশেষতঃ রাজদণ্ড বিধান তাঁহার হাতে আছে। ভায়া, তোমার আছে কি? এই স্বার্থপর দেশে একতা নাই, মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি-পাত নাই, বিন্দুমাত্র স্বার্থ ত্যাগ নাই, আছে কেবল সারমেয়-ভাবে পদ লেহন বৃত্তি, পরস্পরকে দংশন বৃত্তি। বলি হতভাগ্য দেশের লোক একবার আপনাদের প্রতি আপনারা দৃষ্টিপাত কর। একবার স্ব স্ব মনের উচ্চতা ও পবিত্রতা পরীক্ষা কর।

এমন সময়ে একখানি সুসজ্জিত বজরার মধ্য হইতে অতি উচ্চ কণ্ঠে বেহাগ রাগিণীর সুললিত সঙ্গীত গীত হইতেছিল। কর্ণধার ও বহিত্র চালকগণ সঙ্গীত শ্রবণে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় উপবিষ্ট ছিল। বজ্‌রা গঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।

সঙ্গীত শ্রবণে দিগম্বর ও কাজি গঙ্গাতীরে আসলেন। বজরাখানি ভাল করিয়া চিনিলেন,—তাণ্ডার নবাবের বজরা। বজ্‌রা দেখিয়া জানিলেন, এই বজ্‌রা ও আর কতিপয় বজরায় নবাবের পীড়িতা ভ্রাতৃকন্যা হাকিমের ব্যবস্থানুসারে সলিল বাস করিতেছেন। তাঁহারা স্বরে বুঝি-লেন সঙ্গীত পুরুষকণ্ঠ-বিনিস্থত। তখন তাঁহাদের কৌতূহল হইল, নবাবের ভ্রাতৃকন্যার বজ্‌রায় কোন পুরুষ গান করিতেছে? দিগম্বর বলিলেন—"কাজি সাহেব, আমি স্বর চিনিয়াছি; কিন্তু বলিতে সাহস হই-তেছে না।"

কাজি। নির্ভয়ে বলুন।

দিগম্বর। এ নিরঞ্জনের স্বর।

কাজি হাসিয়া বলিলেন—"আপনাদের পুরাণে ও কাব্যে শুনি মৃত্যুর

পূর্ব্বে কংশ দশ দিকেই কৃষ্ণ দেখিয়াছিল। রাবণ সকল দিকেই রাম দেখিয়াছিল। নিরঞ্জন আজকাল আপনকার শত্রু, তাই তাঁকে সকল স্থানেই দেখিতেছেন।

দিগম্বর কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। অতঃপর কাজি-নিয়োজিত নিত্যানন্দ সদানন্দ যে বজরার তথ্য অবগত হইতে যায়, তাহা পাঠক অবগত আছেন। নিতাই যাহা বলিল, তাহাতে কাজি স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বজরা খানি তীরে আনয়ন করাই কাজি ও দিগম্বরের পরামর্শ স্থির হইল। অগ্রদ্বীপের কাজি সাহেব জলপথে তাণ্ডায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ছিপ ও প্রায় আড়াই শত যুদ্ধ কুশল সৈনিক পুরুষ ছিল। কাজির আদেশে দুই খানা ছিপে ৬০ জন সৈনিক পুরুষ বজ্‌রা বল পূর্ব্বক তীরে আনিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইল।

যখন দুই ছিপ যাইয়া নবাব-ভ্রাতৃকন্যার বজ্‌রার দুই পার্শ্বে উপনীত হইল এবং সৈনিকগণ বজ্‌রা ধরিল, তখন নিরঞ্জন নবাব-ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"নজিরণ! ঘোর বিপদ উপস্থিত। অগ্রদ্বীপের কাজি আমার পরম শত্রু। কাজি তাহার দুই খানি ছিপে অনেক সৈনিককে আমাকে ধরিতে পাঠাইয়াছে। তুমি অনুমতি করিলে আমি এখনও আত্মরক্ষা করিয়া পলাইতে পারি।"

নজিরণ। সে কি? কার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার বজ্‌রা হইতে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে? তুমি নির্ভয়ে বসিয়া থাক, আমি এখনই দুই ছিপের সৈনিকদিগকে তাড়ায়ে দিচ্চি।

নিরঞ্জন। নজিরণ, তুমি এখনও সংসারের সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞা বালিকা। তোমার নামে ও তর্জ্জনগর্জ্জনে ভয় করিলে এত সৈন্য আসিত না। তারপরে দেখ আমি কি গর্হিত কাজই করিয়াছি। তুমি

নবাবের ভ্রাতৃকন্যা, আমি নবাবের দয়ার ভিখারী; হৃতসর্ব্বস্ব দীন ব্রাহ্মণ সন্তান। তোমার বজ্‌রায় আমি কি সৎ কার্য্যইবা করিতে আসিয়াছি? তুমি তরুণবয়স্ক রমণী, আর আমি তরুণবয়স্ক যুবক। নিশীথ সময়ে বজরায় মিলন। সঙ্গীতও প্রেম গীত। নজিরণ, আমায় এখনও অনুমতি কর, আমি প্রাণ লইয়া পলাই।

নজিরণ। আমি যদি চাচাকে বলে তোমাকে সাদী করি, তবু কি তোমার আমার বিপদ ঘটিবে?

এই সময়ে নিরঞ্জনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নবাব-ভ্রাতুষ্পুত্রীর একটি সহচরী নিরঞ্জন ও নজিরণের হাত ধরিয়া বলিল—"এস তোমরা দুই জনেই এস, তোমাদিগকে এই বজরায় গুপ্ত কামরায় রাখিয়া দেই। ঐ দেখ সশস্ত্র সৈনিকগণ বজ্‌রায় উঠ্‌ছে। আমি একবার বলিয়া দেখি, সৈন্যদিগকে তাড়াতে পারি কিনা, যদি কথায় সৈন্যদিগকে তাড়াতে না পারি এবং সন্ধানে তোমাদিগকে বজ্‌রায় পাওয়া না যায় এবং যদি সত্য সত্যই বজ্‌রা কাজির নিকটে লইয়া যায়, তাহ'লে কোন বিপদ ঘটবার সম্ভব নাই।"

আর বাকবিতণ্ডা ও পরামর্শ করিবার সময় হইল না। সঙ্গিনী দুই জনকেই সেই গোপনীয় কক্ষে রাখিয়া নজিরণের উপবেশনের স্থানে আসিয়া উপাধানে বাম ভুজলতিকা বিন্যস্ত করিয়া সদর্পে উপবেশন করিল এবং বলিল—"তোরা কে রে আমার বজ্‌রায় উঠ্‌ছিস?"

সৈন্যগণ উত্তর করিল—"আমরা অগ্রদ্বীপের কাজি সাহেবের সৈন্য।"

কিঙ্করী। আমার বজ্‌রায় কেন?

সৈন্যগণ। কাজি সাহেবের হুকুম, বজরা তাঁহার কাছে নিয়ে যেতে হ'বে।

কিং। কি জন্য?

সৈন্ত। পাটলী গ্রামের নিরু বা রাজুঠাকুর নামে এক দুষ্ট বামন এই বজরায় আছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্ত।

কিং। হো—হো—হো! পাটলীর নিরু ঠাকুর বা রাজু ঠাকুর কেরে? এ বজরায় বামুন আস্‌বে কি জন্য? তোরা এ কার বজ্‌রা ঠাউরিয়েছিস'?

সৈন্ত। বেগম সাহেব! আমরা ছোট লোক, পরের গোলাম। আমরা কাজি সাহেবের হুকুম তামিল করতে এসেছি। আমাদের ঠাওর ঠোওর নাই। কি করবেন না করবেন, তা কাজি সাহেব জানেন।

সহচরীর চেষ্টা বিফল হইল। তরী সবেগে তীরাভিমুখে পরিচালিত হইল। নিরঞ্জন ও নজিরণ বজ্‌রার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নিস্তব্ধে রহিলেন।
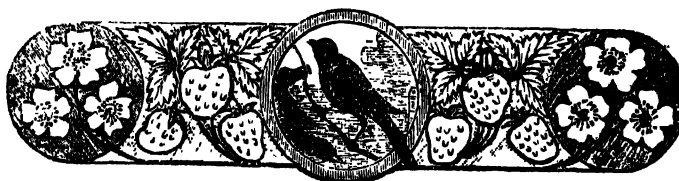
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী তটে।

অগ্রদ্বীপের কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবজ্‌রায় কে?"

সহচরী নির্ভয়ে উত্তর করিল—"তুমি কে?"

কাজি। আমি নবাবের অগ্রদ্বীপের কাজি।

কিং। তুমি জান এ বজরা কার?

কাজি। জানি, নবাবের ভ্রাতুষ্কন্যার।

কিং। তবে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে এস কেন? অতিথি হইয়া চোর ধরিতে এস কেন?

কা। নবাবের ঘরে—নবাবের নিমকের গোলাম তাই চোর ধরিতে আসি।

কিং। কাল তোমার কি দশা হ'বে জান?

কা। ইনাম মিলিবে।

কিং। কাল তোমার মাথা শেয়াল শকুনে খা'বে।

কা। তুই বেটী কে? বদমাইসী খেল্‌তে যেয়ে বড় আস্পর্দ্ধার কথা বলছিস যে?

কিং। আমি নজিরণ বিবির সহচরী আমিরণ। নবাবজাদির অপমান? তোর মাংসে শৃগাল কুকুরের উদর পূরণ করা বুঝি তোর বড় সাধ হয়েছে?

কাজি। তবে এ বজরায় নিরুঠাকুর আসে কেন?

কিং। নিরুঠাকুর কে? সে আস্‌বে কেন? গরমে টিকিতে পারিনা, তাই মন্দিগঙ্গা দিয়ে বজরা ছেড়ে দিয়ে আমরা ও খোজারা গান করেছি।

কাজি সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া বলিলেন—' কে মরে কে বাঁচে কা'ল দেখা যা'বে। আমরা বজ্‌রা তল্লাস করব।

এই কথা বলিয়া বজরার চারিদিকে সৈন্যগণকে সশস্ত্র রক্ষা করতঃ কাজি, সার্ব্বভৌম ও কতিপয় সৈনিক পুরুষ বজ্‌রার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বজরা অনুসন্ধানে নিরঞ্জন ও নজিরণকে না পাইয়া তাঁহারা ভীত ও বিস্মিত হইলেন।

কাজি বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আলো'চাল আর ক্যালা খেকো সারভৌম বাউনের কথায় এক বিষম বিপদ করলেম।"

সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন—"কাজি সাহেব ব্যস্ত হবেন না। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ বজ্‌রায় নিরঞ্জন আছে। এ বজ্‌রাখানি নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর। এর কোন গুপ্ত ঘর আছে, দুষ্ট সেখানে পালিয়েছে।

কাজি। এ বজ্‌রা নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর তা আমি জানি। যে সে ভ্রাতার কন্যা নহে, বঙ্গবিজেতা তাজখাঁর কন্যা। তোমার আমার ন্যায় লোকের এই বজ্‌রা কূলে আনা, এ বজরার মধ্যে প্রবেশ করা এবং এ বজরা সৈন্য দিয়ে ঘেরোয়া করা কি উচিত হ'লো?

সার। চোর ধরতে কি আমরা নবাব বাড়ী প্রবেশ কর্‌তে পারি না?

কাজি। চোর কোথায়? ধূমায়মান পর্ব্বত দেখে পর্ব্বতে আগ্নি আছে

ঠিক করা নয়। গান শুনলেই নিরঞ্জন এ বজরায় আছে—এ সিদ্ধান্ত অতি ভ্রমপূর্ণ।

সার। কাজি সাহেব ক্ষমা করবেন। আমার বাটী হ'তে কেলোকে ডেকে আনলেই চোর ধরা পড়বে। সে এ বজরার গুপ্ত ঘর জানে।

দিগম্বর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ভৃত্যের নাম কেলো। কেলো প্রভু-ভক্ত বিশ্বাসী কিঙ্কর। কেলোর তাণ্ডানগরীর সর্ব্বত্র গতি বিধি আছে। কেলোর বুদ্ধি কিছু কম কিন্তু সে পরিশ্রমী ও সর্ব্বজন প্রিয়। তাহার সঙ্গীতেও কিছু অধিকার আছে, কিন্তু তাল বোধ নাই। তাহার গুণ অনেক, কিন্তু দোষও দুই একটা আছে। তাহার প্রথম দোষ,—তাহাকে কেলো বল্লে সে বড় ক্রুদ্ধ হয়। তাহাকে কালাচাঁদ বল্লে উত্তর দেয় বটে, কিন্তু বড় সন্তুষ্ট হয় না। তাহাকে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তাহার দ্বিতীয় দোষ, তাহাকে বিবাহ দিতে চাহিলে তাহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। তাহার বিশ্বাস সে ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমান-তনয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। তাহার তৃতীয় দোষ,—সে কিছু ভীরু।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আদেশ ক্রমে এক জন সৈনিক পুরুষ তাহার অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন পূর্ব্বক কেলোকে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সম্বোধন করতঃ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল এবং একটি বিবাহের কথা হইতেছে বলিয়া তাহাকে তাহার অনুগামী করিল।

কেলো সৈনিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বজরায় আরোহণ করিল। সে এই বজরার নিকটে আসিয়া মধ্যে মধ্যে গান করিত এবং নর্ত্তকীগণের নিকট হইতে কিছু কিছু পুরস্কার পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিত। নর্ত্তকী-গণের যে সহচরীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার নাম আমিরণ। আমিরণ

ব্যতীত এই বজ্‌রার আর দুইটি সহচরী ছিল। একটির নাম ছবিরণ ও অপরার নাম জিজিরণ। জিজিরণ সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা ও সুন্দরী। আমিরণ মধ্যে মধ্যে রহস্য করিবার জন্য কেলোর সহিত জিজিরণের বিবাহ দতে চাহিত এবং গহনা গড়িতে বলিত। কেলো সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সার্ব্বভৌমের সহধর্ম্মিণীর নিকট গহনা গড়িবার প্রার্থনা করিত; কিন্তু সাহস করিয়া সার্ব্বভৌমের নিকট কোন কথা বলিত না। সৈনিক পুরুষ কেলোকে বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিয়া নিজে সশস্ত্র হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল।

বজরার যে প্রকোষ্ঠে নজিরণের সহচরীগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, কেলো সেই গৃহে অগ্রে গমন করিল। আমিরণ কেলোর হাত ধরিয়া চুপে চুপে বলিল—ঘোষ মহাশয়, জিজিরণ সঙ্গে এই রাত্রে তোমার বে হবে। গহনা যা পার দিও। এই বজরার গুপ্তগৃহে তোমার বাসর ঘর হ'বে। অগ্রদ্বীপের কাজি আর তোমার সারভৌম ঠাকুর সেই বাসর ঘর ও বে ভাঙ্গ্‌তে এসেছে। খবরদার, সাবধান, সে গুপ্তঘর দেখিয়ে দিলে বে হ'বে না।

কেলো আমিরণের এই কথায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আজ্ঞে, তা, তা আমি তা কিছুতেই দেখাব না। সারভৌম ঠাকুর বড় সয়তান, বড় বেল্লিক। সেদিন শিবনাথ শিরোমণি মশায় মা তাঁর বড় পৌত্রীর সঙ্গে আমার বে দিচ্ছিলেন আরকি,—তা ঐ বজ্জাত বামন ভেঙ্গে দিলে—কত গা'ল দিলে। মা ঠাকুরাণ ভাল, তাই বামুনের বাড়ী থাকি। তিনি মাসের মধ্যে দশটা সম্বন্ধ করেন, তা ঐ দুষ্ট বামুন ভেঙ্গে দেয়।

আমিরণ। তা যা হ'ক কথাটা যেন ঠিক থাকে।

কালা। আজ্ঞে—আজ্ঞে, তা খুব ঠিক থাক্‌বে।

এই কথার পরে জিজিরণ কেলোর দিকে তাহার আয়ত নয়ন ঘুরাইয়া হাসিমাথা মুখে বেশ দুটী কটাক্ষ করিল। কেলোর মাথা ঘুরে গেল,—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কেলো ধীরে ধীরে সার্ব্বভৌমের নিকট উপনীত হইল। সার্ব্বভৌম বলিলেন—বাবা কৃষ্ণচন্দ্র এসেছ, বেশ হয়েছে। কাজি সাহেব এই বজরার গুপ্ত ঘরটি দেখ্‌তে চাচ্ছেন, তুমি বাবা দেখিয়ে দেওত।

কেলো ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ভেঙ্গানের বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—"তুমি মাসের মধ্যে কেলোর দশটা বে ভাঙ্গ্‌বে, আর কেলো তোমাকে গুপ্ত ঘর দেখিয়ে দেবে। এ বে কিছুতেই ভাঙ্গ্‌তে দিচ্ছি না। এ বজরায় গুপ্ত ঘর টর নাই। সকল সময়ে কেলো, আর বে ভাঙ্গ্‌বার বেলায় বাবা কৃষ্ণচন্দ্র, মণি, সোনা, গোপাল, ধন কতই বলা হয়। যাও ঠাকুর যাও। এত রাত্রে এ বজরায় মর্‌তে এসেছ কেন?"

সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, নজিরণের সহচরীগণ তাহাকে বিবাহের কি মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছে। তিনি হাসি মাথা মুখে বলিলেন—"ঘোষজা, এত রাগ করছ কেন? শিবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গেই তোমার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌ব। আমি ভেবে দেখেছি, শিরোমণির মা অতি সাধু প্রস্তাবই করেছেন। দশভুজার বয়স একাদশ বৎসর হয়েছে। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি শিল্পকর্ম্মনিপুণা। আগামী বৈশাখ মাসেই শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর্‌ব।"

কা। যাও ঠাকুর যাও, তোমার আর উদ্বন্ধন হরিনাম ক্রিয়া কর্‌তে হ'বে না। আমার ক্ষমতা থাকে, ঘোষের বেটার বংশে, কুল, রূপ, গুণ থাকে, বে হ'বে, না হয় না হবে। তোমরা এখন বজ্‌রা হ'তে নেমে যাও।

সা। না হে বাপু না। উদ্বন্ধন নয়—উদ্বাহ; হরিনাম ক্রিয়া নয়,

পরিণয় ক্রিয়া; এসব বিবাহেরই প্রতিশব্দ। আমি বৈশাখ মাসেই তোমার বিবাহ দিব।

কা। হ্যাঁ—আমি আজকার বে ছেড়ে, বৈশাখ মাসে বে করতে যাব। আর কয় মাস পরে,—কতকালে—বশেখ মাস আসবে, ভাল দিন আসবে তবে বে করব! "কয় শুভঙ্কর মজুত গোণ" আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব না। ঘোষজা তত বোকা নয়। ঘোষ বংশ মহাবংশ বোস বংশ দাতা—ঘোষ বংশের লোকেরা তত বোকা হয় না। মুন্সিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র তত বোকা নয়। আমি চাঁদের পৃথিবীজোড়া আলো রেখে জোনাকী পোকার মিট্‌মিটে আলোর পিছনে ছুটছিনা। আমি সোণার রূপ যৌবন বাদসাহের ঘরের অলঙ্কার কাপড় ফেলে, এক ভট্টাচার্য্যি বামুনের ১১ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে আশায় বসে থাকৃচি না। তুমি আমার যেরূপ বিয়ে ভাঙ্গচো, তাতে বাবা যদি আমায় তোমার হাতে হাতে না দিতেন, আর মা ঠাকৃরুণ যদি ভালো না হতেন, তা হোলে মুন্সিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন দিন তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো। বিনা বেতনে দিবা রাত্রি তোমার বাড়ীতে খাট্‌চি, নেচে গেয়ে মজলিস মাতিয়ে যা পাচ্ছি, কুল মর্য্যাদায় যা পাচ্ছি, তা তোমার সংসারে দিচ্ছি; আর তুমি বেড়াও আমার বিয়ে ভেঙ্গে। আজকের বিয়ে ভাঙ্গা শক্ত কাজ; তাই বুঝি কাজি সাহেবকে সঙ্গী করেছ। সেনা সামন্তই আন, আর কাজি সাহেবকেই আন, আজ আর বিয়ে ভাঙ্গতে পারছ না। বিবি সাহেব রাজি আছে।

কালুর এই কথায় কি সার্ব্বভৌম কি কাজি উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, বজরায় গুপ্ত গৃহ আছে। বজরায় নিরঞ্জন আছে, সহচরীগণ বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া কেলোকে বাধ্য করিয়াছে।

কাজি জানিতেন, কেলো অতিশয় ভীরু। তিনি সৈনিক সম্রক্ষরাজ

খাঁকে ডাকিয়া বলিলেন—"সরফরাজ, তোমার বড় তরয়াল খানা দেও তো"। সরফরাজ অভিবাদন করিতে করিতে তরবারি দিয়া আবার পশ্চাৎ হাঁটিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাজি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন—"কেলো সারভোমের কথায় তুই বাধ্য হচ্ছিস না। এই তরবারি দিয়া আগে তোর এক একখানি করে হাত কাটব, তাতে যদি ঘর দেখাস, তবে তো প্রাণে বাঁচবি, তাতেও যদি না দেখাস, তবে তোর মাথাটা কেটে ফেলবো।"

কোষমুক্ত অসি বজরার দীপমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—উজ্জল দীপশিখা অসিতে ঝল ঝল করিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল—"কাজি সাহেব, আমি অতি ক্ষুদ্র লোক; ক্ষুদ্র চেয়েও ক্ষুদ্র লোক। আমায় বাপ নেই, মা নেই, কেউ নেইরে বাবা, এই বলিয়া উচ্চরবে রোদন করিয়া আবার বলিল—"এক জিজিরণ, এক বিবি জিজিরণ, সে রাখি পুন্নিমার চাঁদ, সে বসন্তকালের ফোটা গোলাপ, সে শরৎকালের পদ্ম, তা যদি বাবা তোমরা আমার ভাগ্যে লাভ হ'তে না দেও, তবে আমাকে কাটো, কাটো, একেবারে কাটো। আমি গুপ্তঘর দেখালে আমার বিয়ে হবে না। আজিরণ গুপ্তঘর দেখাতে মানা করেছে, জিজিরণ ইসারা করেছে।" আবার কাঁদিয়া—"কাজি সাহেব, বাবা, সেটা আমার বাসর ঘর বাবা, বাসর ঘর।"

কাজি সাহেব ও সার্ব্বভৌম কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন—"তুই গুপ্তঘর দেখায়ে দে, এখনই জিজিরণের সহিত তোর বিয়ে দেবো, ঐ বাসর ঘরেই তোকে রাখব। এই সৈন্যগণ বিয়ের বরযাত্রী হবে।"

কেলো। তা বিবিরা রাজি হবে না।

কাজি। বিবি সহজে রাজি না হয়, বলপ্রকাশে রাজি করব।

কে। সহজে রাজি—আর বল করে রাজি কি এক কথা?

তেমন হাঁসবে না, কথা বলবে না, কেঁদে কেঁদে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে।

কা। হো—হো—হো তা সব আমি করে দেবো। এই যে তরয়ালখানা দেখছো, এর কাছে সকলেই রাজি।

কে। তা যাই হ'ক আমায় ক্ষমা করুন। আপনারাই গুপ্তঘর দেখে নিন। আমি বলব না, এই বজরায়ই আছে। খুজলেই পাবেন, কেন বেচারাকে মজান।

কৃষ্ণচন্দ্রের এই কথার পর কাজি সাহেব তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক অসি লইয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কাটিবার উদ্যোগী হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্গুলি সঙ্কেতে গুপ্ত গৃহ দেখাইয়া দিল। গুপ্তগৃহে নজিরণ ও নিরঞ্জন উভয়েই ধৃত হইলেন। দুই শিবিকাযানে দুইজনকে আরোহণ করাইয়া, সার্ব্বভৌমের কালী মন্দিরের পার্শ্বস্থিত ভাণ্ডার গৃহে লওয়া ও বন্দী করা হইল। বন্দীগৃহের পাহারার বন্দোবস্ত হইল। বজরাও সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বন্ধন করা হইল। কাজি সাহেব ও সার্ব্বভৌম মহাশয় হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। নিরঞ্জনের পলায়নের প্রস্তাব নজিরণ গ্রহণ করিলেন না। নিরঞ্জনের বল প্রয়োগের পরামর্শ নজিরণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল না। নিরঞ্জনের বল বীর্য্য ব্যর্থ হইল। নিরঞ্জনের প্রত্যুৎপন্ন মতি ও অতুলনীয় সাহস আজ কুকর্ম্মের প্রভাবে পরাজিত হইল। আজ যেন ডিলেলার হাতে সেমসনের বিড়ম্বনার দিন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্দিগৃহে।

এই সময়ে দিগম্বর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কালীমন্দিরের সংস্কার কার্য্য হইতেছিল। ভাণ্ডার-গৃহ ও কালীমন্দিরের মধ্যের কপাট জীর্ণ হওয়ায় তাহা অপসারিত করা হইয়াছিল, কিন্তু নূতন কপাট আনিয়া তাহার স্থান পরিপূরণ করা হয় নাই। ভাণ্ডার গৃহে মূষিক, চর্ম্মচটিকা ও আরসলার চির নিবাস ছিল। অদ্য রজনীতে সেই গৃহে সুন্দর সুন্দর দুইখানা পর্য্যঙ্ক, উত্তম শয্যা ও দীপালোক সন্দর্শনে তাহারা বিষম উপদ্রব মনে করিয়া দলবদ্ধ হইয়া নবাগত ব্যক্তিদিগকে গৃহ-বহিষ্করণে যত্নবান হইল। মূষিকগণ বড় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল, চর্ম্মচটিকাদল দলে দলে উড়িতে লাগিল। আরসলাগণও পঙ্গপালের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল। প্রহরিগণ গৃহ মধ্যে শব্দ হইতে শুনিয়া গবাক্ষের ক্ষুদ্র পথে দৃষ্টি করিয়া দেখিল বন্দী ও বন্দিনী স্ব স্ব পর্য্যঙ্কে বাম করে কপোলদেশ বিন্যস্ত করিয়া চিন্তামগ্ন রহিয়াছে। গৃহের পূর্ব্বাধিবাসিগণই এই শব্দ উত্থাপন করিতেছে।

বহুক্ষণ নিরঞ্জন ও মজিরণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর নিরঞ্জন বলিলেন—

"আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, তোমার কথা শুনে ভাল হয় নাই। এই দেখ আমার সঙ্গে ছোরা রয়েছে ; ও কয়েকজন সৈন্য আর কাজি আমার কিছুই করতে পারত না।"

নজিরণ। আত্মরক্ষা করে পলাতে পারলেও নবাবের রাজ্য ছেড়ে কোথায় যেতে ?

নিরঞ্জন। ছদ্মবেশ ধর্‌তেম, ছদ্মবেশ ধরে হিন্দুর তীর্থে তীর্থে বেড়াতেম, আমারত কিছুই নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, ধনসম্পত্তি নাই, সবই অগ্রদ্বাপের কাজি হ'তে গেছে। যে কয় দিন বাঁচতেম দেশের কার্য্যেই জীবন পাত কর্‌তেম।

নজিরণ। তোমার কথায় আমি বিশ্বাস গেলেম না। স্বয়ং কাজি এক তরবারি লয়ে গুপ্ত গৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বজ্‌রার চারি-দিকে সশস্ত্র প্রায় ৫০ জন সৈনিক ছিল। এদের হাত ছাড়িয়ে গঙ্গা সাঁত্‌রে আত্মরক্ষা করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই।

নির। তোমার কথায় যে আমি ভীরু কাপুরুষের ন্যায় আমিষ পিণ্ডের মত ধরা পড়লেম, এই আমার আক্ষেপ। আমার ইচ্ছা ছিল, এই ছুরী আমার চিরশত্রু কাজির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিব।

নজি। তা তুমি পারতে না, কাজির সঙ্গে অনেক লোক ছিল।

নির। তুমি আমাকে চা'ল কলা খেকো খোলা কাটা বামনই মনে করেছ। আমি কাশীতে যখন ন্যায় বেদান্ত ও বেদ পড়ি, তখন কাশী-রাজের বাড়ীতে ভাল ভাল মল্লের নিকট কুস্তি, তীরন্দাজের নিকট তীর চালনা, অসিচালকের নিকট অসি যুদ্ধ, এমন কি আগ্নেয় অস্ত্রের পর্য্যন্ত ব্যবহার শিক্ষা করেছি ; আমরা যখন কাশীহ'তে পাঠ সমা-পন্ন করে বাড়ীতে আসি, আমরা ৮টি মাত্র ছাত্র। প্রায় তিনশত মুসলমান দস্যুতে আমাদের ঘেরাও করে। আমাদের হাতে কেবল

এক একখানি বড় লাঠী ছিল। আমরা সেই লাঠীর বলে তাহা-দিগকে হারিয়ে দিয়ে অনায়াসে জীবন রক্ষা করি।

নজি। তুমি হিন্দুর সকল শাস্ত্র পড়ে, বেদবেদান্ত পড়ে, অনায়াসে আমি মুসলমানের মেয়ে আমার সাঙ্কেতিক প্রস্তাবে সম্মত হ'লে কেন? তুমি কি হিন্দুর দেবদেবী মাননা? তোমার কি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস নাই?

নির। আমি হিন্দু ধর্ম্ম মানি, হিন্দু দেবদেবীতে আমার অচল অটল বিশ্বাস। আমি কোন দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। তোমার সাঙ্কেতিক প্রস্তাব আমি এক অত্যাশ্চর্য্য দৈব ব্যাপার মনে করেছি। আমি এক দরিদ্র নিরন্ন ব্রাহ্মণ, নিরা-শ্রয়, নিঃসহায়। তুমি নবাবের ভ্রাতৃকন্যা, বঙ্গবিজেতা তাজখাঁর কন্যা। নবাবের সমস্ত আদর, সমস্ত স্নেহ তোমার উপর। তুমি আমার ন্যায় নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণের সহিত কেন মিলনাভিলাষিণী এই জানা আমার বড় কৌতূহল। এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি তোমার তরমুজের অর্দ্ধেক রেখেছিলাম। তরমুজ রেখেও ভাবি নাই যে এত শীঘ্র তোমার সহিত দেখা হবে। তরমুজ রেখেও ভেবেছি, এ আমার সঙ্গে একটি পরিহাসমাত্র। তরমুজ রেখেও সিদ্ধান্ত করেছি, এ যদি তোমার পরিহাসও না হয়, তোমার সঙ্গে দেখা করে তোমাকে পরিতুষ্ট করব। তোমাকে পরিতুষ্ট ক'রে, আমার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার করব। তুমি সত্য সত্যই যদি আমার প্রেমাভিলাষিণী হও, তাহ'লে তোমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমায় ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে আমার ধর্ম্মবলে কোরাণের কথায় হ'ক, দর্শনের কথায় হক, তোমার মতি ধর্ম্মপথে ফিরিয়ে দিব। আমার যে কি কষ্ট, তাহা তোমায় বেশ ক'রে বুঝাইব। আমার বড় জমীদারের ন্যায় জমিদারী রক্ষার উদ্বেগও ছিলনা এবং গরিবের ন্যায় আমার অন্ন কষ্ট চিন্তা ছিল না।

আমার কয়েক খানা গ্রাম নিষ্কর ছিল। কয়েক খানা গ্রাম বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার অধীন তালুক ছিল, নগদ টাকাও কিছু ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় অনায়াসে বিনাক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে পার্‌তেম। অগ্রদ্বীপের কাজি বিনা অপরাধে আমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করেছে। আমার পৈতৃক বাড়ীতে তার সেনা-নিবাস করেছে। আমার দেবালয়-সকলে অখাদ্য পাক কর্‌বার ঘর করেছে। আমি এই পুরা তিন মাস তাণ্ডায় এসেছি। উজির ওমরাহের সহিত দেখা কর্‌ছি, সকলেই অর্থগ্রাহী সন্ন্যাসী, বচনে তুষ্ট হয় না। কোরাণের বয়াত মীমাংসার সিদ্ধান্তে কাহাকেও তুষ্ট কর্‌তে পারি নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহালে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করে, তাহাদিগকে হারিয়ে দেওয়ায় তাহাদিগকে শত্রু করে তুলেছি। কোরাণের বিচারে মুসলমান মৌলবিগণও আমার নিকট অনেকে অপ্রতিভ হইয়াছেন। তাঁহারাও আমাকে যে বড় ভাল দেখেন; এমন বুঝি না। হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যে অচল অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা আমার ক্রমে শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। কই, কোন দেবতাও আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন না। অবশেষে নিরপরাধে বন্দী হলেম। কাল আমার মস্তক শৃগাল কুকুরে ভোজন করবে।

এই বলিতে বলিতে নিরঞ্জন কাঁদিলেন। নজিরণও কাঁদিলেন। নজিরণ রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার পরিচয় আমি বেশ জানি। আমি জান্‌তেম তুমি পণ্ডিত ও গায়ক; কিন্তু যোদ্ধা বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না। যা হ'ক তুমি তত ভয় করোনা। চাচা হঠাৎ তোমায় আমায় একেবারে জহ্লাদের হাতে দিতে পারবেন না। আমি স্পষ্ট রূপে চাচাকে বল্‌ব, আমি তোমার গান শুনিবার জন্য তোমাকে আমার বজরায় এনেছি।"

নির। সে কথায় কি আর কোন সুফল ফল্‌বে? তুমি যুবতী, আমি যুবক। তোমার সহচরী কয়েকটি যুবতী রমণী, আর তোমার প্রহরী কয়েকজন খোজা। সময় রাত্রি। সার্ব্বভৌম ও কাজি কি ভাবে কথাটা দাঁড় কর্‌বে তারও ঠিক নাই। তারা দুই জনেই আমার পরম শত্রু, তুমি বাঁচলেও বাঁচতে পার; আমার সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা গিয়েছে, কাল আমার জীবনও যাবে।

নজি। আমার জীবন থাক্‌তে তোমার জীবন যাবে না; এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে আমার দোষে নষ্ট হ'তে দিবনা; তুমি জাননা, এরাজ্য আমার পিতার; ধন সম্পত্তি আমার পিতার; সৈন্যগণ আমার পিতার। আমার পিতার মৃত্যুতে সৈন্যগণের সন্দেহ যে না হয়েছে এমন নয়। অনেক বড় বড় সৈনিক পুরুষেরা আমায় বলেছে, আমার চাচাই আমার বাপজানকে খুন করেছে। আমার মার মৃত্যুও সন্দেহজনক।

নির। তোমার পিতার যদি গুপ্তহত্যা হয়ে থাকে, এই ছুতায় তোমার প্রকাশ্য হত্যা হ'বে। নবাব সুলেমান অতি চতুর, এখন [illegible] সকল উজির, আমির, সেনাপতি, সৈনিক সুলেমানের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর।

নজি। তারা চাচার কিঙ্কর, ভয়ে। আমার প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

নির। এ ঘটনা প্রকাশ হ'লে তারা কি মনে কর্‌বে?

নজি। আমি বল্‌ব আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য চাচার এও এক কৌশল।

নির। মিথ্যা কথা? জীবনের ভয়ে মিথ্যা কথা?

নজি। তোমার কি জীবনের ভয় নাই?

নির। আমার জীবনের ভয় নাই। আমি মরিতেও পারি, মারিতেও পারি। আমার আক্ষেপ, দেশের কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না; [illegible]

ভূমির কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না। আমার কষ্ট—বঙ্গের দুরবস্থা সমান থাক্‌ল। আমার ভয়—নিন্দার। যে নিরঞ্জন হরদেব ন্যায়রত্নের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, যে নিরঞ্জন কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলী-বিজয়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যে নিরঞ্জন হিন্দুর পরম সুহৃদ, সেই নিরঞ্জনের পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার কি প্রেমপিপাসু মুসলমানের যুবতীর গৃহে রজনীতে গুপ্ত প্রেমলিপ্সা? কা'ল জনসমাজে কি করে মুখ দেখাব? কি মনস্তাপ! কি আত্ম গ্লানি। দয়াময় হরি, এই কি তোমার মনে ছিল? শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! শিবশম্ভো! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মা! আর কত দুঃখ দিবি!

অপরিণাম দর্শীর পরিণাম এইরূপই বটে। আমি ফলাফল না ভেবে, হিতাহিত চিন্তা না করে, তোমার বজ্‌রায় উঠেছি। বালকের ন্যায়, পাগলের ন্যায়, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে পরিণামের দিকে দৃষ্টি করি নাই। এখন বুঝ্‌লেম, আমার ন্যায় অপরিণামদর্শীর এইরূপ আত্মগ্লানি, এইরূপ মনস্তাপ, এইরূপ কলঙ্ক হওয়াই উচিত। আমি যাহার অধিকারী তাহা পাইব, তাহাতে আর আক্ষেপ কি? কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া বাঁচিতে হয় মরিব, সেও আমার কর্ম্ম ফল। নজিরণ! তুমি যদি মর, তবে আমার বড় মনস্তাপ। আমি তোমা অপেক্ষা বয়সে বড়, অনেক দেশ দেখেছি, অধ্যাপককে আমার জন্য বহু পরিশ্রম কর্‌তে হইয়াছে, কিন্তু আমার যে কোন জ্ঞান হয় নাই, তা আজ জান্‌লেম। তুমি বালিকা, মুসলমানের অন্তঃপুরচারিণী; তোমার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। তুমি আদরের পুতুল, সোহাগের প্রতিমা। তোমার ভ্রম ক্ষমার যোগ্য। আমার দোষের প্রায়শ্চিত্ত নাই, দণ্ড বিধান নাই।

এইরূপে দুই জনে কত কথা হইতে লাগিল। কষ্টের সময়, দুশ্চিন্তার সময়, মনের চাঞ্চল্যের সময়, লোকে নির্জ্জনতা ভাল বাসে। কথা বলিতে

বড় ইচ্ছা করে না। নিরঞ্জন মৌনী হইলেন। নজিরণও নিস্তব্ধ থাকিলেন। উভয়ের সম্মুখেই চিন্তার দুস্তর পারাবার—ভয়ের ভীষণ মূর্ত্তি—জীবননাশের ঘোর আতঙ্ক। নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিলেন, কি করিতে আসিয়া কি করিলাম। দৈব প্রতিকূল, তাই বিনা পাপে কলঙ্কী হইলাম। জন সমাজে মুখ দেখাইবার পূর্ব্বে জীবনবায়ু দেহ পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া গেলেই ভাল হইত। যতক্ষণ রজনী আছে, ততক্ষণ জীবন আছে; কলঙ্কের রোল ঘোরনাদে প্রসারিত হইবার বিলম্ব আছে। নিরঞ্জন রজনীর তিমিরবাস ধরাপৃষ্ঠা হইতে অপসারিত না হইবার জন্যও শত বার ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখন পরলোক গত মাতৃমুখ, পিতৃশাসন, গুরূপদেশ, স্বজনের প্রশংসা মনে করিয়া শোক-দুঃখবিহ্বল বিকল চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কখন পথের ক্লেশ, দরবারের কষ্ট, আমির ওমরাহ প্রভৃতি বিজেতার পক্ষীর লোকগণের বিজিত পক্ষের লোকগণের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক পক্ষপাত ভাব মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হইতে ছিলেন ও তাঁহার রক্ত উষ্ণ হইতেছিল। কখন ভাবিতেছিলেন—এবার নিষ্কৃতি পাইলে ছদ্মবেশে রাজপুতগৌরব, হিন্দুর বল, অধ্যবসারের প্রতি মূর্ত্তি প্রতাপের নিকট গমন করিবেন এবং সেই হিন্দুরাজের সহায়তা লইয়া বঙ্গের মুসলমান অত্যাচার নিবারণ করিবেন। কখন ভাবিতে ছিলেন, মুসলমানের দ্বারা মুসলমান ধ্বংস করিব। হিন্দু দেব দেবী নাই। হিন্দুর পূজা উপাসনা বৃথা। মীমাংসার মীমাংসা, বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিণ্ময়, ন্যায়ের প্রতিপন্ন ঈশ্বর সকলই মিছা। বেদের উর্দ্ধাকাশ, মধ্যাকাশ ও ভূতলচারী ৩৩ দেবতা কেবল ভৌতিক পদার্থের ভ্রমসঙ্কুল উপাসনামাত্র। হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, দর্শন প্রভৃতির চিন্তা ভ্রমসঙ্কুল। পুরাণের উপাখ্যান কল্পনা মূলক তন্ত্রের উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ক্ষুদ্রমতি ব্রাহ্মণ সাধকের বীর সূত্র

বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। যদি নজিরণ ও আমি বাঁচি, যদি নজিরণের প্রস্তাবে নবাব সম্মত হন, তবে দোষ কি? আমি মুসলমান হইলে নাজিরণকে বিবাহ করিব। বঙ্গের সেনাপতি হইব। দুষ্ট দৈত্যের ন্যায় সমস্ত বঙ্গদেশ, বেহার, উড়িষ্যা লুটপাট করিব, অগ্নিময় করিব, তাহাতে আমার জীবন জ্বালাময় হইবে সত্য, কিন্তু হিন্দুর জাতীয় জীবন জাগ্রত হইলেও হইতে পারে। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবনও জাগ্রত না হয়, মোগলের দৃষ্টি বাঙ্গালার উপর পড়িবেই পড়িবে। মোগলে আর পাঠানে যুদ্ধ করিতে করিতে যে সময় হীনবল হইবে, তখন হিন্দুসূর্য্য প্রতাপ ভারতবর্ষের এক ছত্রাধিপতি হইতে পারিবেন।

নাজিরণ স্ত্রী জাতি, তাঁহার হৃদয়-কপাট খুলিয়া তাহার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করা কি সহজ হইবে? আচ্ছা থাকুক, এক্ষণে নজিরণের হৃদয় কন্দরে প্রবেশ নাই করিলাম।

নজিরণ দুইবার মুসলমান পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের ভজনা করিলেন। তাঁহার হৃদয় মন বহু পরিমাণে লঘু হইল। রমণী জাতি প্রত্যুৎপন্ন মতির খনি। জানিনা, হৃদয়ের লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য নজিরণ প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রসূতি কি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণনয়নে নিরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন তিনি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কখন অতি প্রফুল্লিতা হইতে ছিলেন, কখন একেবারে ম্রিয়মাণ হইতে ছিলেন।

মায়াবিনি নিদ্রে! তোমার মায়ায় সংসার মুগ্ধ। রজনী দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। শত সতর্কতা, সহস্র সাবধান বাক্যে কি হইবে, নিদ্রার মোহমন্ত্রে প্রহরিগণ মুগ্ধ হইয়াছে। কাহারও নেত্র ছোট হইয়া আসিয়াছে, কাহারও নয়ন কেবল মুদ্রিত হইল। কেহ বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রাচীরে অবনতি রক্ষা করতঃ নাসিকা শব্দায়মান করিতেছিল। সার্ব্বভৌমের

বিশ্বস্ত প্রাচীন ভৃত্য কালীমন্দিরের দ্বারদেশে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল। নিদ্রে! তুমি আজ নিরঞ্জন ও নজিরণকে পরিত্যাগ করিয়াছ কেন? তোমার অব্যাহত গতি, তোমার অসীম বল। তুমি রজনীর সহচরীরূপে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণা হইয়া বিষম যাদুমন্ত্রে তাহাদিগকে মুগ্ধ কর। তোমার অনুচর স্বপ্ন কত কুহকে জীবজগৎকে মুগ্ধ করে। নিদ্রে! তুমি শোকাতুরের শান্তি দাত্রী, তুমি বিপন্নের ক্ষণিক আশ্রয়দাত্রী, তুমি চিন্তাশীলের চিন্তাহারিণী, তুমি শ্রমশীলের শ্রমহারিণী। তোমার মোহ দেখিয়া মহানিদ্রার মোহের জন্য প্রস্তুত হইতেছি। পাপ কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়াও মহানিদ্রার অঙ্কে মস্তক রাখিবার সাহস করিতেছি। তোমাতে আর মহানিদ্রায় প্রভেদ কি? তুমি দৈনিক শ্রমের শান্তিদায়িনী, আর মহানিদ্রা জীবনব্যাপী শ্রমের শ্রান্তিহারিণী, তবে কেন মহানিদ্রার জন্য ভীত হইব? নিদ্রায় অল্প সময়ের জন্য স্বজনগণকে ভুলিতেছি; মহানিদ্রায় জানি না কত কালের জন্য স্বজনগণকে হারাইব। এখন কিসের, স্বজন কে? সংসারে কি স্বজন আছে? স্বার্থশূন্য স্বজন যদি পাও, তবে আর তুমি মহানিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইও না। সহধর্ম্মিণীর ক্রোধবঙ্কিম মুখ খানি কি মনে পড়ে? তনয়তনয়ার স্বার্থপূর্ণ চিবুকটি কি মনে হয়? ভ্রাতা ভগিনীর স্বার্থের আকর্ষণ টুকু কি কখন লক্ষ্য করিয়াছ? এসব যদি লক্ষ্য না করিয়া থাক, তবে মানব তুমি অমর হইয়া ইহলোকে বিচরণ কর,—মহানিদ্রাকে আর আহ্বান করিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুবতীর চেষ্টা।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। তিনি ত কখন রাত্রি এক প্রহরের বেশী বাহিরে থাকেন না। আজ কোন উজির আমিরের বাড়ী যাওয়ার কথা নাই। প্রাতঃকালে সেই বাঁদী তরমুজ আর ছোরা নিয়ে এসেছিল। আমার ভাগ্যের দুর্দ্দিনও নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। এপারের বাজারের কালী-বাড়ীর দিকেও বিষম গোলযোগ শুনেছি। তাঁর কি এমন অধঃপতন হ'বে? এত শীঘ্র অধঃপতন হ'বে? যিনি ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সমগ্র বেদে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন, যিনি জ্যোতিষ, গণিত, সাহিত্য অলঙ্কারেও সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, যিনি ক্রিয়া-বান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, তাঁহার সহসা অধঃপতন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার আমার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, যিনি আমার সহিত পরামর্শ না ক'রে কোন কার্য্য করেন না, যিনি দরবারে আস্‌বার কালেও আমার প্রার্থনায় সম্মত হ'য়ে আমায় সঙ্গে এনেছেন, তাঁর কি এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'বে? যিনি

বিনা অপরাধে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, যিনি মাতুলকুলের ব্যবহারেও সন্তুষ্ট নন, যাঁর অন্তরে ঘোর মনস্তাপের তুষানল ধুমায়মান হচ্ছে, তিনি কি রূপের মোহে ভুল্‌বেন? না—না—না, তা অসম্ভব। বাজারের গোল সব সময়েই আছে। এ সব গোলেও অন্যদিন কাণ দেই নাই। তা হতেও পারে। রূপের মোহ! কুহকিনীর কুহকজাল! কত যোগী ঋষির যোগ যাতে ভঙ্গ হয়, মহাযোগী মহাদেব যাতে উন্মত্ত হন, তাতে মানুষের মন টলতেই পারে। তিনি ইহাও ভাবতে পারেন যে, এই পিশাচীকে বাধ্য কর্‌লে, হয়ত তাঁর দরবার সিদ্ধ হ'তে পারে। যাই হ'ক, আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি না। আমার মত নারীর ক্ষুদ্র চেষ্টায় যা হ'তে পারে, তা করবই করব। যদি কোন চেষ্টাই না করব, তবে তাঁর সঙ্গে তাঁর আপদ স্বরূপ হ'য়ে জিদ করে কেন এলেম? নিরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী আপন নির্জ্জন গৃহে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর তিনি অধীরা হইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। নিরঞ্জনের মাতামহের বাসভবনের নিকট তারার মা নামে পরিচিতা এক বৃদ্ধা বাস করিত। তারার মা' দন্তহীনা বৃদ্ধা ছিল। যোগমায়া ঠিক তারার মাতার ন্যায় কথা বলিতে পারিতেন। যোগমায়া যখন সমবয়স্ক রমণীগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়া উপবেশন করিতেন, তখন তিনি তাহার স্বরে কথা বলিয়া এবং তাহার ন্যায় ঝগড়া করিয়া সমবয়স্কগণকে হাসাইতে পারিতেন। যোগমায়া রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি লোক যাইতে দেখিয়া, তিনি অন্ধকারে শরীর লুক্কাইত করিয়া তারার মার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বা—বা তুই কে যাস্‌রে?

যে যাইতেছিল সে উত্তর করিল—"আমি প্রেমচাঁদ।

প্রেমচাঁদ গ্রামের চৌকিদার ছিল।

যোগমায়া। বাজারে গোল হলো কেন রে?

প্রেমচাঁদ। বড় সর্ব্বনাশ! নিরঞ্জন ঠাকুর আর নবাবের ভাইঝি ধরা পড়েছে। কালী বাড়ীতে তাদের বন্দী করে রেখেছে। পাহারার খুব ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। একথা কাউকে বলতে মানা। তুমি বুড়ো মানুষ তাই তোমাকে বল্লেম।

যোগ। নিরঞ্জন ঠাকুর হ'ক আর নজিরণ বিবি হ'ক তাতে আমাদের বয়ে গেল। আমার তারা না ধরা পড়লেই বাঁচি। বাবা তুই বাড়ী যা।

এই প্রেমচাঁদের কথায় যোগমায়ার শিরে যেন সহস্র বজ্র পড়িল। তিনি দ্রুতবেগে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবে তিনি সহসা মতি স্থির করিলেন। তিনি দীনা, মলিনা ভৈরবীবেশে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণসহ বহির্গত হইলেন।

পথি মধ্যে দেখিলেন এক ক্ষুদ্র তরীতে দুই জন ধীবর মৎস্য ধরিতেছে। তিনি তাহাদিগকে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন। রমণী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অথচ গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীবর ভয়বিহ্বল চিত্তে নিকটে আসিল। যুবতী তাহার হস্তে পঞ্চ মুদ্রা দিয়া বলিলেন—"আমি কালীমার পূজা করি, ভৈরবী গঙ্গার দক্ষিণ পারে থাকি। একটি শবে উঠিয়া গঙ্গা পার হইতাম। সে শব এক্ষণে উদ্ধার হইয়া গেল। আজ আর পারের উপায় নাই। আমি মার পূজার পরে যখন ফিরে আস্‌ব, তখন যোগ মগ্ন থাকব, কথা বলব না। আমাকে গঙ্গার পরপারে নবাবের ভাইঝির বজরাগুলি যেখানে আছে, ঐ স্থানে নামিয়ে দেবে। আর মাছ মের না, তোমার পারিশ্রমিক দিলাম।"

ইতর শ্রেণীর ধীবর এক সঙ্গে পঞ্চ মুদ্রা পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। যুবতীকে ভৈরবী বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং তাঁহার কথা সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিল।

পাঠক সার্ব্বভৌমের ভৃত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত আছেন। বজরার গুপ্ত প্রকোষ্ঠ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে যখন জমিরণ ও নিরঞ্জনকে দেখা গেল, তখন সকলেই তাহাদিগকে বজরা হইতে অবতরণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। এই অবসরে কৃষ্ণচন্দ্র বজরা হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ পূর্ব্বক রাজপথের পার্শ্বস্থিত আম্রকাননে পলায়ন করিল। তিনি এতক্ষণ লুকাইত অবস্থায় আম্র কাননেই অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে সমস্ত গোলযোগ থামিয়াছে—রাজপথে জনমানবের সমাগম নাই; ইহাই স্থানান্তর গমনের সুন্দর অবসর মনে করিয়া সে রাজপথে আসিয়া উপনীত হইল। কৃষ্ণচন্দ্র নবীনা—ভৈরবীকে দেখিতে পাইল এবং ভৈরবীও তাহাকে চিনিলেন। যোগমায়া কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র জানিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভৈরবী বেশ ধারিণী যোগমায়াকে চিনিতে পারিল না।

ভৈরবী বলিলেন—"ঘোষ জা, তুমিত জান, আমি প্রতিদিন কালী মার পূজা করে থাকি। তোমার সার্ব্বভৌমের পূজায় কালীমা তুষ্ট নহেন। আজ নাকি কালীবাড়ীতে কি গোলযোগ, পাহারার বন্দোবস্ত; মার পূজার সম্বন্ধে তুমি আমার সাহায্য করবে? আমি মাকে ভাল করে বল্‌ব যাতে তোমার শীঘ্র বিয়ে হয়।"

আমিরণের কথাগুলি কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণে এখনও বাজিতেছিল। জমিরণের আয়ত নয়ন এখনও কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মা, আমি তা জানি। সার্ব্বভৌমের পূজা অর্চ্চা সব মিথ্যে। আপনি রাতে রাতে মাকে একটা ফুল দেন বলে, আজও সার্ব্বভৌমের ভিটায় ঘুঘু চরে নাই। মুক্তিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কে না শুনবে? আমি যাতে পারি, আপনাকে দিয়ে মার পূজা করাব।" পরে একটু মৃদুস্বরে কৃষ্ণচন্দ্র বলিল—"মা, আপনি কালী মাকে বলিবেন, যেন জমিরণের সঙ্গেই বিয়েটি হয়।"

মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, যিনি স্থান বিশেষে বড় ভীরু, তিনিই স্থান বিশেষে বড় বীর। যিনি যত চাটুকার, তিনিই তত অত্যাচারী। কৃষ্ণচন্দ্র স্থান বিশেষে বিশেষ ভীরু হইলেও কালীমন্দিরে তাহার অসাধারণ বীরত্ব। বিশেষতঃ এই পূজার সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ আছে; কৃষ্ণচন্দ্র এক বৃক্ষশাখা এক দণ্ডের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অগ্রেই কালী মন্দিরে গমন করিল।

অতঃপর যোগমায়া নজিরণের আবদ্ধ বজরার নিকট গমন করিলেন। তথায় গমন কবিয়া অঙ্গুলীশব্দ করিতে লাগিলেন। আমিরণ বড় চতুরা। নজিরণের তিন সহচরী নজিরণ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বজরায় বসিয়াছিল। অঙ্গুলী শব্দে তাহারা বজরার বাতায়ন পথে দৃষ্টিপাত করিল, এবং পূজোপকরণ ও পুষ্প পাত্রস্থ দুইটি মৃন্ময় শরাব মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে এক বিভূতি-মণ্ডিতা আলুলায়িত-কেশা কপালে সিন্দুরার্দ্ধলিপ্তা গৈরিক-বস্ত্রাচ্ছাদিতা ভৈরবীকে দেখিয়া আমিরণ তাঁহার নিকটে আসিল। ভৈরবী আমিরণকে চুপে চুপে বলিলেন—"কল্য নবাব জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, নজিরণ ও-বজরায় ছিলেন না। নিরঞ্জন ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এ বজরায় এসে গান করেছিলেন। তিনি আমাদিগকে ও খোজাদিগকে তিন মোহর সন্দেশ খেতে দিয়েছেন।"

আমিরণ। মোহর আমরা চাইনা। তিন মোহর কেন আমরা নবাবকে তুমি যা বল্লে, তাই বলে, পাঁচ মোহর দেখাব। তুমি কি তা পারবে?

যুবতী। যাইত। মা কালী আমার সহায় হবেন। যখন ভৈরবী পূজা করিয়া ফিরিয়া যাইবে, তখন দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম।

আমিরণ। আচ্ছা যাও। হেঁদুর জরুর কতদূর বুদ্ধি—কেমন সতী তা দেখব।

অনন্তর যোগমায়া দ্রুতপদে কালীমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া দেখিলেন কালীর পরিচারক স্বরূপ দ্বারে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে। মৃদু মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"স্বরূপ! আজ এখানে কেন?"

স্বরূপ নিদ্রোত্থিত হইয়া ভৈরবীর পদে লুণ্ঠিত হইল এবং ভয়বিস্মিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল"—মা! আপনি কে? এত রাত্রে!"

যোগ। বাবা! আমায় চেন না? আমি ত্রিপুরা ভৈরবী। আমি মার পূজা করি। তোমার দিগম্বর ঠাকুরত কেবল ফুল ছড়িয়েই ঘণ্টা বাজান আর চিনি কলা নৈবিদ্যি আর পাঁঠার মাথা বেঁধে নিয়ে বাড়ী পালান।

স্বরূপের এ কথায় বিশ্বাস হইল। সে দিগম্বরের উপর রুষ্ট। দিগম্বর তাহাকে চিনি কলার ভাগ অল্পই দিয়া থাকেন। স্বরূপ বলিল—"মা, তা সত্যি, ঠাকুর পূজা করে না। আমায় কিছু দেয় না। কিন্তু তা হলেও আজত আপনি পূজা কর্‌তে পারবেন না। ভাঁড়ার ঘরে বদমায়েস বন্দী আছে। বিশেষ দরজার চাবি আমার কাছে নাই।"

যোগ। বাপ, তাতে কি? শত বদ্‌মায়েস থাক্‌, তাতে আমার পূজার ব্যাঘাত হ'বে কেন? আমি পূজা না করলে মার পূজা হবে না, আমার দুই দিনের মধ্যে আহার হবে না। মার পূজা না হ'লে কি হয় তা ত জান। তোমারও ছেলেটা মেয়েটা আছে—মার ঘর খুলতে আমি যে চাবি লাগাব তাতেই খুলবে।

স্বরূপ এই কথায় ভয় পাইল। এমন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল। স্বরূপ চুপে চুপে ভৈরবীকে বলিল—"মা, পার ত দরজা খুলে তাড়াতাড়ি পূজা সেরে যাও।"

যোগ। তা যাচ্ছি। আমি ফিরে যাবার সময় কথা কহিব না, তখন আমি যোগমগ্ন থাকিব।

স্ব। ফিরে যাবার সময় আমায় মুখ দেখায়ে যাতে হবে।

যো। এখনও যেমন মুখ দেখ্‌ছ, তখনও তেমনি দেখ্‌বে। আমিত ঘোমটা দিবনা, তবে তখন চোকৃটা একটু বোঁজা বোঁজা থাক্‌বে এবং মুখটা যোগের বলে একটু হেঁট হ'য়ে যাবে।

স্বরূপ আর কথা বলিল না, দ্বার হইতে সরিয়া বসিল। যোগমায়ার নিকট অনেক চাবি ছিল; সম্ভবতঃ যে চাবিতে দ্বার খুলিবে, সেই চাবি তালায় লাগাইলেন। তালা খুলিয়া গেল। স্বরূপের বিস্ময় আরও বাড়িল। ভৈরবী কালীমন্দিরে প্রবেশ করিলে, স্বরূপ আবার শিকল টানিয়া দিয়া তালা লাগাইয়া দরজা ঠেসান দিয়া বসিল। ভৈরবী গৃহমধ্য হইতে বলিলেন—"আমি কথা কহিব না, তুড়ি দিলে দ্বার খুলে দিও।"

স্বরূপ উত্তর করিল—"যে আজ্ঞে।"

যোগমায়া পূজোপকরণ কালীর ঘটে ঢালিয়া দিয়া দীপ ও পুষ্পপাত্র লইয়া সেই কপাট হীন দ্বার দিয়া নিরঞ্জন ও নজিরণ যে ভাণ্ডার গৃহে আছেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ এক যুবতী ভৈরবীকে দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিরঞ্জন যোগমায়াকে চিনিয়া বলিলেন—"য়ঁ্যা—য়ঁ্যা তুমি।"

যোগমায়া উভয়কেই চুপ করিতে বলিয়া মৃদুস্বরে নজিরণকে বলিলেন—"ভগিনি, "তুমি শীঘ্র তোমার গহনা কাপড় ছাড়। আমার এই পরিচ্ছদে ভৈরবী সাজ। আমিই তোমাকে ভৈরবী সাজিয়ে দিচ্ছি। ভৈরবী সেজে দ্বারে যেয়ে তুড়ি দিবে। দ্বার খুলে দিলেই বেরিয়ে এই চাবিটা দিয়ে তালা বন্দ করে দেবে, তারপরে হেঁট মুখে চোক আদবোঁজা করে, এই পাত্র আর এই আলো লয়ে, বরাবর দক্ষিণ দিকে যাবে। সেখানে আমিরণের সঙ্গে দেখা হ'লে বল্‌বে, 'হয়েছে।' তারপরে আর কিছু দূর পশ্চিম দিকে যাবে। পশ্চিম দিকে যেয়ে একখানি ছোট

জেলের নৌকা দেখ্‌বে। সেই নৌকায় উঠ্‌বে। সেই নৌকায় উঠ্‌লেই তোমাকে তোমার বজরা গুলি যেখানে আছে সেখানে নামিয়ে দেবে। তুমি তীরে উঠে একটু এদিকে ওদিকে যাবে। তারপরে মাঝিরা অদৃশ্য হ'লে, এ সাজ পোষাক ফেলে দিয়ে, গা ধুয়ে আবার নজিরণ সেজে তোমার বড় বজরায় ঘুমিয়ে থাক্‌বে। কা'ল তোমার চাচা জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বে—"আমি নিরঞ্জন ঠাকুরকে চিনি না। বাঁদী আর খোজারা পাঁচ মোহর সন্দেশ খেতে পেয়ে, কোন ঠাকুর আর তার স্ত্রীকে এক বজ্‌রায় উঠিয়ে ছিল। ঠাকুর বড় ভাল গান করে, তাই বাঁদীদের আগ্রহে আমি একখানা বজরা দিতে হুকুম দিয়ে ছিলেম। পথে কারো সঙ্গে কোন কথা বলো না।"

নজিরণ ভৈরবী সাজিয়া ঈষৎ কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া যোগমায়ার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলেন। বলা বাহুল্য নজিরণ বুঝিলেন, নবীনা ভৈরবী নিরঞ্জনের ধর্ম্মপত্নী। নিরঞ্জন তখন নির্ভয়ে হাসিয়া বলিলেন—"ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার প্রতিভক্তি!"

যোগমায়া লজ্জিত হইয়া বিষয়ান্তরে কথা লইবার জন্য বলিলেন—দেখ দেখি, তোমার গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষমালা এনে ভাল করে ছিলেম কি না?

নির। তুমি বেমালুম ভৈরবী সেজে ছিলে; এখন তেমনই বেমালুম মুসলমানী সেজেছ। এখন হুকুম কর, কা'ল নবাবকে কি বল্‌তে হ'বে।

যোগ। এই এক প্রহর দেড় প্রহরের মধ্যে বুঝি নিজে হুকুম তামিল করে এখন সকলের কথাকেই হুকুম বল? দাসী আবার প্রভুর প্রতি হুকুম ক'রে থাকে কবে?

নিরঞ্জন এই কথায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার প্রতি সন্দেহ কর?"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন—"হাতে কলমে ধরা পড়লে—করব না কেন?"

নিরঞ্জন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। স্বামীর ক্লেশ দেখিয়া যোগমায়া মধুরস্বরে বলিলেন—"স্বামিন্! তুমি দেবতা, তুমি পরম পণ্ডিত। তুমি মল্লসমাজে প্রধান মল্ল। যোদ্ধৃমণ্ডলে তুমি অসাধারণ যোদ্ধা। তুমি কঠোর ব্রতে ব্রতী। কুহকিনীর কুহকজালে তোমার পা দিবার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তোমার অধঃপতন দাসী কখনই বিশ্বাস করবে না।"

এইরূপ স্বামী স্ত্রীতে অনেক কথা হইল ও অনেক রহস্য হইল। পরদিন নবাবের নিকট কি বলিতে হইবে তাহাও স্থিরীকৃত হইল। যোগমায়া পূর্ব্ব হইতেই কালীর পরিচারক স্বরূপকে চিনিতেন; কিন্তু স্বরূপ যোগমায়াকে চিনিত না। স্বরূপ প্রতিমাসে কালীর চাঁদা আদায় করিতে নিরঞ্জনের মাতামহ-গৃহে যাইত। স্বরূপের সহধর্ম্মিণী পুত্র কন্যার সহিত নিরঞ্জনের মাতামহের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকার পাইয়াছিল। সে রমণী স্বরূপের কত প্রশংসা করিত, এবং দিগম্বর ঠাকুরের সহস্র নিন্দা করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিত। সে প্রাচীন কালের কথা, বাস্তবিক তখন দেশে প্রকৃত হিন্দু ছিল, কালী মাতার প্রকৃত ভক্ত ছিল। তৎকালে তাণ্ডার কালীমন্দিরে ভক্তগণ প্রতি দিন বহু দ্রব্য দান করিত। দিগম্বর সকলই প্রায় নিজে আত্মসাৎ করিতেন। স্বরূপ অতি অল্পই পাইত। দিগম্বরের অসাক্ষাতে কালী বাড়ীতে কিছু পাইলে, সে ভাবিত—কালীমাতা তাহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে কিছু দিলেন। স্বরূপের কালীমাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পক্ষান্তরে দিগম্বর ভক্তিশূন্য, স্বার্থপর, সময়োপযোগী তোষামোদপরায়ণ ধূর্ত্ত ছিলেন। স্বরূপ দিগম্বরকে আন্তরিক ঘৃণা

করিত। স্বরূপ নিরঞ্জনকে চিনিত। সে নিরঞ্জনের দেবভক্তি, পাণ্ডিত্য ও বাক্‌পটুতার জন্য ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। স্বরূপের যত্নেই নিরঞ্জন সেই বন্দিগৃহে পৃথক্ পর্য্যঙ্ক ও উত্তম শয্যা পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইতিহাস।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যৎকালে যশশ্চন্দ্রমার বিমল আলোকে ভারতবর্ষ ও তাহার চতুঃপার্শ্বের দেশ সকল সমুদ্ভাসিত করিয়া মোগলবংশাবতংস, মুসলমানরাজকুলগৌরব, মহাতেজস্বী, মহামনস্বী বাদসাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া, বিশ্বাস ও সাধু ব্যবহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজন্যবর্গকে সখ্য ও বশ্যতা-পাশে বদ্ধ করিয়া এবং দুর্জ্জয় বিদ্রোহী মোগল-সেনাপতিগণকে কৌশলে পরাজিত করিয়া, সমগ্র ভারতবিজয়ের ঘোর দুন্দুভি বাজাইতেছিলেন, তৎকালে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার পূতবারি-বিধৌত শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে কিছু দিনের অরাজকতার পর সুকৌশল-সম্পন্ন বুদ্ধিমান সোলেমান কররাণি যে পাঠান রাজ্য সংস্থাপন করিয়া ছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই সময়ে প্রাচীন গৌড়নগর জ্বরে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। মালদহ, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলা এই সময়ে সেই জ্বরে জনশূন্য হইতে

ছিল। সুলেমান বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গার উভয় তীরে তাণ্ডানগরী সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তাণ্ডা নগরীতে নবাবের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর উত্তর তীরে তাণ্ডার বাজার ও ধনী মহাজনগণের বিপণি-বীথি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাণ্ডার অবস্থিতি ভূমি ভাল হওয়ায়, বহুদিন বঙ্গে অরাজকতার পর কথঞ্চিৎ শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায় ও সোলেমানের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যে তাণ্ডা সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া উঠিল। যে স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বনজ তরুলতার অভ্যন্তরে নানাজাতীয় বিহঙ্গকুল কূজন করিত, সেই স্থলে এক্ষণে গঙ্গার উভয় তীরে সুধাধবলিত সৌধমালা-বিরাজিত নগরী মধ্যে ক্রেতা, বিক্রেতা ও শ্রমজীবিগণের কোলাহলে পূর্ণ হইল ও গুণী, জ্ঞানী, শিল্পিগণ স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে লাগিল। এই সমৃদ্ধিশালিনী তাণ্ডা নগরী এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে। মোগল সম্রাটদিগের সময়ে সংস্থাপিত বর্ত্তমান রাজমহল নগর তাণ্ডা বিলোপসাধনের পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনুমান হয়, রাজমহলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বে তাণ্ডা অবস্থিত ছিল।

বঙ্গে অরাজকতার সময়ে সোলেমান কররাণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁ স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে একদল পাঠান সেনা গঠন পূর্ব্বক তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গৌড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল জয় করিয়া, নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন ও বঙ্গদেশের অনেক অংশ শান্তিময় করিয়া তুলেন। তাজ খাঁ স্বীয় সৈনিকগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং শাসন ও পালন গুণে তিনি প্রকৃতি পুঞ্জেরও সাতিশয় ভক্তিভাজন হইয়া উঠিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ সোলেমান তাজ খাঁর সহায় ও অতি বিশ্বস্ত ভ্রাতা ছিলেন। পরে যখন তাজ খাঁর যশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল এবং

লোকে তাজ খাঁকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন সোলেমান মনে মনে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভ্রাতার উচ্চপদ অধিকার করিবার জন্ম সোলেমানের লালসা হইয়া উঠিল। অনেকে সন্দেহ করেন, সোলেমান গোপনে বিষপ্রয়োগে ভ্রাতা তাজখাঁর নিধনসাধন করেন। সোলেমানও বুদ্ধিমান ও পরমকৌশলী ছিলেন। তাজখাঁর নিধনে গৌড়ের প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যগণ বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সোলেমান প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যগণমধ্যে বিদ্রোহিতার লক্ষণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ঘৃণাক্ষুব্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের ম্লান মুখ দেখিবার আশঙ্কায় রাজধানী গৌড় হইতে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং নানা উপায়ে সৈন্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান ভাব দেখাইতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃকন্যা নজিরণের প্রতি বড় আদর সোহাগ করিতে লাগিলেন। তাজ খাঁর স্ত্রী বা অন্য পুত্র সন্তান ছিল না। নজিরণ আহ্লাদের পুতুল হইয়া উঠিলেন।

সোলেমান নূতন নগরী নির্ম্মাণের পর বাঙ্গালা বিহারে সুদৃঢ় আধিপত্য সংস্থাপনান্তে মোগলগৌরব রবি বাদসাহ আকবরের সহিত সখ্য স্থাপনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট নানা উপায়ন পাঠাইলেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বাদসাহ আকবরও বিনা শোণিতপাতে পূর্ব্ব রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল দেখিয়া, পরম পুলকিত হইলেন। সোলেমান আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের অধীন বলিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু স্বরাজ্যে স্বাধীন বাদসাহ বলিয়াই ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মোগল-গৌরব-রবি আকবর এই সময়ে রাজপুত-কুল-গৌরব প্রতাপ সিংহের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের অধ্যবসায়, দৃঢ় [illegible], সহিষ্ণুতা, উদ্যম, উদ্যোগ কৌশল সন্দর্শনে তাঁহার বীর হৃদয়েও

ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল। পূর্ব্বাভিমুখে তাঁহার কোন অভিযান পাঠাইবার এ সময়ে কোন অবসর ও সুবিধা ছিলনা। অবমানিত ক্ষত্রিয় কুটুম্ব রাজা মানসিংহের মান বজায় করিবার জন্যই এ সময়ে আকবরের দৃঢ় পণ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইতে পারিলে, তিনি যে বিশেষ বল সঞ্চয় করিবেন ও লাভবান হইবেন ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাজ খাঁর কন্যা—সোলেমানের ভ্রাতৃকন্যা—নজিরণের বয়স পূর্ণ ষোড়শ বৎসর। তিনি অসামান্য রূপবতী ও আর্বি-পার্শি ভাষায় পরম বিদুষী। সঙ্গীতেও নজিরণের অসাধারণ অধিকার ছিল। নৃত্যেও তিনি অপটু ছিলেন না। ইদানীং জ্বর ও হৃদ্‌রোগে কাতর হওয়ায়, হাকিমগণের ব্যবস্থায় তাঁহাকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ ভাগীরথীর উপর বজরায় রাখা হইয়াছিল।

নজিরণ ভাণ্ডার নিকটে ভাগীরথী বক্ষে বজরায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তাঁহার সহিত আট খানা বজ্‌রা ও উপযুক্তরূপ সহচরী, পরিচারিকা ও ভৃত্যাদি ছিল।

সোলেমানের অধীনে বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত এক্ষণে যে অগ্রদ্বীপে বারুণীর সময় মহামেলা হইয়া থাকে তথায় নবাব-কর্ম্মচারী এক কাজি বাস করিতেন। অগ্রদ্বীপের নিকটেই পাটুলী গ্রাম। পাটুলী গ্রামে নিরঞ্জন ও সুধীরঞ্জন রায় নামে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের বাস ছিল। কোন কোন ইতিহাস লেখক নিরঞ্জনকে রাজু বা রাজকৃষ্ণ নামে নির্দ্দেশ করেন এবং কাহারও কাহারও মতে সুধীরঞ্জনের অপর নাম প্রাণকৃষ্ণ ও প্রভাত। নিরঞ্জনই পরে ইতিহাস বিখ্যাত কালাপাহাড় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জনের পৈতৃক সম্পত্তির কয়েকখানা গ্রাম নিষ্কর ও

কয়েকখানা গ্রাম সকর ছিল। তাঁহার পাকা দোমহলা বাড়ী ছিল এবং বাটীতেও কয়েকটি দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগ্রহ মূর্ত্তির নামানুসারে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক ছিলেন।

প্রথমে নিরঞ্জন গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তিনি নবদ্বীপে যাইয়া বিখ্যাতনামা পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র হরদেব ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায় ও জ্যোতিষ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শক্রমে মিথিলায় যাইয়া ন্যায়ের কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বারাণসী ধামে যাইয়া বেদান্ত মীমাংসা ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন। যৎকালে পাঠ সমাপন করিয়া নিরঞ্জন বাটী আসিলেন, তখন তাঁহাব ভ্রাতা সুধীরঞ্জন মিথিলায় ন্যায় পড়িতেছিলেন। নিরঞ্জন যখন গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তৎকালে দেশীয় প্রথানুসারে তিনি মৌলবীর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পারশিক ও আর্ব্বি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন, বেদে ও কোরাণে তাঁহার তুল্য অধিকার জন্মিয়াছিল। পশ্চিম দেশে বেদ পাঠকালে নিরঞ্জন মধ্যে মধ্যে মৌলবী দিগের সহিত বিচার করায় কোরাণাদির তাৎপর্য্য বিস্মৃত হন নাই। নিরঞ্জন বলিষ্ঠ ও সুশ্রী যুবক ছিলেন। তিনি মল্লযুদ্ধ, অসি ও তীর চালনা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। জেতা ও বিজেতার পার্থক্য তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিন্দুগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হইলে, মুষ্টিমেয় মুসলমান হিন্দুর ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে। কাশীতে অবস্থিতি কালে তিনি মল্ল সমাজে অনেক হিন্দুবীর চরিত্র অবগত হইয়াছিলেন। অনেক মুসলমান যোদ্ধৃগণের [illegible] দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, হিন্দুই মুসলমান

অপেক্ষা অধিকতর বলী। তিনি আরও ভাবিতেন, বিলাসিতায় মুসলমান-গণ দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে।

আধুনিক অপরিণামদর্শী অনেক যুবক ইংরাজ-রাজপুরুষগণের সহিত কলহ করিতে শঙ্কিত হয় না; রাজ-বিদ্রোহিতার আভাষ-পূর্ণ বক্তৃতা করিতে ভীত হয় না; সুযোগ পাইলেই, দুরন্ত অত্যাচারী, পাশব-প্রবৃত্তি, ইংরাজ নামের অযোগ্য, ইংরাজ-পশুর পীড়নে সন্তুষ্ট হয়; সংসার-জ্ঞান-পরিশূন্য হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য নিরঞ্জন কৃতবিদ্য হইলেও এবংপ্রকার দোষে দোষী ছিলেন। মুসলমান পর্ব্ব বকৃরিদ উপলক্ষে পাটুলীর এক আস্তানার ফকির সলিমসার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অনু-চরগণ গোহত্যা করিতে প্রস্তুত হয়। ফকির নিরঞ্জনের নিকট এই সংবাদ পাঠান। ফকির ও নিরঞ্জনে অনেক ধর্ম্মতর্ক হইত এবং উভয়ের মতেই জীব-হিংসা সঙ্গত নহে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। নিরঞ্জন কতি-পয় সমবয়স্ক যুবকের সজ্জিত লাঠী হস্তে যাইয়া গোহত্যায় বাধা দিলেন এবং ফকিরের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার আস্তানা (গৃহাদি) ভাঙ্গিয়া দিলেন।

ফকিরের অনুচরগণ ফকিরের নিষেধ না শুনিয়া তাহাদিগের অপ-মানের কথা অগ্রদ্বীপের কাজির নিকট জানাইল। কাজি নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সলিম সা ফকির, কাজির ক্রোধাগ্নি-নয়ন মানসে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। প্রথমে গোহত্যায় বাধাকারী হিন্দুগণকে ধরিবার জন্য পাইক পাঠান হইল। নিরঞ্জন ব্যতীত সকলেই কাজির নিকট হাজির হইলেন এবং জরিমানা দিয়া সকলেই নিষ্কৃতি পাইলেন। নিরঞ্জন পাইক প্রেরণে হাজির হইলেন না। একশত ঢালী সৈন্য যাইয়াও নিরঞ্জনকে ধরিতে পারিল না। আড়াই শত ঢালী সৈন্য এবং পঞ্চাশ অশ্বারোহী সৈন্য নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। নিরঞ্জন

অল্পসংখ্যক ঢালী সৈন্য ও পঞ্চাশটি মাত্র অশ্বারোহী লইয়া কাজির সৈন্য চূর্ণীভূত করিলেন। কাজির ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। রজনী-যোগে সহস্রাধিক সৈন্য নিরঞ্জনের ভবন আক্রমণ করিল; তিনি বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন। তাঁহার ভবনে কাজির সৈন্যের আবাস হইল। তাঁহার দেবালয় হইতে দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া সৈনিকগণের রন্ধন-শালা করা হইল। নিরঞ্জনের স্থাবরাস্থাবর সকল সম্পত্তি কাজি দখল করিয়া লইলেন।

নিরঞ্জনের ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণের এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই; নিরঞ্জনের এক বৃদ্ধা পিতৃষসা ছিলেন। তাঁহারও এই সময় মৃত্যু হইয়াছিল। নিরঞ্জনের এক খুল্লতাত ছিলেন; তিনি নিরঞ্জনেব পিতার আমল হইতে পৃথক্ অন্নে বাস করিতেন, এবং তাঁহার অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। নিরঞ্জনের সেই পিতৃব্য বিবাদের সূত্রপাত হইতেই কাজির পক্ষ সমর্থন করিতে ছিলেন। *বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে নিরঞ্জনের মাতামহের বাড়ী ছিল। মাতামহীব আগ্রহাতিশয়ে অতি অল্পবয়সেই নিরঞ্জনের বিবাহ হয়। বিবাহেব কথা দেশে বড় প্রকাশ ছিল না। নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশের পর তিনি তাঁহাব অধ্যাপক হরদেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাণ্ডায় গিয়া নবাব সোলেমানের নিকট দরবার করিতে পরামর্শ দিলেন।

* নিরঞ্জনের মাতামহ প্রথমে গৌড়ে একজন রেসম ব্যবসায়ীর সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মধ্যবয়সে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তাবলে গৌড়ে একজন রেসম ব্যবসায়ী হন। গৌড় হইতে নবাবের রাজধানী তাণ্ডায় স্থানান্তরিত হইলে, তিনি তাণ্ডায় আসিয়া রেসম ও অন্যান্য দ্রব্যের কারবার খুলিয়াছেন। নিরঞ্জনের মাতামহ দীননাথ মজুমদারের [illegible] বহু পৌত্র ছিল। দীননাথ এক্ষণে বৃদ্ধ। তাঁহার [illegible]

লেই স্বার্থপর হইয়াছিলেন। প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন, কিরূপে অধিক অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পৃথক হইয়া পড়িবেন। বৃদ্ধ দীননাথ পুত্র ও পৌত্রগণের অত্যাচার সহ্য করিয়া কোন মতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

নিরঞ্জন তাণ্ডায় যাইবার দিন স্থির করিলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী তাঁহার সঙ্গে যাইতে অত্যন্ত আগ্রহবতী হইলেন। ফকির সলিম সা. নিরঞ্জন সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ফকির হইলেও তাঁহার হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ ছিলনা জীবহিংসায় তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, এবং তিনি ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। সলিম ফকির হইলেও পরম যোগী ছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমান ভাবে ভক্তি করিত। সলিমও নিরঞ্জনের সহিত তাণ্ডায় যাইতে অভিলাষী হইলেন। নিরঞ্জন প্রথমে পত্নীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর ও ফকিরের পরামর্শক্রমে অগত্যা যোগমায়াকে সঙ্গে লওয়াই স্থির করেন। নিরঞ্জন, যোগমায়া ও সলিম সা তিনজনে কাটোয়া হইতে গোপনে নৌকাপথে তাণ্ডায় যাত্রা করিলেন, তাণ্ডায় আসিয়া নিরঞ্জন ও যোগমায়া নিরঞ্জনের মাতামহের বাটীতে উঠিলেন। দীননাথের পৈতৃক বাড়ী সোনামুখী হইলেও তিনি সপরিবারে তাণ্ডায় বাস করিতেন। দীননাথ নিরঞ্জনকে তাঁহার দৌহিত্র বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিলেন না ; কিন্তু তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত নিরঞ্জনের সম্পর্ক গোপন করিতে পারিলেন না।

সলিম সা ফকির, ফকির বেশেই নবাব-ভবনের নিকটে তাণ্ডার দক্ষিণ পারে বাস করিতে লাগিলেন।

যোগমায়া চরিত্রগুণে অল্পদিনের মধ্যে নিরঞ্জনের মাতুল-পুত্রগণের স্ত্রীদিগের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন ; মাতামহীর সোহাগের পাত্রী

হইলেন এবং মাতুলানীগণের নিজ নিজ স্নুষাগণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। যোগমায়া পাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাচিকা, জল-সংগ্রহে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা সুকৌশল-সম্পন্না বলিয়া প্রশংসা পাইতে লাগিলেন। বাটীর শিশু পুত্রকন্যাগণ তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ দীননাথ যোগমায়ার পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া পবিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মাতামহী মুক্তকণ্ঠে যোগমায়ার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যোগমায়ার এত প্রশংসা—এত আদর সত্ত্বেও সেই বাটীতে কেহ যোগমায়ার শত্রু হইলনা এবং কেহ তাঁহার হিংসা করিত না।

আমরা যে সময় হইতে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি, তখন নিরঞ্জনের তিন মাস তাণ্ডায় আসা হইয়াছিল। সোলেমান কররাণি অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বঙ্গেশ্বর ছিলেন, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত তাণ্ডা নগরীতে বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। বঙ্গেশ্বর মৌল্বী ও পণ্ডিতগণকে সমভাবে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার নব নগরীতে জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সকলেই বিশিষ্টরূপ উৎসাহ পাইতে ছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে নিরঞ্জন তাণ্ডায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন দলে দলে মৌলবীগণকে কোরাণের বিচারে ও পণ্ডিতগণকে সাহিত্য, দর্শন ও বেদের বিচারে পরাস্ত করিতে ছিলেন। গায়ক ও বাদকগণ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছিলেন।

নিরঞ্জন যে কেবল বিচার করিয়া নিবস্ত ছিলেন, তাহাও নহে। তিনি নবাবের সহিত দেখা করিবারও যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছিলেন। সেকাল ও একালে অনেক প্রভেদ। বিশেষতঃ নিরঞ্জনের প্রার্থনীয় বিষয় বড় গুরুতর। নবাব-সরকারের আমির ও উজিরগণ নিরঞ্জনকে

আশা দিয়া শুভ সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলেন। সোলেমান গুণগ্রাহী ছিলেন। নিরঞ্জনের বিচার করিবারও উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, নবাব তাঁহার গুণের পরিচয় পাইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের পথ সুপরিষ্কৃত হইবে। বাস্তবিক নবাবও নিরঞ্জনের গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এত দিন নিরঞ্জনের সহিত নবাবের দেখা হইত, কিন্তু তাহার এক অন্তরায় ঘটিয়াছে। নিরঞ্জন তাণ্ডায় সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন জানিয়া, অগ্রদ্বীপের কাজি কোন রাজকার্য্যের ব্যপদেশে কয়েক শত সৈন্যের সহিত তাণ্ডায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার কয়েক জন আত্মীয় নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক পক্ষে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ নিরঞ্জনকে অসাধারণ লোক বলিয়া নবাবের নিকট তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, অন্য দিকে কাজির পক্ষীয় নবাবের পার্শ্বচরগণ নিরঞ্জনকে রাজদ্রোহী, অত্যাচারী, মুসলমানদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিতে ছিলেন। এই কারণে সোলেমান নিরঞ্জনের সহিত দেখা করিতে ইতস্তত করিতেছেন।

সলিম সা ফকির নবাবের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মবলে নবাবের বেগম মহালেও তাঁহার অব্যাহত গতি হইয়াছে। সলিম কথাপ্রসঙ্গে বেগম মহলে নিরঞ্জনের গুণ ও নিরঞ্জনের প্রতি অগ্রদ্বীপের কাজির অত্যাচারের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। নিরঞ্জন সম্বন্ধে নবাব ও সলিমেও কথা হইয়াছে। সলিম বুদ্ধিমান। তিনি ধীরে ধীরে নবাবের মনের গতি নিরঞ্জনের অনুকূলে আনয়ন করিতেছিলেন।

নজিরণ যে নিরঞ্জনের জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে, সে কেবল নিরঞ্জনের সঙ্গীতে নহে। সলিম নজিরণের নিকটও নিরঞ্জনের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সলিমের ইচ্ছা ছিল, বেগম সাহেবা, সম্রাটের প্রিয় ভ্রাতুষ্কন্যা

নজিরণ ও নিজে—তিন জনে চেষ্টা করিলে, কাজির দলকে পরাস্ত করিতে পারিবেন এবং নিরঞ্জন অনায়াসে পুনরায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন। নজিরণের নিকটে নিরঞ্জনের গুণকীর্ত্তনে ফল ফলিল অন্যরূপ। তাঁহার যৌবন বন্যায় ভরানদী স্বীয় খাতেই প্রবাহিত হইতেছিল, তীর ভূমি অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল, তরঙ্গে নাচিতেছিল। সলিম সে নদীর নূতন খাত কাটিয়া দিলেন। নজিরণের প্রেম-বারি তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে অদম্য প্রবল বেগে সেই খাতেই প্রবাহিত হইল। সলিম! বড় ভুল করিলে। তুমি ফকির হইয়া যুবতীর মন কিরূপে বুঝিবে? তুমি নজিরণের বিমল মনোমুকুরে নিরঞ্জন-মূর্ত্তি বড় দৃঢ়রূপে অঙ্কন করিয়াছ। তাঁহার মনোমন্দিরের নিভৃত কক্ষে প্রেম-সিংহাসন এতদিন সম্রাট্‌শূন্য ছিল। তোমার কথায় সেই সিংহাসনে নিরঞ্জন সম্রাট হইয়া বসিলেন। দেখ, তোমার সদিচ্ছায় কি বিষময় ফল ফলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বকুল মূলে।

'অনেক ডাকাডাকি করলেম, চাবি খুলে দ্বারে ধাক্কা দিলেম, কিছুতেই বন্দী দ্বার খুলে দিলেনা।' কিছুকাল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, বন্দিগণ নাক ডাকিয়া ঘুমাচ্ছে। এক জানালা দিয়া দেখ্‌লেম, তাহারা এক খাটে শুইয়া আছে,—এই কথা গুলি কালীমন্দিরের পরিচারক স্বরূপ আসিয়া যুক্তকরে নবাব সোলেমান, অগ্রদ্বীপের কাজি সাহেব, দিগম্বর সার্ব্বভৌম ও চারি পাঁচটি নবাবের আমির উজিরকে জানাইল।

যে রাত্রিতে নিরঞ্জন বন্দী হন, সেই উষাতেই কাজি সাহেব নবাব সোলেমানের নিকট সংবাদ দিয়াছেন যে, পাটুলীগ্রামের সেই রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণ নিরঞ্জন নবাবের ভ্রাতৃকন্যা সরলমতি নজিরণকে কোন যাদু বলে মুগ্ধ করিয়া নবাবের কোন বজরায় তাহার সহিত রজনীযোগে আমোদ উল্লাস করিতেছিল। কাজি সাহেব ও দিগম্বর সার্ব্বভৌম ঠাকুর বহু কষ্টে ও বহু যত্নে সেই দুরাত্মাকে নজিরণের সহিত কালীমন্দিরে

বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। নবাব অনুমতি করিলে, তাহাদিগকে নবাব সদনে প্রেরণ করা হইবে। এই সংবাদে সোলেমান চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত উজির ও আমিরের সহিত কালীমন্দিরের নিকটস্থ বকুল তরুর মূলে আগমন পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়াছেন। স্বরূপের বাক্য শ্রবণে সোলেমান বলিলেন—"কাজি সাহেব ও সার্ব্বভৌম ঠাকুব! তোমরা বোধ হয় ভুল করেছ। দোষী লোকে নির্ভয়ে ঘুমাতে পারেনা। তোমরা নিরঞ্জনকে যত দোষী বল্‌ছ, আমি তত তার প্রশংসা শুন্‌ছি। সে পণ্ডিত, সে মৌলবী, তার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হবে না।

কাজি। জাঁহাপনা! মাপ্ কর্‌বেন, বোধ হয ভুল হয় নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

সার্ব্ব। খোদাবন্দ! ভুল করি নাই। সেই দুষ্ট আর ছোট বেগম সাহেবা।

সোলেমান। তোমরা কি নজিবণকে চেন?

নজিরণকে, চিনিলেও সার্ব্বভৌম ও কাজিব সাহসে কুলাইলনা। অসূর্য্যম্পশ্যা সম্রাটেব ভ্রাতৃকন্যাকে তাহাদিগের চিনিতে পাবা সঙ্গত নহে। তাহারা উভয়ে সমস্বরে বলিলেন—"আজ্ঞা, আজ্ঞা, তাত বড়—তবে কিনা, তবে কিনা, হুজুবেব খজরা কাপড় চোপড় গহনা গাঁটী অনেক দেখ্‌লেম।"

স্বরূপ এই অবসরে যুক্তকরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমারত সে হুজুরের ভাইজির মত ঠেকেনা। তাদের দুইজনের ভাব দেখে আমার বোধ হলো, ঠিক ঠাকুর ঠাকুরাণী, আমের গাছে শ্যামলতা। আজকালকার দিনে এই রাজধানীতে বাদসাহী ধরণে গহনা কাপড় অনেকেই কর্‌ছে। আমি ঠাকুরকে মানা কর্‌লেম, আমাদের ছোট লোকের কথা কি থাকে?"

বাস্তবিক স্বরূপ নিরঞ্জনকে ভাল বাসায় তাহাদিগকে বন্দী করিতে নিষেধ করিয়াছিল। স্বরূপের কথা শেষ হইতে না হইতে কৃষ্ণচন্দ্র বলিল—"আমি আমার ঘোষ বংশের দিব্য করে বল্‌তে পারি, সে আর কেহই নহে, সে নিরঞ্জন ঠাকুর আর তার পরিবার।"

অনন্তর বহুযত্নে নিরঞ্জন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। নবাব ও তাঁহার পার্শ্বচর, উজির ও আমিরগণ আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি রীতি-মত কুর্ণিস করিতে করিতে, প্রথমে হাস্যপ্রফুল্লিতমুখে সংস্কৃত আশীর্ব্বাদের শ্লোক ও পরে কোরাণের সুন্দর সুন্দর উপদেশ বাক্যগুলি পাঠ করিতে করিতে, সোলেমানের নিকটে আগমন করিলেন।

সোলেমান কহিলেন—"ব্রাহ্মণ যুবক! তোমার সুখ্যাতি ও অখ্যাতি দুই শুনেছি। আজ একি দুষ্কৃতির কথা শুন্‌লেম?"

নিরঞ্জন অতি বিনীতভাবে মধুরবচনে বলিতে লাগিলেন—"জাহাঁ-পনা! যাহা কিছু দুষ্কর্ম্ম করেছি, তাহা বঙ্গেশ্বরের দর্শন লাভে জীবন সার্থক করিবার মানসে করা হইয়াছে। আমি তিন মাস তাণ্ডায় আসিয়াছি, মহামান্য বঙ্গেশ্বরের দর্শনলাভের জন্য কত চেষ্টা করিতেছি। স্ত্রী, পুরুষ, উজির, আমির, ধনী, দীন কাহারও নিকট আমার প্রার্থনা জানাইতে ত্রুটি নাই। বিবি নজিরণের সহচরী আমিরণের নিকটও আমার প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ জানাইতেছি। গতরাত্রিতে আমিরণ বিবির পরামর্শক্রমে নবাবের বজরায় আমি আমার স্ত্রীর সহিত উঠিয়াছিলাম। আমিরণ প্রভৃতির মুসলমান পরিচ্ছদ বলিয়া আমার স্ত্রীকেও মুসলমান পরিচ্ছদ পরাইয়াছিলাম। আমিরণ প্রভৃতির অনুরোধে জাহাঁপনার বজরায় গানও করেছিলেম। এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি হুজুরের বজরায় উঠিলে একটা হৈ চৈ পড়িবে। আমি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া হুজুরের নিকট অভিযোগ হইবে। সেই অপরাধে

আমি ও আমার স্ত্রী বঙ্গেশ্বরের সকাশে নীত হইব। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে আছেন, একথা এখানে অনেকে জানেন না। স্ত্রীলোক সঙ্গে রাখা আমার অন্যতর অপরাধ হইবে। অবশ্য সকলে মনে করিবেন, আমি কোন কুল-ললনাকেই অধর্ম্ম পথে লইতেছি। আপনি বঙ্গেশ্বর, রাজ্যেশ্বর, প্রজারঞ্জক নবাব ও প্রকৃতিপুঞ্জের পিতা। আপনার নিকটে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে উপস্থিত হইতে আমি কোনরূপ লজ্জা ও অপমান বোধ করি না। দোষীভাবেও বঙ্গেশ্বরের সকাশে উপনীত হইতে পারিলে আমরা দুইজনে জানু পাতিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের প্রার্থনা জানাইতে পারিব। আমার কথায় জাঁহাপনা কর্ণপাত না করিলে, আমার স্ত্রীর কথায় দয়াবান হৃদয় অবশ্যই দ্রবীভূত হইবে এবং আমাদিগের প্রার্থনীয় বিষয় জানাইতে পারিব। নবাব দর্শন লাভ করা আমার ন্যায় লোকের পক্ষে সহজ নহে। সেই কার্য্য সহজ করিবার জন্য এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে গিয়াছি। জাঁহাপনা! আমি ব্রাহ্মণ যুবক বটে, এই দেখুন আমার শরীর বর্ম্মাবৃত, তদুপরে অন্য বেশ। আমার সঙ্গে অসি ও আগ্নেয় অস্ত্র দুইই আছে। আমি আতপ অন্নভোজী ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও, আমার বাহুতে এত বল আছে ও আমার অসি চালনায় এতটুকু কৌশল আছে যে, আমি কাজি সাহেবের দুই চারি শত সৈনিকের হাত হইতে আমার স্ত্রীর সহিত আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম। আমার বন্দী হওয়াই ইচ্ছা। বন্দী হইয়া নবাবের দরবারে হাজির হওয়াই আশা। আমার প্রার্থনীয় বিষয় আমি নিজে কিছুই জানাইব না। ঐ আমার স্ত্রী বঙ্গেশ্বরের নিকট সকল প্রার্থনা জানাবার জন্য কালীমন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।”

স্বয়ং নবাব সোলেমান কালীমন্দিরে আসিয়াছেন। নিরঞ্জন ও রাজীবলোচন বন্দী হইয়াছেন। অগ্রদ্বীপের কাজি ও দিগম্বর সার্ব্বভৌম এই

দুই ব্যভিচারীকে বন্দী করিয়াছেন। এই সময় এই জনশ্রুতি তাণ্ডার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। দলে দলে লোক কালীমন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। লোকে লোকারণ্য—বিষম জনতা। তাণ্ডার দক্ষিণ পারের লোকও গঙ্গা পার হইয়া কালীমন্দিরে আসিতেছে।

কুসংবাদে কয়জন লোকের মন আকৃষ্ট হয়? সংসার এতই পাপে ডুবিয়াছে, মানব মন এতই কলুষিত হইয়াছে যে, কুসংবাদে লোকের মন বড় আকৃষ্ট হয় ও কুদৃশ্য দেখিতে নরের বড় কৌতুহল। এ বিষম জনতা কেন? তাহারা সেই পাপময় দৃশ্য দেখিবে। কেমন করিয়া সেই পাপ মিলন ঘটিল, তাহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিবে। হয়ত, কেহ কেহ ধর্ম্মের পিচ্ছিল পথ হইতে পদস্খলিত কুমারীর শিরচ্ছেদেও দুষ্ট হইবে ও ব্রাহ্মণ সন্তানের দণ্ড বিধানে সন্তোষ লাভ করিবে। ছি, ছি জনতা! ফিরিয়া গৃহে গমন কর। পাপ দৃশ্য দেখিতে এত ব্যগ্র হইও না। এ দৃশ্য দেখিতে লজ্জা বোধ কর। কেন পরকে লজ্জা দিতে এত ব্যস্ত হইতেছ? একবার নিজের মন নিজে পরীক্ষা কর। এই পাপ উপলক্ষে নিজের প্রবৃত্তিগুলির শক্তির পরিচয় লও।

এই সময়ে লোহিত-রাগ-রঞ্জিত বিভাকর-দেব পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইয়া রজত ধবল বালকিরণে ধরিত্রীপৃষ্ঠ রজতময় করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্ত-পবন জাগিয়া উঠিয়াছেন। গঙ্গায় তরঙ্গকুল পবন-হিল্লোলের সহিত তালে তালে নাচিয়া ছুটিতেছে। তরুশিরে বিহঙ্গকুল সঙ্গীত ধরিয়াছে। কুসুমকুল শিশির-মুক্তামালা পরিত্যাগ করিয়া নবীনা যুবতী দলের ন্যায় অঙ্গ ঝাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। প্রকৃত প্রেমিক দলের ন্যায় ষট্‌পদকুল গুন্ গুন্ করিয়া সঙ্গীতরবে পুষ্পসুন্দরীগণের মন উচাটন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বকুল ফুল শ্বেত বসন উড়াইয়া দিয়া পবনগতির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

পলাশ-সুন্দরীগণ বাসন্তী রঙ্গের বসন পরিয়া তরুশিরে হেলিয়া দুলিয়া যেন গর্ব্বের হাসি হাসিতেছে। তদ্দর্শনে রক্তবর্ণ কিংশুক-বস্ত্র-মণ্ডিতা শাল্মলী পুষ্প সুন্দরীগণ মৃত্তিকায় বদন লুকাইতেছেন। নীলাম্বরাবৃত-দেহা অপরাজিতা পত্রপুষ্পের অন্তরালে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া এই রহস্য অবলোকন করিয়া কৃষ্ণরাগ রঞ্জিত দশনপংক্তি বাহির করিয়া অল্প অল্প হাসিতেছেন। এমন সময়ে স্থলপদ্মিনী বয়োধিকা প্রৌঢ়ার ন্যায় গোলাপী বসন পরিয়া তরুশির হইতে বায়ু ভরে শিরঃকম্পনচ্ছলে যেন সকলকে বলিলেন—"যা লো যা, বসনভূষণের আবার গর্ব্ব কি? বসনভূষণে যদি গর্ব্ব থাক্‌ত, তবে বল্ দেখি ময়ূরের কাছে হেঁট মুখ নয় কে? গুণের আদর, ধর্ম্মের মান বড়।" এই কথায় শ্বেতবসন গন্ধরাজ যেন একটু হৃষ্ট হইয়া মাথা দোলাইয়া মল্লিকা সুন্দরীকে বলিল—"দিদি, যা বল্লে তা ঠিক।" কামিনী হাসিয়া খিল খিল করিয়া বলিল—"ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

জনতা বড় বাড়িয়া উঠিল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কোলাহলে নিকটবর্ত্তী দুইজনের কথাও পরস্পর শুনিতে পাইল না। তখন নিরঞ্জন ভূতলে জানু পাতিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন—"জাহাঁপনার অনুমতি হইলে, আমার ধর্ম্মপত্নী তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে আসিতেন। আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় অনেক আছে। আজ যদি সুপ্রভাত হয়েছে, জাহাঁপনার দর্শন লাভ ঘটেছে, তবে আজ সকল দুঃখের কথা নিবেদন করব।

সোলেমান একবার সেই সুবৃহৎ জনতার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। একবার আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিলেন ও একবার আরক্তনয়নে অগ্রদ্বীপের কাজি ও সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি কাজটি বড় ভাল কর নাই। তোমার কাছে আমার মান সম্ভ্রম লইয়া টানা টানি পড়িবে। নজিরণের নিকলঙ্ক

চরিত্রে কলঙ্কের রেখা পড়িবে, যাই হউক তোমার কর্ম্মের বিচার পরে হইবে। তোমার প্রার্থনা পরে জানিব. জাত্ মান সকলেরই আছে। স্ত্রীজাতির সম্মান সকলেরই করা উচিত। তুমি যা করেছ, সদুদ্দেশ্যে, স্বার্থ সিদ্ধির মানসেই করেছ। তোমার স্ত্রীকে জনতার মধ্যে আনা উচিত নয়। তিনি নারী, আমার মাতৃস্থানীয়া। আমি তাঁহার নিকট যাইয়াই তাঁহার বক্তব্য বিষয় জানিতেছি।"

এই কথা বলিয়া নবাব সোলেমান সহচরগণের সহিত কালী-মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। প্রহরিগণের নিষেধ না মানিয়া, জনতাও কালীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বের পরামর্শানুসারে যোগমায়া কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া জানু পাতিয়া গললগ্নীকৃতবাসা অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে যোগমায়া বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ! সম্রাট, মহারাজ,আমার লজ্জা সম্ভ্রম কিছুই নাই। আমরা পথের ফকির হইয়াছি। রাজপথে দাঁড়াইয়াছি। আমাদের লজ্জার সময় অতীত হইয়াছে। আমার পতির ঘর নাই, বাড়ী নাই, দেবমন্দির নাই। তিনি পথের ভিখারী ও আমি ভিখারিণী। নিশীথসময়ে আমাদের বাড়ী লুট হয়। আমরা কোন মতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করি। আমরা পাটুলীতে থাকিতে পারি নাই, দেশে স্থান হয় নাই। আমাদের অতিথিশালা এক্ষণে গোশালা, অশ্বশালায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের বাড়ী এক্ষণে সেনানিবাস হইয়াছে। আমাদের দেবালয়ে এক্ষণে হিন্দুর অখাদ্য কুক্কুট ও গোমাংস রন্ধন করা হইতেছে। হায়! হায়! আমাদের যে ঠাকুর-বাড়ীতে ত্রিসন্ধ্যায়, শঙ্খ ঘণ্টা, মৃদঙ্গাদির বাদ্যোদ্যম হইত, গায়কদলের সুললিত সঙ্গীত হইত; আরতির সুরভি গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইত, এক্ষণে সেখানে কি হাহাকার হইতেছে! গোপাল! গোবিন্দ তোমরা কোথায় গেলে?

দেবালয়ের সুন্দর ভাব আর কি জীবনে দেখিব? ধর্ম্মভাবে আর কি মন প্রাণ পূরিয়া উঠিবে—এই বলিতে বলিতে তিনি কান্দিতে লাগিলেন।"

সোলেমান যোগমায়ার প্রার্থনা শুনিতে আসেন নাই। তিনি জনতা বিতাড়িত করাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জনতা তাঁহার সঙ্গেই আসে। সোলেমানের আশা পূর্ণ হইল। সোলেমান বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রজা-বধূ, আমি নবাব; তুমি মা, আমি পুত্র; অথবা তুমি কন্যা, আমি পিতা। আমার আবদার তোমার সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করা উচিত; তোমার স্বামীর অপরাধ হইয়া থাকে, পরে বিচার করিব। অগ্রদ্বীপের কাজি ও সার্ব্বভৌম কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহারও দণ্ড বিধান হইবে। তোমার প্রার্থনীয় বিষয় সকলও পরে জানিব। প্রার্থনা শুনিবার ও বিচার করিবার এ সময় নহে। জনতা হইতে যে যে কথা উঠিতেছে, মা তাহা তোমার কর্ণগোচর হইতেছে। মা! আজ এক নিরপরাধা ভদ্রমহিলার চরিত্র লইয়া আন্দোলন হইতেছে। তুমি নিরঞ্জনের ধর্ম্মপত্নী, কি আমার ভ্রাতৃকন্যা নজিরণ—উপস্থিত জনতার এই সন্দেহ। তুমি সন্তানের কথায় তোমার দেবোপম মুখ জনতাকে দেখাইয়া অন্য সতীর চরিত্রদোষ ক্ষালন কর। তুমি নারী জাতি। তুমি সকলেরই মাতা; তুমি মাতৃভাবে সকলকে তোমার মুখ দেখাও। তুমি কালীমন্দিরের রকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তোমার দেবী মূর্ত্তির বিমল জ্যোতি বিকিরণ করতঃ যে কলঙ্কের ছায়া নজিরণের চরিত্র গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে দূর কর। সতীর অন্য সতীর গৌরব রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তুমি পতির আদেশে, পতির সঙ্গে, পতির সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পতির অনুগতা হইয়া যে কার্য্য করিতে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে সকলেই তোমার প্রশংসা করিবে—বঙ্গে চিরকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।"

অনন্তর নবাব নিরঞ্জন কহিলেন, "পণ্ডিত ঠাকুর, তালুকদার পুত্র, তুমি তোমার ধর্ম্ম পত্নীকে আমার ইচ্ছা বুঝাইয়া দেও।"

নিরঞ্জন। যাও, সতি যাও; নবাব পিতা; তাঁহার আদেশ পালন কর। আজ আমাদের শুভ দিন। বঙ্গে চিরদিনের জন্য তোমার সুকীর্ত্তি ঘোষিত হইবার দিন।

যোগমায়া পতি ও নবাবের আদেশক্রমে কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ রকের উপর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া লজ্জিত ভাবে হেঁট মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন নবাব জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে দেখ, ইনি মুসলমান কন্যা না হিন্দু তনয়া,—ইনি যোগমায়া, না নজিরণ! আজ সেই নিরপরাধা নজিরণের পক্ষে বড় কঠিন দিন। তোমরা ভাল করিয়া দেখ, ভাল করিয়া দেখ।"

জনতা হইতে শব্দ উঠিল,—"ইনি নজিরণ নহেন, নজিরণ নহেন। মুসলমান বেশে ব্রাহ্মণকন্যা। ইহাঁর সীমন্তে সিন্দূর, হস্তে আয়তির চিহ্ন লৌহ কঙ্কণ ও শঙ্খ। ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণকন্যা, নিশ্চয় ব্রাহ্মণকন্যা।"

অতঃপর নবাব সোলেমান শিবিকাযান আনাইয়া নিরঞ্জনকে ও তাঁহার পত্নীকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি অনুচর গণের সহিত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্রদ্বীপের কাজি ও শিরোমণি সার্ব্বভৌম মহাশয় নবাবের আদেশে প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব-সদনে প্রেরিত হইলেন। নানা কথা বলিতে বলিতে জনতা ভঙ্গ হইল।
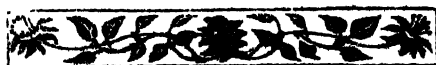
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রমণী মণ্ডলে।

"হ্যাঁলা ভৈরবী নাতবৌ, আমার চুলগুলা যদি একটু জড়ায়ে দিস্"—এক দিন নিরঞ্জনের মাতামহের অন্তঃপুরে মাতামহী ঠাকুরাণী এই কথা গুলি নিরঞ্জনের সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন। নিরঞ্জন কালী-বাড়ীর বন্দী দশা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর নিরঞ্জনের স্ত্রীকে নিরঞ্জনের মাতামহী ভৈরবী নাতবৌ এবং অপরা রমণীগণ ভৈরবী বৌ বলিতেন। নিরঞ্জনের মাতুলপুত্র অনেকগুলি ছিল, সুতরাং তাহাদিগের বধূদিগকে বড়, মেজ, সেজ, ন, প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষণ যুক্ত করায় সংকুলান হইতনা; এই কারণে নিরঞ্জনের মাতামহীর পৌত্রবধূগণের অনেকের নামের পূর্ব্বে ফুল, ধলা, রাঙ্গা, বেল, বকুল, ডালিম প্রভৃতি বিশেষণ বসান হইয়াছিল।

যোগমায়া এই অনুমতি পাইবামাত্র তৎকালোচিত সুগন্ধিদ্রব্য আমলা মেথী মিশ্রিত নারিকেল তৈল ও কেশ বন্ধনের কেশ-বিনির্ম্মিত রজ্জু লইয়া সযত্নে বৃদ্ধার কেশ বন্ধন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার বয়ঃক্রম অশীতি পর হইলেও তাহার কেশগুচ্ছ কাল ছিল এবং তাঁহার কেশ

বন্ধন করা না হইলে, তিনি বড় অসুখী হইতেন। নিরঞ্জনের পত্নী বৃদ্ধার কেশবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার অপরা পৌত্রবধূ আসিয়া বৃদ্ধার চরণযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। তৃতীয়া বধূ তাঁহার করযুগল অলক্তরাগে চিত্রিত করিতে লাগিলেন। চতুর্থ বধূ আসিয়া তাঁহার শরীর তৎকালোচিত অঙ্গরাগের দ্রব্য হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও শ্বেতচন্দনে রঞ্জিত করিতে লাগিলেন।

যৎকালে বৃদ্ধা এইরূপে বধূগণ কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা বা সজ্জিতা হইতেছিলেন, তখন নিরঞ্জনের মাতামহ দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া বাহিরে যাইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"আজ বুড়ীর এ সাজসজ্জা কেন?" বৃদ্ধা ব্যস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া মস্তক আচ্ছাদন করিলেন।

যোগমায়া এ বাটীতে আসার পূর্ব্বে কোন পৌত্রবধূ দীননাথের সহিত কথা কহিতেন না। যোগমায়াকে তাঁহার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সম্প্রতি অনেক বধূই বৃদ্ধের সহিত কথা কহিতেন। একটি বধূ বলিলেন,—"আজ প্রভুর দোলযাত্রা, তাই রাধার বেশবিন্যাস।"

এই কথায় বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—"বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রার দিন নিকট-বর্ত্তী বটে, বৃদ্ধার সহমরণে এইরূপ ঘটাই হবে?"

সকল বধূগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ষাট্—ষাট্, এ অমঙ্গলের কথা কেন?"

বৃদ্ধ পুনরপি বলিলেন—"এ আর অমঙ্গলের কথা কি? তোমাদের সকলকে রেখে আমি মরি, আর বুড়ী ঘটা ক'রে সহমরণে যায়, এইত এখন মহানন্দের কথা।"

বধূগণ নিস্তব্ধ হইলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। এখন সকলের রহস্য পড়িল যোগমায়ার প্রতি। বৃদ্ধা কহিলেন—"আমার জোড়া পেতলি সাজাতে

বলেছিস, নয়? আমি ত স্রোতে গা ঢেলেই বসে আছি। আমায় পেত্নী, সুন্দরী, সোহাগী, রাধাবিনোদিনী যা হয় তাই সাজাগে আজ আর একবার ভৈরবী নাতবৌকে সকলের ভৈরবী সাজাতে হবে। ভৈরবী নাতবৌকে দেখলে আমার কাশীর ভৈরবীর কথা মনে পড়ে, বড় সুন্দর দেখায়। নাতবৌ তুই সেই ভৈরবী সাজ কোথায় পেলি?"

যোগমায়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"সাজ পোষাক আর কি? এক খানা গেরুয়া বসন আর গোটাকতক রুদ্রাক্ষমালা বৈত নয়। তোমার নাতি যে সময় কাশীতে পড়্‌তেন, তখন তিনি সন্ন্যাসী সেজে বাড়ী হতে কাশী যাত্রা করতেন। তিনি বলেন, সন্ন্যাসী সেজে বেরুলে পথে চোর ডাকাতের ভয় থাকে না, আর তীর্থ স্থানের পাণ্ডাদের লোকে ধরেনা। গৃহস্থ বাড়ী অতিথি হতে গেলেও সন্ন্যাসীদের বিশেষ আদর যত্ন হয়। তোমার নাতির গৈরিক বসন আর রুদ্রাক্ষ মালা আমার নিকটেই ছিল; তাও আসার সময় সঙ্গে এনে ছিলেম। ভৈরবীবেশের ছাই আর সিন্দুর ঘরেই আছে, পুষ্পপাত্র কোসা কুসি ঠাকুর দালান থেকে নিয়েছিলেম।"

বৃদ্ধা আবার বলিতে লাগিলেন—"যা হ'ক ভৈরবী নাতবৌ! তোর বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। তোর সাহসেও ধন্যি। তুই আমার নাক, কান, মান সকলই বজায় রেখেছিস। তুই যেমন আমায় সুখী করেছিস, তেমনি চিরকাল সুখে থাক, পাকা চুলে সিন্দূর পর। দাদা নিরঞ্জন তার দাদার বয়স পাক্, আর তুই আমার বয়স পা।"

এই সময়ে বাধা দিয়া একটি বধূ বলিলেন—"দে'খ দিদি মা! আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে তুমি যেন দাদাকে ভৈরবী দিদিকে সঁপে দিয়ে খালি বিছানায় একা একা ছট ফট না কর।"

বৃদ্ধা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তোর যদি তোর দাদার প্রতি এতই টান হয়, তা নয় তোর বুড় দাদাকে তোকেই দিলেম।"

এই বধূটি একটু লজ্জিতা হইলেন এবং অপরা বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভৈরবী দিদি! এত অল্প সময়ে তোমার সে বুদ্ধি কেমন করে হলো? তোমার এত লজ্জা, এত ভয়, তাতে তোমার এত সাহস কোথা হ'তে এলো? তুমি অত লোকের মধ্যে ঘোমটা খুলে মুখই বা কেমন করে দেখালে?"

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"যা করেছি দিদি! তা মনে কর্‌লে আমার এখন চমৎকার বোধ হয়। বুদ্ধি সাহস সকলই মা জগদম্বা দিয়েছিলেন। রাত্রি দুপুর হ'লো, তিনি এলেন না, তরমুজ ছোরার কথা মনে পড়লো; তখন বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লেম। যখন চৌকিদারের মুখে শুন্‌লেম,—তিনি বন্দী, তখন শরীরটা যেন কেমন করে উঠ্‌ল। ভক্তিভাবে মা জগদম্বাকে ডাক্‌লেম, বুদ্ধি সাহস চাইলেম। আগে ভেবে দেখ্‌লেম, সকলকে জানালে একটা মিছে হৈচৈ পড়্‌বে, সব কাজ মাটি হবে। বুদ্ধি, সাহস, বল যেন কোথা হ'তে এলো। যাঁকে যে ভালবাসে, যে যাতে তন্ময় হ'য়ে থাকে, তাঁর ইষ্ট বস্তুর অমঙ্গলে তার আর জীবনের প্রতি মমতা থাকে না। জীবনের প্রতি মমতা না থাক্‌লেই নৈরাশ্য আসে। নৈরাশ্য ফলে অসীম বল, অসীম সাহস, অসীম বুদ্ধি আসে। আমি ভেবে দেখ্‌লেম, আমার পিতৃকুলে এক মাতুল এবং শ্বশুরকুলে স্বামী ও তাঁহার মাতামহ বংশ ভিন্ন আর কেহই নাই। তাঁর জীবনে আমার জীবন, তাঁর মরণে আমার মরণ। যদি আমি মরিয়াও তাঁহার কোন উপকারে আস্‌তে পারি, তবু আমার নারী-জীবন সার্থক হবে। যদি তিনি কলঙ্কী হয়ে জীবনে মরেন, তবে আমার কলঙ্ক, বিপদ ত অতি তুচ্ছ। যদি চেষ্টায় বিফল হই, তবে নবাবের জহ্লাদের প্রথম তরবারির আঘাত হইতে পতির জীবন রক্ষা কর্‌ব—তার পরে তাঁর অদৃষ্টে যা থাকে, তা হ'বে। স্বামীর সুখের ভাগী হ'তে চাই, তাঁর আমোদের

দিনে সোহাগ পেতে চাই—তবে তাঁর বিপদের দিনে তাঁর সঙ্গিনী হ'তে কেন চেষ্টা কর্‌ব না? রমণীর স্বামি-চিন্তাতেও সুখ, স্বামি-সৌভাগ্য-চিন্তায় সুখ, স্বামীর বিপদুদ্ধারের চিন্তায় সুখ। নৈরাশ্য পক্ষের পরিণাম চিন্তা করিয়া ঠিক কর্‌লেম, স্বামী মরার পূর্ব্বে স্বামি-ঘাতকের অসিতে আগে ম'রে সুখী হ'ব। আর কার্য্যসিদ্ধি পক্ষের পরিণাম চিন্তা করিয়া স্থির কর্‌লেম, স্বামীকে উদ্ধার করে আহ্লাদে উৎফুল্ল হ'ব—নারীজীবন সার্থক কর্‌ব। জনসমাজে মুখ দেখান লজ্জা ভাব'ছ, আমিত মুখ দেখাতেই গিয়ে ছিলেম। মুখ দেখানই আমার কাজ। যে কাজ কর্‌তে গিয়েছি, তা না কর্‌লে আমার সকল শ্রম যত্ন ত ব্যর্থ হয়। আমার কাজ নবাব ও সকলকে জানান—আমিই আমি, তাঁর স্ত্রী,—নজিরণ নয়। আমার মুখ না দেখালে সে বিশ্বাস হ'বে কেন? তখন আমাতে আমি ছিলাম না। আমি স্বামীর কার্য্যে তন্ময় হয়ে আত্মহারা হয়ে ছিলেম। সুতরাং নবাব এবং আমার স্বামী যা বলেছেন তাই করেছি। তখন আমার লজ্জা ছিল না, ভয় ছিল না, বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না, বোধ করি নাকে নিশ্বাস ও চোখে পলকও ছিল না।"

এই পর্য্যন্ত কথা হইতে হইতে নিরঞ্জনের মাতামহী বলিলেন—"দিদি থাম, বোন থাম। পতির জন্য সতী সহমরণে যেতে পারে, তার চেয়ে এ আর কঠিন কাজ নয়। স্বামীকে ভাল বাস্‌লে তাঁর জন্য সব করা যায়।"

অপরা বধূগণ বলিয়া উঠিলেন—"দিদি! দিদি! দিদি! তুমিও কি ভৈরবী সাজ্‌তে পার, এসব কর্‌তে পার?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"ভৈরবী সাজা বুদ্ধিতে কুলায় কিনা বল্‌তে পারি না। জগদম্বা না করুন, যদি ঠাকুর আমার আগে মরেন, তবে আমি এইরূপ সেজেগুজে নিশ্চয় সহমরণে যাব। এখনই বা আমি কি না করি? ঠাকুরের চরণ পূজা করি, পাদোদক খাই, তাঁহার প্রসাদ খাই, অন্য অন্ন

ব্যঞ্জন আমার ভাল লাগে না। ঠাকুরের পূজা ভক্তি কর্‌তে আমি কিছু লজ্জা করি না। আমি ত তোদের মত নই। তোরা চাস্ দাদাদের সোহাগ, গহনা—কিন্তু দিতে কিছুই চান্ না। তাই কোণায় কোণায় কেঁদে বেড়াস। যাক্, বাজে কথায় কাজ নাই, ভৈরবী নাতবৌ, দাদা যে একেবারে পূজা আহ্নিক ছেড়ে দিলে, ব্যাপার খানা কি?"

এবার যোগমায়া ধীরেধীরে বলিতে লাগিলেন—"এইবার বুঝি আমার কপাল পোড়ে,—কুষ্ঠির গণনা বুঝি ঠিক হয়। তিনি এখন কালী দুর্গা বা কোন দেবতা মান্‌তে চান না। বলেন, এখন আমি ঘোর নাস্তিক। ছেলেপিলেকে জুজুর ভয় দেখানর মত ঈশ্বরভক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্ম জনসমাজের একটা জুজুর ভয় মাত্র। কোন দেবদেবী নাই। সমাজের সুখের জন্য একটা লৌকিক বিধি ব্যতীত পাপ আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, চুরি করা আর দান করা একই রকমের কাজ! তিনি সারারাত এখন আমার সহিত কেবল এই সব তর্ক করেন। আর বলেন ধর্ম্ম থাক্‌লে, দেব দেবী থাক্‌লে তাঁর কপালে এত দুঃখ হ'তো না,—পৈতৃক সম্পত্তি যেতো না।"

"এই কথায় সকল বধূগণ বলিয়া উঠিলেন—"ওমা সে কি কথা, তিনি পণ্ডিত লোক হ'য়ে কি বলেন? সেই নজিরণ মাগি বুঝি কি ঔষধ খাইয়ে ধর্ম্মজ্ঞান হরে নিয়েছে। সে মাগির উপর কোন টান টুন দেখ দিদি?"

যোগ। না, সে কিছু খাওয়ায়নি। তার প্রতিও তাঁর কোন টান হয়নি। সে বিষয়ে তিনি এখনও দেবতা। তিনি যে তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেও তাঁর বিষয় উদ্ধার হবার কোন সুবিধা হবে ভেবে। নজিরণেরই কুপ্রবৃত্তি হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কোন কুপ্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন, ভাবিতে ভাবিতে বলেন, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার হিন্দু মরিয়া আছে, তারা আর জাগিবে না— প্রতাপ তুমি এদেশে এস। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলেন, জাগ গো বাঙ্গালা

জাগো। সকলে জাগ, এক মত হও। জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী সুধা সেচন কর। আবার কাঁদিয়া বলেন, হায়! হায়! হায়! এদেশে সংগ্রাম নাই, মহারাজ প্রতাপ নাই, ভিষক ব্যতীত এ অসাড় মৃতদেহে কেমন করিয়া জীবনীশক্তি আস্‌বে? এইরূপ সকল রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকেন আর কাঁদেন। আমার ভয় হচ্ছে তিনি বা পাগল হন। পূর্ব্বে এত বিপদের মধ্যেও তাঁর মুখ হাসি-ছাড়া হ'তনা; এখন সকল সময়েই মুখ চিন্তায় গম্ভীর ও ম্লান।

বৃদ্ধা। তাইত, সে দিন নবাব বলে গেল, সুবিচার কর্‌বে,—কাজি আর দিগম্বরেকে দণ্ড কর্‌বে, তার কিছুই কল্লে না। কাজি আর দিগম্বরেকে বাড়ী নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিলে। নিরঞ্জনকে আর দরবারে যেতেই দিলেনা। নাজিরণকে নৌকা হ'তে বাড়ী উঠায়ে নিলে। নবাব বেটাও ভণ্ড মিথ্যাবাদী। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। তাগুার এপার ওপার সকলেই জেনে ফেলেছে, নবাবের ভাইজি বেটী বদলোক। সকলেই ধন্যি ধন্যি কর্‌ছে যে, দাদা নিরঞ্জনের বৌর মত বৌ হয় না, হবে না। কেউ বল্‌ছে সাবাস বুদ্ধি, কেউ বল্‌ছে সাবাস ফিকির! কেউ বল্‌ছে সাবাস সাহস! কেউ বল্‌ছে সাবাস পতিভক্তি!

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধা সজলনয়নে যোগমায়ার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। যোগমায়া লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। অপরা বধূগণ যোগমায়ার সোহাগ দেখিয়া ঈর্ষায় জরজর না হইয়া মুখ চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নজিরগণের প্রাসাদ।

জল ও তৈল যেরূপ মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ সত্য মিথ্যাও সংসারে যেন মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারেনা। যে জনশ্রুতি বড় প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহা লইয়া জনসমাজে বিশিষ্টরূপ আন্দোলন হয়, তাহারই সত্য অতি সহজে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমি একটি পিন অপহরণ করিলে কেহ তাহা জানিবেনা, শুনিবেনা, সন্দেহ করিবেনা ও অনুসন্ধান করিবেনা; কিন্তু আমি যদি লক্ষ মুদ্রা দস্যুতা করিয়া আনয়ন করি, তবে আমি ধরা না পড়িলেও আমার দুষ্কৃতির কথা গোপনে থাকিবে না। তবে পিন অপহরণ কি পাপ নহে? আমি বলি এই পিন অপহরণ হইতেই আমার লক্ষ মুদ্রা অপহরণের সাহস বাড়িয়া যায় ও অপহরণের প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে। চরিত্র ধর্ম্মপথ হইতে এক চুল খলিত হইলেই, পতনশীল বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত গতিবৃদ্ধির ন্যায় উহার পতন-বেগও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চরিত্র স্বস্থান হইতে কিছুতেই খলিত

হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে আমি এই বলিতে চাহি, যে কার্য্য জনসমাজে যে পরিমাণে প্রসারিত হয়, তাহার সত্য তত সহজে বাহির হইয়া পড়ে। নজিরণ ও নিরঞ্জন কালীমন্দিরে এক সঙ্গে ধৃত হইয়া লজ্জা পাইলেন না বটে, কিন্তু সত্য ঘটনা তিন দিনের মধ্যেই তাওার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

যে রাত্রিতে নজিরণ ও নিরঞ্জন কালীমন্দিরে বন্দী হন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালেই সার্ব্বভৌমের পরিচারক বুদ্ধিমান কেলো ঘাটে পথে গান করিতে লাগিল—"বিয়ের বাকি নাইকো আর, আমিরণ বলেছে মোরে সার, জিজিরণের সঙ্গে কেমন মজার, আরে কেমন মজার। কপাল খুলেছে মোর এবার, জিজিরণ মোরে দেখে বার বার, সাজ পোষাকে জিজিরণের কেমন বাহার, আরে কেমন বাহার।" কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষজার সঙ্গীত শ্রবণে তাহার শ্রোতৃগণ সঙ্গীতের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র রজনীর আমূল ঘটনা মুক্তকণ্ঠে তাহাদের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিল।

স্বরূপ তাহার সহধর্ম্মিণীর নিকট অতি গোপনে রজনীর ভৈরবীর কথাটি বলিল। স্বরূপ-পত্নী সেই কথা আবার অতি গোপনে তাহার তিনটি সমবয়স্কার নিকট প্রকাশ করিল। তাঁহারা তিন জনে আবার সেই কথা সর্ব্বাগ্রে অতি সঙ্গোপনে তাঁহাদিগের স্বামীর নিকটে প্রকাশ করিলেন। স্বামিগণ আবার তাঁহাদের বয়স্যগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

সাধু অতি গোপনে তাহার মাতার নিকট রজনীতে যাহা দেখিয়াছিল তাহা বলিল। সাধুর মাতা বহুকষ্টে এই কথা প্রায় এক ঘণ্টা গোপন করিয়া রাখিয়া, অতি গোপনে বিশ্বাসিনী হরির মাতুষসার নিকট প্রকাশ করিল। তিনি আবার তাঁহার বিশ্বাসিনী হরির জননী, রামের

সহধর্ম্মিণী ও গোবিন্দের প্রণয়িনীর নিকট গোপনে প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে প্রত্যেকে তাঁহাদিগের তিন সখীর নিকট প্রকাশ করিলেন।

ধীবর তাহার পঞ্চমুদ্রা প্রাপ্তির কথা তাহার ধর্ম্মপত্নীর নিকট বলিল। ধীবরবধূ সে কথা আবার তাহার প্রিয় সখীর নিকট বলিল। প্রিয় সখী আবার পঞ্চমুদ্রার স্থলে পঞ্চশত মুদ্রা প্রাপ্তির নূতন সংবাদ গঠন পূর্ব্বক স্বামীর আহারের কালে গল্প করিয়া সখীর কপাল প্রসন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

আমিরণ প্রভৃতি নজিরণের সখীগণও হিন্দুরমণীর প্রত্যুৎপন্নমতি, পতিভক্তি, সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত হিন্দুললনার বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিলেন। বিবাহিত জীবনের সহিত অবিবাহিত জীবনের সুখদুঃখের তারতম্য দেখাইলেন। বলা বাহুল্য, কথাটা অবশ্য সহচরীগণের মধ্যে অতি গোপনেই হইল।

গোপনীয় কথাই বড় রটে। যে দিন প্রাতঃকালে নিরঞ্জন কালীমন্দির হইতে পত্নীসহ মাতামহালয়ে গমন করিলেন, সেই দিনই সন্ধ্যাকালে কোন ধনী মহাজনের নৈশ বিশ্রামাগারে ঐ মহাজনের প্রিয় সখা বলিয়া উঠিলেন—"কথাটা আর বুঝিতে বাকি নাই। তাইতেইত আমাদের মুনি ঋষিগণ আট বৎসরের কন্যার বিবাহ ব্যবস্থা করেছেন। নজিরণের বয়স ১৬ বৎসর, আমার দশভুজার তিন দিনের ছোট, আর অন্নপূর্ণা হ'তে ১৮ মাস ১৭ দিনের বড়। নবাবের বড় অন্যায়। এতবড় অবিয়েত মেয়ে একা একা কেবল দাসী খোজা নিয়ে নৌকায় থাকে। প্রাতঃকালে ছোরা তরমুজ নিরুর নিকট পাঠায়। রাত্রিকালে নিরুকে নৌকায় তুলে নিয়ে আমোদ করতে থাকে। কাজি ও সার্ব্বভৌম বহু কষ্টে ধরে। নিরুর বৌটা বড় চালাক। ভৈরবী সেজে নজিরণকে পার করবার জন্য মাঝিকে

৫ শত টাকা আর কেলোর হাতে স্বরূপকে হাজার টাকা দিয়ে কালীর ঘরে নিরুর কাছে যায়, আর নজিরণকে ভৈরবী সাজিয়ে বের করে দেয়। ধন্যি মেয়ে মানুষের বুদ্ধি-কৌশল।”

মহাজন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—“তুমি যা সিদ্ধান্ত করেছ, তাই ঠিক্।”

এই মহাজন-সভার সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় দিনে তাণ্ডার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া খুব বড় হইয়া ঘৃণিত—অতি ঘৃণিত—শাখা পল্লবে, ফুল ফলে এক প্রকাণ্ড মহীরুহের ন্যায় হইয়া—এক শুনিবার অযোগ্য, বলিবার অযোগ্য কিম্ভূত কিমাকার উপাখ্যান হইয়া অগ্রে নবাব সোলেমানের কর্ণে, পরে নজিরণের কর্ণে উঠিল।

নজিরণ এক্ষণে প্রাসাদে—পুষ্পোদ্যান-পরিশোভিত সুন্দর প্রাসাদে। সহচরীগণ রহস্য আমোদ করিতেছে। কিঙ্করীগণ কলহ করিতেছে। অতি বিশ্বাসিনী সহচরী আমিরণ ছবিরণ ও জিজিরণ গম্ভীর আর সেই বাসন্তী নলিনী নজিরণ বিষণ্ণ হইতেও বিষণ্ণতরা। আজ নজিরণের সেই লাবণ্যময় রূপরাশি—সেই ফুটন্ত গোলাপের সৌন্দর্য্যসম্ভার কোথায়? আজ নজিরণের অলক্তরাগ-রঞ্জিত দুগ্ধফেননিভ বর্ণের উজ্জ্বল লাবণ্য কোথায়? আয়ত নয়নে কালিমার রেখা পড়িয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নজিরণের ক্ষীণ তনু অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছে। নজিরণের বেশবিন্যাসের পারিপাট্য নাই। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত। তাঁহার হাস্যময় আস্য বিষাদ-কালিমায় কলঙ্কিত, চিন্তায় গম্ভীর। নজিরণ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

নজিরণ শ্রবণ করিয়াছেন, খুল্লতাত বঙ্গেশ্বর বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, নজিরণ কলঙ্কিনী। তিনি আমীর ওমরাহগণের সহিত, উজিরগণের

সহিত, সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছেন। কা'ল নজিরণের পরীক্ষা।

নজিরণের কঠোর পরীক্ষা। প্রকৃতিপুঞ্জ আহূত হইয়াছেন। পণ্ডিত-বৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আমির ওমরাহগণ, অমাত্যগণ ও সেনা সহ সেনাপতি ও সেনানায়কগণ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে নবাব-সদনে বিরাট দরবার হইবে। নজিরণকে সভামধ্যে কোরাণ মস্তকে করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। নজিরণকে কোরাণ মস্তকে করিয়া সভায় বলিতে হইবে, তিনি সতী কি কলঙ্কিনী। নজিরণের কথায় ও ভাবে সভাস্থ অগন্তুকগণ তাঁহার সতীত্ব পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

সরলমতি বালিকে নজিরণ! আর অশ্রু বর্ষণ করিও না। মানব-মতি অতি চঞ্চল। ধর্ম্ম পথ অতি পিচ্ছিল। তোমার জনক জননী আর মর্ত্ত্যধামে নাই। তোমার বঙ্গবিজেতা বীরাগ্রগণ্য পিতা স্বর্গধামে বাস করিতেছেন। তোমার স্নেহময়ী জননী সেই অমর ভবনে তোমার পিতার সেবায় রত আছেন। তোমার খুল্লতাত নবাব সোলেমান কর-রাণীকে তুমি বহুদিন হইল, চিনিয়াছ। তুমি তোমার পিতার শেষ চিহ্ন। তুমি তোমার খুল্লতাতের নিরাপদে বঙ্গশাসনের পথের বিষম অন্তরায়। তুমি ইহজগৎ হইতে বিদূরিত হইলে, তোমার খুল্লতাতের বঙ্গরাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়। দেশের আমির ওমরাহগণ, প্রধান প্রধান প্রকৃতিপুঞ্জ, সেনাপতি, সেনানায়ক ও প্রাচীন সৈনিকগণ তোমার পিতৃগুণে তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা তোমার খুল্লতাতের দুষ্কৃতির জন্য মনে মনে ঘৃণা করেন। তুমি সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে, তাহারা কালের সর্ব্ব বিস্মৃতিময়ী শক্তিতে সোলেমানের দুষ্কৃতির কথা ভুলিয়া যাইবে। হে ভ্রান্ত মানব! তুমি আশার কুহকে তোমাকে অজর অমর ভাবিতেছ। তোমার সম্পদ ও সম্পদের

আশা অবিনশ্বর ভাবিতেছ। সকলে চলিয়া যাউক, আর তুমি নিষ্কণ্টকে নিরাপদে সকল সম্পদের অধিকারী হও—এই আশা করিতেছ। তুমি কতক্ষণ এই মহীমণ্ডলে আছ, তাহা কি একবার মনে কর? এই পান্থ-শালায় কত দিনের জন্য অবস্থিতি করিবে, তাহা কি কখন মনে হয়? পার্থিব সম্পদের অসারতা, মানবজীবনের অনিত্যতা কি কখন চিন্তা করিয়া থাক? জীবন স্বপ্ন। ইহার ক্রিয়াকলাপ স্বপ্নের অস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র। যদি দিনান্তে একবার মনে কর, তোমার জীবন-স্বপ্ন এই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে পারে, তোমার সম্পদ বিভব তোমার নয় এবং তুমিও তোমার নও, তাহা হইলে তুমি সকল পাপ তাপ হইতে অনেক উপরে থাকিতে পারিতে।

নজিরণ! তোমায় সকলে ঘৃণা করে করুক, কিন্তু আমি তোমাকে ঘৃণা করিবনা। আমি জানিতেছি, এখনও তুমি নিষ্পাপা। কেবল পাপপ্রবৃত্তি মাত্র তোমার মনে উদয় হইয়াছিল। তুমি সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতেও কিছু অগ্রসর হইয়াছিলে, অবসর পাইয়াছিলে, সুযোগ হইয়াছিল; তাই তুমি অগ্রসর হইয়াছিলে। আমি আমার মনোমন্দিরের স্মৃতির প্রকোষ্ঠ খুলিয়া ফেলিলাম, হায়! হায়! হায়! কোন্ পাপের প্রবৃত্তি আমার মনে উদয় হয় নাই? কোন্ পাপে মগ্ন হইতে অগ্রসর হই নাই? সুযোগ ও অবসরের অপেক্ষায় পাপগুলি অসংঘটিত রহিয়াছে। কোনটির চেষ্টা বা বিকল হইয়াছে। আমি চোর, দস্যু, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারী, রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতী ইত্যাদি ইত্যাদি যত বিশেষণে আমাকে আমি নিজে নিজে বিশেষণ-যুক্ত করিতে পারি, পরে যদি আমাকে এই কথা বলে, তবেই আমার বড় ক্রোধ। পরকে ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে নিজের সহিত তাহার একবার তুলনা করা উচিত। তাই নজিরণ, আমি তোমায় ঘৃণা করিবনা।

নজিরণ! চক্ষুর জল মুছিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর। জীবন পরীক্ষার

কাল। সংসার পরীক্ষা-মন্দির অথবা ভীষণ রণাঙ্গন। এখানে বিকল-চিত্ত হইয়া রোদন করিলে চলিবে না। বীর-রমণীর ন্যায় যুদ্ধে অগ্রসর হও। কা'ল তোমার ভাবে বা কথায় তুমি কলঙ্কিনী প্রকাশ হইলে, তোমার শিরশ্ছেদ হইবে। অত্যাচারীর অত্যাচারে মরিলে—ধর্ম্মের জন্য মরিলে, স্বদেশের জন্য মরিলে কেহ তোমার মরিবার বাধা দিত না। তুমি মরিলে, মরিবে কলঙ্কিনী হ'য়ে। তাই বলি মরিও না। প্রকৃতপক্ষে তুমি কলঙ্কিনী নহ।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নজিরণ চক্ষুর জল মুছিয়া আমিরণকে ডাকিলেন। আমিরণ নিকটে আসিলেন। নজিরণ বলিলেন—"আমিরণ! কা'ল আমি মরিব, আমার শিরশ্ছেদ হইবে।"

আমিরণ উত্তর করিলেন—"মরিবে কেন? নির্ভয়ে বলিবে আমি কলঙ্কিনী নহি—আমি পাপিনী নহি।"

নজি। সে যে মিথ্যা কথা।

আমি। কিসে মিথ্যা কথা? তুমি কি পাপ করিয়াছ?

নজি। আমার মনে পাপপ্রবৃত্তি হয়েছিল। আমি নিরঞ্জনকে বজ্‌রায় এনেছিলাম।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একজন খোজা আসিয়া জানাইল, ফকির সলিম সা নজিরণের সহিত দেখা করতে অসিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধতম ফকির সলিম সা নজিরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। নজিরণের সম্মতিক্রমে ফকির নজিরণের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। ফকিরের সহিত নজিরণের অনেক কথা হইল। ফকিরের উপদেশে নজিরণের মন অনেক লঘু হইল। নজিরণের জীবনের প্রতি মমতা হইল। কত আশায় তাঁহার মন• পূর্ণ হইল। ফকির সর্ব্বশেষে বলিলেন—"মা! সাবধান, আমার উপদেশের অন্যথা ক'রোনা, তুমি

আমার আশাতরীর মেয়ে-কাণ্ডারী। বঙ্গের দশা দেখ, ভারতের দশা দেখ। হিন্দু মুসলমানে আর কতকাল যুদ্ধ চল্‌বে? আর কতকাল ভারতমাতা নর-শোণিতে কলঙ্কিত হ'বেন। আমার ফকির-জীবনের উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানের একতা-সাধন—ভারতের প্রকৃত বলসঞ্চয়। মা, তুমি আমার সেই তরীর কর্ণধার, আর নিরঞ্জন তাহার বহিত্র-বাহক। জানিনা, তরী কূলে যাবে কি না, কিন্তু আমি সেই কার্য্যে জীবনপাত কর্‌ব। এক্ষণে যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, সে কেবল হিন্দুমুসলমানের একতা সাধনে হ'বে। পাঠান, মোগল, আফগান এখন ভারতবাসী। হিন্দু ভারতের প্রাচীন অধিবাসী। হিন্দুর গোঁড়ামি একটু কমুক, মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ একটু হ্রাস হউক; উভয়ের মিলনের জন্য মাঝা মাঝি একটি ধর্ম্ম—ঈশ্বরে ভক্তির ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হ'ক। তা'হলে ভারতে বল সঞ্চয় হ'বে। শক এয়েছেন, হূন এয়েছেন, পারশিক এয়েছেন, গ্রীক এয়েছেন আর সকলেই আর্য্যত-শোণিত পান করেছেন। এই শিল্পের হাট, এই সভ্যতার খনি, এই শিক্ষার নিকেতন, এই কৃষিকার্য্যের আদর্শ ক্ষেত্র, এই বাণিজ্যের হট্ট, ভারতবর্ষে যদি শান্তি স্থাপিত হয়, তবে এখানে এমন একটি জাতির সৃষ্টি হ'বে, যে সমস্ত পৃথিবী তার পদপ্রান্তে কত বিষয় শিখ্‌তে পার্‌বে। ভারত বহিঃ শত্রুর হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাবে। সময়ান্তরে তোমাকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দিব। তুমি ঠিক আমার কথামত কাজ কর্‌বে—তাজ খাঁর উপযুক্ত কন্যা ব'লে পরিচয় দিবে।"

এই কথা বলিয়া ফকির চক্ষুরজল মুছিতে মুছিতে নজিরণের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নজিরণের মুখচ্ছবি অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

নজিরণের পরীক্ষা।

অদ্য তাণ্ডার নবাব-সদনে বিরাট সভার আয়োজন। আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিহঙ্গ-কূজনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাতঃসমীরণ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাতঃকুসুম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডার নবাব-নিকেতন আজ জনে জনাকীর্ণ। দলে দলে সৈনিকগণ আসিতেছে—সৈনিক-ব্যবহার্য্য বাদ্য যন্ত্র সকল বাজিতেছে। আমির ওমরাহগণ উপযুক্ত যানবাহনে আসিয়া সভাস্থ হইতেছেন। ব্যবসায়ী মহাজনগণ আগমন করিতেছেন। প্রকৃতিপুঞ্জ সভায় উপস্থিত হইতেছেন। আজ তাণ্ডার সকল অধিবাসী যেন নবাব-সদনে সমাগত। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ, খঞ্জ, মূক, আতুর, দীন, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ জনগণও সভার দিকে ধাবিত হইতেছে।

সভার মধ্যস্থলে স্তূপীকৃত তণ্ডুল, দ্বিদল, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতিও রহিয়াছে। ভিক্ষাপ্রার্থিগণ সতৃষ্ণনয়নে সেই গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সভা নীরব, নিস্তব্ধ, বিষাদ-মেঘে সমাচ্ছন্ন। সকলেই ঘন ঘন এক পথের দিকে দৃষ্টি করিতেছে।

এইরূপ কিছুকাল নিস্তব্ধতার পর কয়েক জন কিঙ্করীর সহিত নজিরণ স্বীয় ভবন হইতে সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সভায় "ঐ যে, এই যে, এলেন, এসেছেন" এই বিষম গোল উঠিল। গোল উঠিবা মাত্র সৈনিকদিগের শাসনবাক্যে মন্দীভূত হইয়া গেল। নজিরণের মূর্ত্তি অতি প্রফুল্ল, অতি হাস্যময়ী; তাঁহার গতি চঞ্চল ও গর্ব্বপূর্ণ; তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়া যেন তেজস্বিতার আভা বিকীর্ণ হইতেছে। নজিরণের বেশবিন্যাসে ও ভূষণে পারিপাট্য না থাকিলেও তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদার অনুপযুক্ত নহে। তাঁহার কিঙ্করীগণও কর্ত্রীর উপযুক্তা কিঙ্করীর ন্যায় সজ্জিতা।

নজিরণ সভার মধ্যস্থলে আসিয়া সর্ব্বশ্রেণীর সভ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গাম্ভীর্য্য অথচ তেজস্বিতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"সকলেই জানেন, আমি বঙ্গবিজেতা তাজ খাঁর কন্যা। পিতার সুকীর্ত্তি এখনও কেহ বিস্মৃত হন নাই। প্রকৃতিপুঞ্জও আমার ভ্রাতৃতুল্য। আমির, ওমরাহ ও অমাত্যগণ ও সেনানায়ক ও সেনাপতিগণ আমার পিতার সুহৃদ, উপদেষ্টা ও সহায় ছিলেন সুতরাং তাঁহারা সকলেই আমার খুল্লতাতস্থানীয়।"

এই কথায় চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ উঠিল "হাঁ—হাঁ—হাঁ—আল্‌বোত— আল্‌বোত।"

নজিরণ পুনরপি বলিতে লাগিলেন—"ইহাঁদিগের নিকট আমি নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিতা নহি। আমি ঘাতকের কৃপাণ নিম্নে আমার মস্তক রাখিতেও কিছুমাত্র ভয় করি না। আমি তাজ খাঁর কন্যা। আমার জীবন একেবারেঃ লক্ষ্য শূন্য নহে। আমি পিতার আশা ও সদিচ্ছার কণামাত্র লাভ করিয়াছি। আজ মৃত্যুর দিনে, আজ কঠোর পরীক্ষার দিনে, আমায় প্রিয় লক্ষ্যটি সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া যাইব। হিন্দু ভ্রাতৃগণ! মুসলমান ভ্রাতৃগণ! যদি দেশের কল্যাণ

করিতে চাও, যদি বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে চাও, যদি মোগল দস্যুগণকে ফুৎকারে উড়াইতে চাও, তবে হিন্দু মুসলমান এক হও। এই উদ্দেশ্যে সকলে সমবেত হও। হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা ও সুবুদ্ধির সহিত পাঠানের শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতার যোগ হউক—মণি কাঞ্চনের যোগ হউক। আমার শৈশব-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার শিক্ষানুসারে আমি অন্তঃপুরচারিণী হইলেও, এই লক্ষ্যের বীজ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি—এই লক্ষ্য-বীজ বঙ্গবাসী হৃদয়ে পোষণ করুন,—আসমুদ্র হিমাচল-ভারতবাসী হৃদয়ে পোষণ করুন। আমি মরিব, তাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, তবে জীবনে কিছুই করি নাই। তাই ইচ্ছা, কিছু দান করিয়া যাই।”

এই কথার পর নজিরণ স্তূপীকৃত দ্রব্যসামগ্রী দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুক দল তাঁহাকে ঘেরিয়া লইল। যে যত দান পাইতে লাগিল, সে তত অধিক দান পাইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। বিষম গোল উঠিল—মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই সময়ে এক পাগল, কিস্তূত কিমাকার পাগল, সুবেগে সৈনিক বাধা না মানিয়া ভিক্ষুক দলে আসিয়া প্রবেশ করিল। ইহাকে ফেলিয়া, উহাকে সরাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া দিয়া নজিরণের সম্মুখে আসিল! উচ্চরবে পাগল বলিতে লাগিল—

“আমায় মণ্ডা দিবি, মেঠাই দিবি, কাপড় দিবি জোড়া।
আমায় ঢাল দিবি, তরয়াল দিবি, দিবি একটা ঘোড়া॥
আমায় সেনা দিবি, সামন্ত দিবি, দিবি রাজ্য পাট।
আমায় চল্‌চে দিবি, গালচে দিবি, দিবি রাজার খাট
ওরে দিবি নবাবের খাট॥

এই কথা বলিয়া পাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—আমি প্রাতঃকাল হ'তে কিছুই খাই নাই, আমার

কিছুই দিলে নারে। আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দিবে, দিবে।—

নবাবজাদি লক্ষ্মী মেয়ে সোনার মত মুখ।
মণ্ডা মিঠাই খেয়ে কাঙ্গালী পাচ্ছে কত সুখ॥
জোড়ায় জোড়ায় দিচ্ছে কাপড় ফেল্‌ছে গোল্লা গালে।
অভয় পাগ্‌লা নেচে উঠ্‌ল লাফের তালে তালে॥"

আবার এই বলিয়া পাগল নাচিতে আরম্ভ করিল এবং উচ্চরবে গান ধরিল—

ওরে মাঘ ফাগুনে ফোটে ফুল, চৈত্র মাসে গুটী।
কেউ খায় ভাত থালে থালে, কেউ খায় বা রুটী॥
সাওন মাসে কাতিক পূজো বাড়ী বাড়ী ধূম।
সেটের মা বিধ্‌বে হলো আমার নাইকো ঘুম॥

পাগল এইরূপ কত কি গান করিতে লাগিল। অনন্তর নজিরণের হাত ধরিয়া টানিয়া মিষ্টান্নের নিকট লইয়া বলিল— "আমায় এক কোচ দে।" বস্ত্রের নিকট লইয়া বলিল—"আমায় এক বোঝা দে।" তার পরে চীৎকার করিয়া বলিল—"ওরে আমি এর কিছুই খাব নারে, আমি খাব তোর ঐ গহনা পরা কান।" এই বলিয়া হা করিয়া পাগল নজিরণের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গেল।

কয়েকটি সৈনিক পাগলকে তাড়াইয়া দিতে আসিতে আসিতে সে লম্ফ দিয়া ভিক্ষুক মণ্ডলের বাহিরে গেল এবং "আমি কিছুই নেব না" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার গৃহীত বস্ত্র ও মিষ্টান্ন ভিক্ষুক দলের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সভা হইতে সবেগে কোথায় পলায়ন করিল।

নজিরণ ধীরে ধীরে দানের কার্য্য শেষ করিলেন। পরে এক ভদ্র

বসন মৌলবি একখানি কোরাণ গ্রন্থ আনিয়া নজিরণের মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। নজিরণ গম্ভীর অথচ সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন—"বঙ্গদেশে বাস করায় শুন্‌তে পাই, হিন্দু মেয়েদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। শুনেছি রামের রাণী সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়েছিল। শুনেছি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের বেগমকে তাঁহার শত্রুপক্ষ সভায় উলঙ্গ কর্‌বার চেষ্টা করেছিল। মুসলমান-মেয়ের সভায় পরীক্ষার কথা শুনি নাই। আজ যদি আমার দাদি অর্থাৎ চাচার মা অথবা আমার নানী চাচার শাশুড়ী জীবিত থাক্‌তেন এবং তাঁদের কথা উঠ্‌ত, ঐ দাদি বা নানী কোন হিন্দুর সঙ্গে কথা বল্‌তেন, তা হলেও বোধ হয়, চাচা এইরূপ পরীক্ষা কর্‌তেন।"

চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ উঠিল—"কিম্বৎ কিম্বৎ।"

নজিরণ আবার বলিলেন—"তরমুজ ছোরা পাঠিয়ে দেওয়া, নিরঞ্জনের সহিত এক বজরায় থাকা, কালী মন্দিরে বন্দী হওয়া এই সব ঘৃণিত কথার উত্তর আমি কিছু দিব না। এই সকল কথার উত্তর দেওয়া আমি আমার পদের অনুপযুক্ত ও অতি ঘৃণার বিষয় মনে করি। ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে যাহারা এই সকল কথার আন্দোলন করে তাহাদিগকে আমি নীচাদপি নীচ মনে করি। এই সকল কথার উত্তর দেওয়া বঙ্গেশ্বর তাজ খাঁর কন্যার কদাচ উচিত নহে। ক্ষুদ্রাশয় কুপ্রবৃত্তি লোকে স্ব স্ব কল্পনা-প্রভাবে কাহারও চরিত্র কলঙ্কিত করিবার জন্য যে সকল কল্পনা প্রসূত কলঙ্ক রটনা করিবে তাহার উত্তর দান করা বঙ্গবিজেতা তাজ খাঁর কন্যা, বঙ্গেশ্বর সোলেমানের ভ্রাতুষ্কন্যা, কখন তাঁহার পদোচিত মনে করেন না। ঘৃণিত উক্তির উত্তর, ঘৃণিত ব্যক্তি ভিন্ন দিতে পারে না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই সভায় যত মহাশয়, উচ্চমনা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মহাত্মা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা কখনও তাজ খাঁর কন্যা সম্বন্ধে ঐ সকল ঘৃণিত কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,আল্লার নাম করিয়া কোরাণ মাথায় করিয়া বলিতেছি, উপস্থিত সভ্যগণকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমার মনে মনে হিন্দুপাঠানের মিলনের—হিন্দু মুসলমানের একতার সদিচ্ছা আছে। পিতৃশিক্ষায় এই ইচ্ছার বীজ আমার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছে ও সাধু ফকিরের শিক্ষায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইতেছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, আমি আল্লার নামে কোরাণের দোহাই দিয়া বলি, আমি কলঙ্কিনী নহি, পাপিনা নহি। যাহারা আমাকে কলঙ্কিনী বলে, তাহারা আমার পিতার গুপ্ত শত্রু, আমার প্রকাশ্য বৈরী। আমি সে সকল ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর লোকের মস্তকে ইহলোকে পারিব না, পরলোকে খোদার দরবারে সদর্পে পদাঘাত করিতে পারিব। আমি খোদার নাম করিয়া, কোরাণ মাথায় করিয়া, মুসলমান সকল সাধু, সন্ন্যাসীর দোহাই দিয়া মুক্তকণ্ঠে অকপট হৃদয়ে বিশ্বাসমতে, জ্ঞানমতে বলিতেছি—এই মাত্র যে পাগল আমাকে আকর্ষণ করিয়া গেল, ঐ পাগল ভিন্ন আর কখন কোন পুরুষকর্ত্তৃক আমি আমার জ্ঞান হইবার পর, আকৃষ্ট হই নাই। ঐ পাগল ভিন্ন কোন পুরুষ স্পর্শ করি নাই। ঐ পাগল ভিন্ন কোন পুরুষের সংস্রবে যাই নাই। ঐ পাগল ভিন্ন আমার নিকটে আমাকে শুনানের জন্য গান করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি বার বার পৃথিবীর সকল দিব্য করিয়া, পীর পেগম্বরের দোহাই দিয়া,দুনিয়ার মালিক আল্লাকে মনে স্মরণ করিয়া, বলিতেছি—এই পাগলসংস্রবে আপনারা আমার যে দোষ জানিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমি জীবনে জ্ঞানতঃ পুরুষসম্বন্ধে আর কোন পাপ করি নাই, করি নাই, করি নাই।”

চারি দিক হইতে শব্দ হইল—“ঠিক কথা, ঠিক কথা, সাচ্চাবাত, সাচ্চাবাত, নবাবজাদি নির্দ্দোষী। এস মুসলমান ভ্রাতৃগণ, সকলে আল্লার নাম করিয়া নজিরণের নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করি। আল্লা আল্লা। এস

হিন্দু ভ্রাতৃগণ, হরিবোল বলিয়া নজিরণের পবিত্রতা ঘোষণা করি—হরি বোল হরি—হরি বোল হরি—হরি বোল হরি।”

এই সকল কথা জনতার মধ্য হইতে শেষ হইতে না হইতে সেই কোরাণধারী পক্ককেশ মৌলবী বলিতে লাগিলেন—“আমরা কি মূর্খ। কি অজ্ঞান! আমরা কি ঘৃণাহীন! নজিরণ নবাব-কন্যা, আমাদের মাতা। আমরা নবাবের আহ্বানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতৃচরিত্র পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। আবার কি না নারীহত্যা দেখিতে আসিয়াছি। ছি-ছি—ছি লজ্জায় আমাদের মুখ লুকাইবার স্থান নাই, মাথা উঁচু করিবার উপায় নাই। মাতা নজিরণ যেরূপ সগর্ব্বে, নির্ভয়ে, অকপটহৃদয়ে মৃত্যু নিকটে জানিয়াও তাঁহার পদোচিত ভাষায় ও ভাবে তাঁহার পবিত্রতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাহাতেও কাহার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না। এস, আমরা সকলে ‘ধন্য নজিরণ’, ‘ধন্য নজিরণ’ বলিতে বলিতে বাড়ী যাই।•

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। সোলেমানও লজ্জায় অবনতমুখে রহিলেন। নবাব এবং অমাত্যগণের আদেশ ও উপদেশক্রমে নজিরণ কিঙ্করীগণের সহিত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীজি ও সলিমসা।

তাঙরি অনতিদূরস্থ এক অশ্বত্থ মূল। ধরিত্রী তিমির-বাসের অবগুণ্ঠন টানিয়া মুখ ঢাকিতেছেন। বিহগবধূ কুলায়ে আসিয়া ভর্ত্তার অঙ্গে ঠোকরাইয়া অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া সোহাগ জানাইতেছেন ও সেই ভাবে তিনি প্রিয়তমার সোহাগের প্রতিদান করিতেছেন। ধেনু গৃহে আসিয়া বৎসকে লেহন করিয়া অপত্য স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। গৃহিণী নৈশ ভোজনের আয়োজন করিতেছেন। কুলবধূ বেশবিন্যাস করতঃ সলিলে গাত্র ধৌত করিয়া শুভ্র বসনে অঙ্গ আচ্ছাদন করিলেন—এখন তাম্বুল রাগে অধরৌষ্ঠ রঞ্জিত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া পত্র নিকেতনে গোলাপ-সুন্দরী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। টগর, গন্ধরাজ, জবা হাসিতে হাসিতে হাঁ করিয়া পড়িয়াছেন। বকুল সেফালিকা হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। চম্পক, বক, করবী

স্থলপদ্ম প্রভৃতি কুসুম-কুল মৃদু মৃদু হাসিয়া যেন অপর কুসুম কুলকে নিরস্ত করিতেছেন। যেন মস্তক কম্পনে বলিতেছেন, সময়ে সকলেই গর্ব্ব করিয়া থাক, সাজিয়া গুজিয়াও থাক, তবে মানবী বধূকে দেখিয়া এত হাস্য কেন? চন্দ্রের আগমন উপলক্ষে গম্ভীর সমুদ্রে জোয়ার আসে, এরাকি এখন সাজিবে গুজিবেও না? বরং তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, নৈশ মিলন যেন সুখের হয়, মান অভিমানের ঘটা না হয়, একের মানে অন্যের ক্রোধে রজনী শেষ না হয়। বিষময় সংসারে শান্তির হাসি কোথায়? পবন ফুলরাণীদিগের এই অন্যমনস্কতার অবসর লইয়া তাহা-দিগের অঙ্গরাগের সৌরভ-সম্ভার অপহরণ করিয়া ছুটিয়া তরুশাখায় বসিয়া দোল খাইতেছেন। লতিকা-বধূ ভুলিয়া গালি দিয়া পবনকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। পবন তাঁহার পত্রবাস টানিয়া বড়ই লাঞ্ছিত করিলেন। এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী ও ফকির নিস্তব্ধভাবে এক বৃক্ষ মূলে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর ফকির ধীরে ধীরে বলিলেন—স্বামীজি! আপনাকে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, আজ কাল তাণ্ডার কেন?"

স্বামী উত্তর করিলেন—"সকল স্থানে যে উদ্দেশ্যে ঘুরি, এখানেও সেই উদ্দেশ্যে।

ফকির। উদ্দেশ্য কি?

স্বামী। মানবের পতন নিবারণ ও পতিত নরের উদ্ধার সাধন।

ফকির। হো—হো—হো মানব পড়ে কোথায়?

স্বামী। মানব পড়ে পাপে, কলঙ্কে, নরকে, সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাপে ও কষ্টে।

ফকির। তাকি আপনি নিবারণ করতে পারেন?

স্বামী। পারি এ কথা বলতে পারিনা তবে চেষ্টা করি।

ফকির। দেশের কার্য্য কর্‌তে পারেন না ?

স্বামী। দেশ কারে লয়ে ? মানব মানবী লইয়াইত দেশ—তারা ধর্ম্ম পথে থাক্‌লেই দেশের কার্য্য হইল।

ফকির। উৎপীড়নকারী ও উৎপীড়িত এদের দিকে কি দৃষ্টিপাত করেন না ? কেবল পর জগতের প্রতিই কি আপনার লক্ষ্য ? ইহ-জগতের প্রতি কি আপনার দৃষ্টি নাই ?

স্বামী। আমি হিন্দু।

ফকির। তা বুঝ্‌লেম। হিন্দুর লক্ষ্য পর জগতের প্রতি। অত্যাচারী আর অত্যাচরিত হতে যে পাপ স্রোত প্রবাহিত হয়, তেমন পাপের স্রোত কি আর কোথাও আছে ?

স্বামী। উপায় কি ! পথ যে দেখি না।

ফকির আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নিরঞ্জনের সহচর সেই সলিম সা ফকির। স্বামীজি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহাঁর নাম জ্ঞানানন্দ-স্বামী। ইনি তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করেন ও ইহাঁর উদ্দেশ্য ইহাঁর নিজের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার উভয়ে কিছুকাল তরুমূলে নিস্তব্ধ থাকিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সেলিম বলিলেন—"স্বামীজি ! আমি একটা প্রস্তাব কর্‌তে চাই।"

স্বামী। করুন, সচ্ছন্দে করুন।

ফকির। অত্যাচার উৎপীড়ন হ'তে দেশে ঘোর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে। হিন্দু পাঠানের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল জ্বল্‌ছে। ঐ যে মোগল আবার এলো এলো। মোগল বালসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে রাজপুতানা দগ্ধ হচ্ছে, পরে সকল ভারত দগ্ধ হ'বে। আপনি স্বামী, আপনার হিন্দু মহালে সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি। আমি ফকির মুসলমান মহালে আমার গতিও সেইরূপ। আসুন, উভয়ে মিলিয়া বিদ্বেষের আগুন নিবাতে চেষ্টা

করি—হিন্দু পাঠানে এক কর্‌তে চেষ্টা করি। আমার কোরাণের শিক্ষায় আর আপনার উপনিষদের ধর্ম্মে প্রভেদ দেখিনা। আপনারা দেশের জল বায়ুর অবস্থা দেখে গো-মাংসাদির আহার ছেড়ে দিয়েছেন, আমরা নূতন এসেছি আমরা এখন তা ছাড়ি নাই। এই উষ্ণদেশে গোমাংস ব্যবহারের বিষময় ফল আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আসুন, আপনারাও একটু অগ্রসর হউন, আমরাও একটু অগ্রসর হই; হয়ে মিলে মিসে যাই। ভারতে বলের সঞ্চয় করি।

স্বামী। প্রস্তাব সাধু। তোমার আমার কি সাধ্য? তুমি হিন্দুর ধর্ম্ম জান না। সাম্প্রদায়িকতা ও বিভিন্ন মত হিন্দুর সর্ব্বনাশ করেছে। এক এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকে হিন্দুর যে ক্ষতি করেছে, মামুদ বা মহাম্মদ ঘোরী হিন্দুর সে ক্ষতি কর্‌তে পারেন নাই। উপনিষদের ধর্ম্ম হিন্দুর এখন নাই। হিন্দুর মধ্যে শত দল সহস্র দল শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি দলত আছেই, তার পরে রামাত, কবীরপন্থী প্রভৃতি দল আছে। জৈন ও বৌদ্ধ ভাবও হিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করেছে। আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম এক অদ্ভুত ধর্ম্ম। ইহাতে কোন ধর্ম্মই নাই। আবার সকল ধর্ম্মেরই অস্থি, কেশ, নখ, মাংস ও মেদ একটু একটু আছে। দীর্ঘ কালের দলাদলিতে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অতি প্রবল হয়ে পড়েছে ফকির সাহেব! তুমি যে কথা বল্‌ছ, সে বড় উচ্চ কথা। জীবন দিয়েও যদি কিছু কর্‌তে পার্‌তেম, তবে ক্ষতি ছিল কি?

ফকির। চেষ্টাত কর্‌তে হয়।

স্বামী। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর চেষ্টায় কি হ'বে?

ফকির। ধর্ম্ম কি, তাই জানিনা—ধর্ম্মের পথ... একটি বৃহতী মেলা... মহৎ কার্য্যে ব্রতী। তার পক্ষে তোমার এ অ... ময় সৈনিক গণের পদোন্নতি...

জ্ঞানানন্দ স্বামী ফকিরের কথায় উত্তর না করিয়া একটু হাসিলেন। ফকিরও হাসিলেন। উভয়েই বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিলেন। ফকির গমনকালে বলিলেন—"আবার কবে ?"

স্বামীজি উত্তর করিলেন—"শীঘ্রই"।

মহালে সর্ব্বত্র অব্যাহ

গতিও সেইরূপ। আমু

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবাবের অধিরোহণোৎসব।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাণ্ডায় খুব উৎসব হইয়া থাকে—অনেক ধনী মহাজন আসিয়া থাকে ও অনেক গুণী শিল্পীর সমাগম হইয়া থাকে। তাণ্ডায় প্রকাণ্ড মেলা বসে— সুন্দর প্রদর্শনী খোলা হয়। অনেকেই কিছু কিছু উপহার পাইয়া থাকেন। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গের সোলেমান কররাণি বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার রাজ্য দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য বাড়িতেছে, তাণ্ডানগরীর শ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও সোলেমানের যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইতেছে। সোলেমানের সর্ব্ববিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধিরোহণোৎসবের আড়ম্বরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই অধিরোহণের উৎসবে তাণ্ডায় যে কেবল একটি বৃহতী মেলার অধিবেশন হয়, তাহা নহে। এই উৎসবের সময় সৈনিক গণের পদোন্নতি

-হয় ও নূতন সৈনিক মনোনীত ও নিয়োজিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ, সৈনিক ও কর্ম্মচারিবৃন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। বড় বড় সওদাগরগণ এই সময়ে বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নবাব-সরকারের চিত্রকর, বাদ্যকর, নৃত্যকর ভাস্কর প্রভৃতিও এই সময়ে নিযুক্ত হইয়া থাকে। নৃত্য, বাদ্য, সঙ্গীতেরও বিশেষ ধুম হইয়া থাকে। এবার সলিম সার পরামর্শক্রমে হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ নবাবের ব্যয়ে হিন্দুব্যবসায়িগণের তত্ত্বাবধারণে হিন্দু দেবদেবীর এক বারওয়ারী পূজারও অনুষ্ঠান হইতেছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী যেন তাণ্ডার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পশ্চিম দেশ হইতে ক্ষত্রিয় ও মুসলমান মল্লগণ তাণ্ডারদিকে অগ্রসর হইতেছেন। সমগ্র ভারতের ভাল ভাল অসিচালকগণ তাণ্ডায় সমবেত হইতেছেন। তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্যও দলে দলে নবাব-সরকারে পদলাভের লালসায় আসিয়া উপনীত হইতেছেন। নানা দেশ হইতে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী নর্ত্তকীদল তাণ্ডায় আসিয়া বাসা লইয়াছেন। বহুসংখ্যক গায়ক ও বাদক সমবেত হইয়াছেন।

প্রথমে মল্লক্রীড়া। বহুসংখ্যক মল্ল মল্লবেশে মল্লক্রীড়ার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। বহুসংখ্যক দর্শক কৌতুক দেখিবার জন্য, মল্ল ক্ষেত্রের চারিদিকে ভূমিতলে. বৃক্ষে, গোলাকারে—মল্লদিগের কৌতুক দর্শন করিতেছেন। এক কৃষ্ণকায় মল্ল, মল্লক্ষেত্রের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া সকল মল্লকে আহ্বান করিতেছেন। ক্ষত্রিয়, মুসলমান কত মল্লই তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন। সকলেই তাঁহার নিকট মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইতেছেন। তিনি অচল অটল পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলকে পরাজিত করিতেছেন। দর্শকদল তাঁহার ক্রীড়া-কৌতুক

দেখিয়া তাঁহাকে ধন্তধন্ত করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মল্লক্রীড়া হইতেছে। কৃষ্ণকায় মল্লেরই বহু প্রশংসা হইল।

দ্বিতীয় দিন তীরন্দাজ ও গোলন্দাজদিগের খেলা। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ শাখায় বৃহৎ বৃহৎ সোলার ফুল পাখী সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সোলার আম, জাম, বেল, আতা প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাতে নানা বর্ণের চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ভাল ভাল বন্দুক ও ভাল ভাল কার্ম্মুক সংগৃহীত হইয়াছে। গোলন্দাজি ও তীরন্দাজিতে সেই কৃষ্ণকায় পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন। সকলে যে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিল না, সেই সবল-শরীর যুবক সেই লক্ষ্য অনায়াসে ভেদ করিতে পারিলেন। এই দিনে কৃষ্ণকায় পুরুষের অধিকতর সুখ্যাতি হইল। অনেকে কৃষ্ণকায় মল্লের বাসার অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। নবাব-সরকার হইতে আগন্তুক বীর ও যোদ্ধৃগণের নাম ও বাসার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে কৃষ্ণকায় মল্লের নাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাসার ঠিকানা নাই। সকলে অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, তাঁহার নাম অভয় সিংহ, কিন্তু তিনি নবাব-প্রদত্ত বাসা ও আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বয়ং এক বাসা ভাড়া করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন।

কৃষ্ণকায় মল্লের বাসায় কোন রূপ আড়ম্বর নাই। তাঁহার কোন অনুচর বা সহচর নাই। বাসায় তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। তাঁহার সঙ্গে একটি তাম্বুরা, একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও এক খানি সামান্যরূপ অসি। তিনি তাঁহার বাসায় উপস্থিত জনগণকে কথোপকথনে ও কালোয়াতি সঙ্গীত আলাপনে পরিতুষ্ট করিলেন। কেহই বিশেষ কিছু পরিচয় পাইলেন না, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র অবগত হইলেন—তিনি বারাণসী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় মল্ল।

তৃতীয় দিন অসিযুদ্ধ ও পদাতিকদিগের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইল।

এদিন অসি যুদ্ধেও অভয় সিংহ অদ্বিতীয় হইলেন। কোন অসিচালক তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি অসিচালনার, এমন কতকগুলি কৌশল দেখাইলেন যে, তাহাতে দর্শকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তিনি কাহারও হস্তে একটি লেবু রাখিয়া কেবল লেবুটি মাত্র কাটিলেন, অসি হস্তস্পর্শও করিল না। তিনি কাহারও মস্তকে আতা রাখিয়া কেবল আতাটি মাত্র কাটিলেন, অসি মস্তকের কেশও স্পর্শ করিল না। তিনি কতক গুলি তীক্ষ্ণধার অসির উপর দিয়া নগ্ন পদে ক্ষিপ্র গতিতে হাঁটিয়া গেলেন অসি গুলি তাঁহার চরণের ত্বকও স্পর্শ করিল না। তিনি যোদ্ধৃগণকে অসি ধরিতে বলিলেন, চারিখানি অসির মধ্যে আট অঙ্গুলি প্রশস্ত একটি বর্গক্ষেত্রের আয়তন থাকিল। তিনি দূর হইতে যোদ্ধৃগণের স্কন্ধের উপর দিয়া সরল ভাবে আসিয়া সেই চারি অসির মধ্যস্থিত ব্যবধান দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পদাতিকদিগের সৈনিক-ক্রীড়ায়ও তিনি বিশিষ্টরূপে পারদর্শিতা দেখাইলেন।

চতুর্থ দিনে অশ্বারোহী সৈনিকগণের ক্রীড়া হইল। প্রথমে অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনার খেলা। একটি বহুমূল্য সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া ক্রীড়া ক্ষেত্রে আনীত হইল। সমাগত যোদ্ধৃগণ একে একে তাহাতে আরোহণ করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। অনেকেই সেই অশ্বে আরোহণ করিতে পারিলেন না। অশ্বে আরোহণ করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অভয় সিংহ অশ্বের নিকট গমন করিলেন। অশ্বটি পশ্চিমাভিমুখ ছিল, তাহাকে দক্ষিণাভিমুখ করিলেন। তিনি অনায়াসে অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে দক্ষিণমুখে পরিচালিত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে স্বেদজনিত ফেনায়মান অশ্বের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন," অশ্বের দিক

পরিবর্ত্তনের কারণ কি?” অভয় বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—আরোহীর অশ্বারোহণ কালে অশ্ব আপন ও আরোহীর ছায়া দেখিয়া লম্ফ প্রদান করিতেছিল। এখন প্রাতঃকাল পশ্চিমদিকে অশ্বের ছায়া পড়িয়াছিল। অশ্ব দক্ষিণাভিমুখ করিলে অশ্ব কোন ছায়া দেখিতে পাইল না এবং আমি তাহাতে অনায়াসে আরোহণ করিতে পারিলাম।”

অনন্তর অশ্বারোহীদিগের অন্যান্য খেলা আরম্ভ হইল। অশ্বারোহী-দিগের নানাবিধ রহস্য যুদ্ধ হইল। কখন অশ্বারোহিগণ অসি যুদ্ধ করিলেন। কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বল্লম যুদ্ধ হইল। কখন অশ্বারোহিগণ আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করিলেন। কখন অশ্বারোহিগণ তীর চালনা করিলেন। অশ্বারোহীদিগের সকল ক্রীড়ায় অভয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। অভয় আর একটি নূতন খেলাও দেখাইলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার করে শর কার্ম্মুক থাকিল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ জন অশ্বারোহীকে তাঁহার প্রতি শর চালন করিতে বলিলেন। তিনি কেন্দ্র স্থলে থাকিয়া ক্ষিপ্র হস্তে শর চালনা করিয়া দ্বাদশ জনের চালিত শর নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহার শর চালনা-কৌশলকে ধন্য, ধন্য, সাবাস, সাবাস বলিতে লাগিল।

মাতঃ ভারতবর্ষ! আমরা তোমার অধম সন্তান। আমরা তোমার সকল ক্রিয়া কলাপ ভুলিয়াছি—তোমার সকল গৌরব নষ্ট করিতে বসি-য়াছি। তোমার গুণবান্ কীর্ত্তিমান সন্তানগণ যে সকল আয়ুধ প্রণয়ন ও ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার নামও অবগত নহি। তুমি আদর্শ মাতা ছিলে। তোমার সন্তানগণ জগতের সমক্ষে আদর্শ সন্তান ছিল। আমাদের কি সাধ্য আছে? আমাদের সাধ্য কেবল তোমার সুসন্তানগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করা। সেই অশ্রুবর্ষণই বা কয়জনে করে? সেই পূর্ব্বকীর্ত্তিই বা কয়জনে স্মরণ করিয়া বিশ্বাস

করে ? তোমার রাম নাই, তোমার অর্জ্জুন নাই ; তোমার পরশুরাম নাই, তোমার গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব নাই, তোমার পৃথ্বীরাজ নাই, তোমার প্রতাপ নাই। আছি আমরা তোমার দীন সন্তানগণ—আছি তোমার এই সারমেয়-বৃত্তি কাপুরুষের দল। আমরা তোমার সুসন্তানগণের নাম করিয়া হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতেও জানি না। আমাদের যদি তোমার সুসন্তানে ভক্তি থাকিত, তাঁহাদের সুকীর্ত্তি জাগরুক রাখিবার অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলেও আমাদের মৃত দেহে সঞ্জীবনী সুধার পরিচয় পাওয়া যাইত। আমরা সব ভুলিয়াছি—আমরা সব হারাইয়াছি। আমরা আর আমরা বলিতে পারি না--আমাদের বহুত্ব এখন একত্বে পরি-ণত হইয়াছে! আমরা কাহার বলে আমরা বলিব। আমরা সকলেই এখন আমার আমার। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমার আমার—আমাদের স্বার্থসিদ্ধি আমার আমার। আমাদের সাধারণের একস্বার্থ নাই—এক পথে চলিন্দ্র—এক পথে চলিতে জানি না। আমরা মার মুখের দিকে চাহি না—মায়ের কার্য্য বুঝি না, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজীবের ন্যায় নিজের উদর লইয়া ব্যতিব্যস্ত। আমরা এখন মানব হইতে পশুতে নামিয়াছি—আমাদের গতি অধোদিকে। ভাই! ভারতবাসিগণ! একবার মায়ের প্রতি দৃষ্টি কর। একবার মায়ের পূর্ব্বকীর্ত্তি মনে কর, মায়ের কীর্ত্তিমান সন্তানদিগকে হৃদয়ে পূজা করিতে শিক্ষা কর। যে দিন এই পূজা শিখিবে, সেই দিন তোমার পতনের গতিরোধ হইবে ; যে দিন সেই কীর্ত্তির অনুকরণ করিতে শিখিবে, সেই দিন হইতে তোমাদের গতিবেগ ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইতে থাকিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নবাব-দরবারে।

অদ্য তাণ্ডার নবাব ভবনে বিরাট দরবার। তাণ্ডার বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ি-মহলে বারওয়ারী পূজার খুব ধূম চলিতেছে। মেলায় ও প্রদর্শনীতে বহুদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইতেছে ও বহুলোক গমনাগমন করিতেছে। মল্ল, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, অসিচালক, পদাতিক, অশ্বারোহী, বীর ও সৈনিক-গণের ক্রীড়া-প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। নৃত্য, গীত বাদ্য দিবারাত্র কয়েক দিন চলিতেছে। আর কত দিন চলিবে! অদ্য উপাধি-বিতরণ, উপহার-দান, সৈনিকগণের পদোন্নতি-ঘোষণা, নবসৈন্য-নির্ব্বাচন, নবাব-সরকারের গায়ক, বাদক, ভাস্কর, চিত্রকর প্রভৃতির নির্ব্বাচনের কার্য্য হইবে।

সুবৃহৎ নীল রত্নাদিখচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বহুসংখ্যক মহার্ঘ্য আসন

সমূহ আনীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পদস্থ জনগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। রত্নাদি খচিত সর্ব্বোচ্চ আসন বঙ্গেশ্বরের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার নিম্নে বহুমূল্য আসন সকল আমির ওমরাহ-গণের জন্য নবাবের দক্ষিণ দিকে সংগৃহীত রহিয়াছে। নবাবের বাম পার্শ্বে অমাত্যগণের নিমিত্ত বিচিত্র আসন সকল বিরাজ করিতেছে। আমির ওমরাহগণেরও দক্ষিণ পার্শ্বে মৌলবি ও পণ্ডিতগণের নিমিত্ত মনোজ্ঞ আসন সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুষ্পমালা, পতাকা, চিত্রপট, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি ধাতু বিনির্ম্মিত অসংখ্য প্রতি-মূর্ত্তি সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের দর্শক, উপাধি-প্রার্থী উপহার-প্রার্থী, পদপ্রার্থী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে সমাগত হইয়াছেন।

এই বিরাট সভায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। অবিলম্বে চামর হস্তে দুই নকিব আসিয়া নবাবের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। অবিলম্বে সহর কোতোয়াল বহুমূল্য বসনে সজ্জিত হইয়া রৌপ্যদণ্ড স্কন্ধে করিয়া নবাব-সিংহাসনের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গেশ্বর সোলেমান অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

উপাধি বিতরিত হইল, উপহার-দান সম্পন্ন হইল, দাতা ও গৃহীতার মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল। অতঃপর সৈনিক-নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সেই কৃষ্ণকায় মল্ল অভয় সিংহের ডাক পড়িল। অভয় সসম্ভ্রমে নবাব-তক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। অভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া প্রধান অমাত্য বলিতে "লাগিলেন—অভয় সিংহের মল্ল ক্রীড়ায় বঙ্গেশ্বর ও দর্শকগণ বিশিষ্টরূপ পুলকিত হইয়াছেন। অভয়ের অসিশিক্ষাও অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। অভয়ের তীর চালনার কৌশল অতুলনীয়। অভয় একজন প্রধান গোলন্দাজ। অভয় একজন প্রধান পদাতিক ও

উত্তম অশ্বারোহী। এরূপ ব্যক্তির নবাবসরকারে সম্মান ও সমাদর পাওয়া উচিত। আমরা অভয়ের যে যে ক্রীড়া দেখিয়াছি, সকলই ক্রীড়া ক্ষেত্রে। যুদ্ধ ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেক প্রভেদ। ক্রীড়ায় অভয় যে সকল গুণ দেখাইয়াছেন, তাহা অনেক সেনাপতিরও নাই। অভয় যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এইরূপ কৌশলের উপযুক্ত শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইতে পারেন, তবে অভয় ভারতবর্ষের মধ্যে একজন খ্যাতনামা সেনাপতি হইবেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অভয়ের পরীক্ষা হয় নাই। প্রকৃত রণাঙ্গনে অভয়ের বীরপনা পরীক্ষার নিমিত্ত আপাততঃ বঙ্গেশ্বর অভয়কে ৫ শত অশ্বারোহী সেনার নায়ক করিলেন। এই পদ কেহ ১০ বৎসর সৈন্য বিভাগে থাকিয়াও সহসা প্রাপ্ত হন না। অভয়-সিংহের প্রতি বিশিষ্টরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইল। আমরা আশা করি ক্রীড়ার অনুরূপ প্রকৃত যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়া অভয় দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিবেন।”

অমাত্যপ্রধানের বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র অভয় সিংহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—“যশস্বী, গুণগ্রাহী বঙ্গেশ্বরের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি তাঁহার অমাত্য ও সভাসদ্‌গণের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ। যে পদ আমার প্রতি অর্পণ করা হইল, তাহা আপাততঃ আমার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃত পক্ষে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও যাই নাই। সমর-ক্ষেত্রে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ—। যাহা হউক, পদপ্রাপ্তি বিষয় ভিন্ন আমার অন্য বক্তব্য আছে। আমি বারাণসী অঞ্চলের অভয় সিংহ নহি। এই নামে কোন মল্ল ঐ অঞ্চলে আছে কিনা তাহাও জানিনা। আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—পাটুলীর সেই হৃতসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণসন্তান নিরঞ্জন। এই আমি রং ধৌত করিয়া ও দাড়ী অপসারিত করিয়া দেখাইতেছি; আমি সেই নিরঞ্জন। আমার সম্বন্ধে অনেক কুৎসা রটিয়াছে। বঙ্গেশ্বরের নিকট আমার ভাল

মন্দ অনেক কথাই হইতেছে। আমার মনে বড় কষ্ট, হৃদয়ে বড় ব্যথা। প্রতিহিংসা-বহ্নি আমার হৃদয়ে নিয়ত জ্বলিতেছে। যতদিন না অগ্রদ্বীপের কাজির সমুচিত দণ্ড-বিধান হইবে, আমার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া না পাইব, আমার বিগ্রহগুলিকে স্ব স্ব মন্দিরে পুনঃ স্থাপন করিতে না পারিব, যতদিন না আমার গৃহে অতিথিসৎকার আরম্ভ হইবে, ততদিন আমি সভয়ে বলিতেছি, আমার সৈনিক কার্য্য করিবার অধিকার নাই।”

এই সময়ে সলিম শা ফকির বঙ্গেশ্বরকে কি সঙ্কেত করিলেন। বঙ্গেশ্বর তখন বলিতে লাগিলেন—“নিরঞ্জন! আমি জানিলাম তুমি প্রকৃত বীর, রাজদ্রোহী নহ। অগ্রদ্বীপের কাজিকে বন্দী করিবার পরয়ানা বাহির করিলাম। তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলাম। তোমাকে আর ৫ খানি গ্রাম নিষ্কর দিলাম। তোমার সতীর্থ, নবদ্বীপ নিবাসী হরনাথ বিদ্যাভূষণের নিকট সনন্দ পাঠাইলাম যে, তিনি তোমার সম্পত্তি রক্ষা, বিগ্রহ পুনঃস্থাপন ও অতিথিসৎকার পুনরায় আরম্ভ করেন। তোমার ইচ্ছা হইলে, তুমিও তাঁহার নিকট পত্র দিতে পার। তোমার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। তোমার সম্বন্ধে কোন কুৎসা আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তুমি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছ, আমায় ক্ষমা কর’বে। তুমি যেরূপ অচল অটল কালাপাহাড়ের ন্যায় ক্রীড়া-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলে, তাহাতে তোমার ‘কালাপাহাড’ উপাধি হওয়া উচিত। আমি তোমাকে ‘কালাপাহাড়’ উপাধি দিলাম।”

চতুর্দ্দিক হইতে দরবার কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল—“জয়, কালাপাহাড় জী কি জয়, জয়, কালাপাহাড় জী কি জয়, জয় কালাপাহাড় জী কি জয়!”

নবাব পুনরপি বলিলেন—“সময় ভাল হইলে তোমার সম্পত্তি পুনর্প্রাপ্তের অনুমতির সহিত তোমাকে গৃহ গমনের অনুমতিও দিতাম, কিন্তু

তাহা আর পারিতেছি কই? বিষ্ণুপুরের ও পাটনার জাইগীরদার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। বরেন্দ্রের অবস্থাও ভাল দেখ্‌ছিনা। বারেন্দ্রের রাজগণ সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর কেহই পাঠাচ্ছেন না। নিরঞ্জন! তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার নিকট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, হিন্দু মুসলমানে ভেদ নাই। আমার নিকট হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। আমি গুণ ও জ্ঞানের আদর করি। জাতীয় পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করি না। তোমার যেরূপ ভুজবল দেখ্‌লাম, তোমার যেরূপ অস্ত্র চালন কৌশল দেখ্‌লেম, আমি এখন বিশ্বাস করি, তুমি দিন দিন রণক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে, উচ্চ হ'তে উচ্চতর পদ লাভ করবে।"

নিরঞ্জন কৃতজ্ঞতা সূচক দুই একটি কথা বলিতে বলিতে অমাত্য প্রধান বলিয়া উঠিলেন—"আর কথার প্রয়োজন নাই, অনেক কার্য্য আছে। আপনার উপর আজ নবাব দরবারের যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা দেখ্‌ছি, আশা করি আপনি কার্য্যদ্বারা ভক্তি ও যত্ন দিন দিন বৃদ্ধি করাইবেন।"

অনন্তর সভার অন্যান্য কার্য্য হইতে লাগিল। এক দিনে সকল কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন হইয়া উঠিল না। সেদিন মধ্যাহ্নকাল অতীত হইবার পর বঙ্গেশ্বরের জয় ঘোষণা ও তোপ ধ্বনির সহিত দরবার ভঙ্গ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আবার স্বামী জী ও ফকির।

তাণ্ডায় বঙ্গেশ্বরের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান আছে। সকল উদ্যান গুলিই অতি সুন্দর ও সযত্নে রক্ষিত। সে সকল উদ্যানে যাহার তাহার যাইবার অধিকার নাই। নবাব-পরিবারের ব্যক্তিগণ ও নবাবানুগৃহীত আমীর ও ওমরাহগণ এই সকল উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। এই সকল উদ্যানে বসিবার নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মঞ্চ রহিয়াছে। ফকির সলিম সা এই সকল উদ্যানে বিচরণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

তাণ্ডার এক প্রান্তস্থিত এক উদ্যানে একদিন অপরাহ্নে ফকির সলিম সা বিচরণ করিতেছেন। উদ্যানের পার্শ্বস্থিত পথ দিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামী যাইতেছেন। ফকির সাহেব জ্ঞানানন্দকে ডাকিলেন। উভয়ে এক মঞ্চোপরি উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ফকির

জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামীজীর কজন পতিত মানব ও পতিতা মানবীর উদ্ধার সাধন করা হ'লো? পাপ-নদীর মুখে কতটুকু বান্ধাল দিলেন?"

স্বামীজী হাসিয়া উত্তর করিলেন—"উপনিষদ আর কোরাণের ধর্ম্ম এক বুঝাইয়া দিয়ে হিন্দু মুসলমানের একতার যতদূর হ'লো।

ফকির। আমার চেষ্টার ত্রুটি নাই।

স্বামী। আমিও নিশ্চেষ্ট বসে নাই।

ফকির। মেলা উপলক্ষে কিছু করতে পারলেন?

স্বামী। কিছু করলেম বই কি।

ফকির। স্বামীজী! আপনি অনেক কথা পেটে রেখে কথা বলতে চান।

স্বামীজী। ফকির সাহেব! তুমি কি তোমার কার্য্য প্রণালী সুন্দর রূপে বুঝিয়ে দিয়েছ? আমাদের উভয়ের কার্য্য এক। আমারও ইচ্ছা নরের, নরসমাজের মঙ্গল সাধন; তোমারও কার্য্য তাই। আমার বিশ্বাস মানবের ধর্ম্মবল, নৈতিক বল হ'লে, মানব সুখে থাকবে; তোমার মত হিন্দু পাঠানের মধ্যে বিদ্বেষ রহিত ক'রে মানবকে সুখী করবে। তুমি জান, বাঁধার দড়ি শক্ত না হ'লে বাঁধন টেকেনা। নৈতিক বলেরও শক্ত রজ্জু চাই। আমার লক্ষ্য মূলের দিকে, তোমার লক্ষ্য ফলের দিকে। খাদ্যাখাদ্যে ধর্ম্ম নাই, সাম্প্রদায়িকতায় ধর্ম্ম নাই, কোরাণের নিষ্ঠুরতায় অথবা হিন্দুর অন্ধ জাতীয় বিদ্বেষে ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম জীবের কল্যাণ কামনায়, কল্যাণ সাধনায়। সকল ধর্ম্মেরই চরম লক্ষ্য এক। তুমি বল দেখি, কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে স্থির করেছ? আমাদের তোমার মত তত বড় একটা লক্ষ্য নাই। আমাদের একটা সম্প্রদায় আছে, একটা দলও আছে সত্য। আমরা এক এক জনে এক এক দেশে হিন্দুসমাজের ব্যক্তিগত দোষ নিবারণের চেষ্টা ক'রে বেড়াই। তুমি যা বলছ কথাটা

খুব কাজের। তোমার মত অনেক ফকির যদি মুসলমান সমাজে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিষ্ঠুরতা কমিয়ে হিন্দুর প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাইতে পারে—হিন্দু মুসলমানের একতার ফল বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহ'লে কিছু শুভফল হলেও হ'তে পারে।

ফকির। আপনার দলে কতলোক আছে ?

স্বামী। আমার দলে সহস্রাধিক লোক। তোমার দলে কত ?

ফকির। আমার দলে এখনও শত লোক হয় নাই। আমরা প্রথমে ২৭ জন লোক এই মিলনের কার্য্যে ব্রতী হই, এখন ক্রমে ক্রমে আমাদের মতের লোক ৮০।৮২ জন হ'য়েছে। বারেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ফুলবাড়ী নামক স্থানে ফকিরগড় নামে আমরা একটা গড় করেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যভ্রষ্ট, স্বদেশ-বিতাড়িত ভূপতিও আছেন। আমরা ঠিক বুঝেছি, বৈদেশিক অরাতির বিরুদ্ধে এখন কোন কাজ করতে হ'লে হিন্দু-পাঠানের মিলন চাই, দেশের একতা বৃদ্ধি চাই, দেশের শক্তি বৃদ্ধি চাই।

স্বামী। উদ্দেশ্য খুব সাধু, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি, যত দিন না এই মিলন হবে, তত দিন আর দেশের কল্যাণ নাই। একথা হিন্দু বেশ বুঝেছে। তোমার পাঠানের মাথায় এই কথা প্রবেশ কর্‌লেই একতা হ'তে পারে। একটা নবাব বা ক্ষমতা-শালী লোককে এই কার্য্যে ব্রতী কর্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।

ফকির। চেষ্টায় আছি, একটা লোক গঠন কচ্ছি। এ অসাধারণ লোক, এ দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমান এক কর্‌তে পার্‌ব। আমি পুরুষ পক্ষ গঠন কচ্ছি, আপনি প্রকৃতি পক্ষ গঠন করুন।

স্বা। লোকটি কে ?

ফকি। পাটুলীর নিরঞ্জন রায়।

স্বা। নিরঞ্জন! সে যে হিন্দু! আমার পিতৃকুলের মন্ত্রশিষ্য।

ফকি। নিরঞ্জনকে মুসলমান কর্‌ব। নিরঞ্জনের গুণে পাঠান দলকে মুগ্ধ কর্‌ব। পাঠান দল হিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হবে। তারপর হিন্দুর ঘরের কথা জানা, পাঠানের ঘরের কথা জানা, বেদ বেদান্তের পণ্ডিত, কোরাণের মৌলবী, রায় ঠাকুর কে দিয়ে হিন্দু পাঠানের মিলন সাধন কর্‌ব।

স্বা। নিরঞ্জনের কি মুসলধর্ম্মে আস্থা হয়েছে?

ফকি। না, কিছুমাত্র না। তবে হবে, কালে হবে, নিশ্চয়।

স্বা। বেশ, নিরঞ্জনের যদি সে মত হয়, তবে তাহার ধর্ম্মপত্নীকেও আমি সেই মতে পরিচালিত কর্‌তে সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ব। আমি আগামী ভাদ্র মাসে কাশী ও প্রয়াগ ধামে যাচ্ছি। আষাঢ় মাসে পুরুষোত্তমও যাইতে পারি। তোমার এই মত আমার ধর্ম্মভ্রাতৃগণকে জানাইব। সম্ভবতঃ তাঁহারা আমাদিগের সহায় হবেন। কাজটি সাধন কর্‌তে পার্‌লে একটি কাজের মত কাজ করা হয়।

এইরূপ স্বামীজি ও ফকিরে অনেক কথা হইল। ফকিরগড় দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত; উত্তর-বঙ্গরেলওয়ে ষ্টেশন ফুলবাড়ীতে অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় আছে। শুনা যায়, প্রাচীন কালে এই গড়ে অনেক ফকির বাস করিতেন। এই ফকির গড়ে রাজ্যভ্রষ্ট অনেক পাঠান নরপতিও ছিলেন। এই ফকিরদল মুসলমানগণের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের হ্রাস করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। এই ফকির দলের গড়বেষ্টিত দুর্গে বাস করিবার প্রয়োজন এই ছিল যে, তাঁহারা অন্যাতি কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত না হন। রাজ্যভ্রষ্ট পাঠানগণ ফকির হইয়াও শত্রুভয় করিতেন। শুনা যায়, পরবর্ত্তী কালে আরঙ্গজেবের কোন ভ্রাতা আরঙ্গজেবের ভয়ে এই দুর্গে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। শুনা যায়, দিনাজপুরের রাজা গনেশের

পুত্র যদু যে জেলাল নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, তাঁহারও উপদেষ্টা এই ফকির সম্প্রদায়ের একজন। আমি স্বয়ং ফকির গড়ে গমন করিয়াছি। গড় যে অতি প্রাচীন, তার আর সংশয় নাই। গড় ও মৃত্তিকাস্তূপ অদ্যাপি ইহাদের বার্দ্ধক্যের পরিচয় দিতেছে। গড়-মধ্যে এক্ষণে কয়েক ঘর পলিয়ার বাস।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নজিরণের ভবন।

ইষ্ট দ্রব্য লাভকরা এত কঠিন কেন? ইষ্টদ্রব্য লাভকরা কঠিন কিংবা ইষ্ট বস্তু আমরা অতি সহসা লাভ করিতে চাই, তাহার পথে সামান্য কণ্টক থাকাও ভাল বাসিনা, তাই ইষ্ট বস্তু লাভের পথে সামান্য বাধা বিঘ্ন দেখিলে, অথবা সেই পথে অল্প সময় নষ্ট হইলে, আমরা বড় ক্লেশের ও কঠিন কাজ মনে করি—ইহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আবার ইহাও মনে হয়, আমরা সহজ-লভ্য বস্তুকে ইষ্ট দ্রব্য মনে করি না। যাহা সহজে পাই, যাহা আমাদের সম্মুখে আছে, যাহা আমরা হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া পায়ে দলিয়া নষ্ট করিতেছি, তাহা অতি ইষ্ট দ্রব্য হইলেও আমরা ইষ্ট দ্রব্য মনে করিনা। শিশু চাঁদ হাতে পায় না, তাই চাঁদ তার অতি ইষ্ট দ্রব্য। যে যা পায়না, তাই যেন তার ইষ্ট দ্রব্য হইয়া উঠে। এই

কারণে ইষ্ট দ্রব্য লাভের পথে অনেক বাধা বিঘ্ন। মানুষ তাহার প্রকৃতির দোষে কষ্ট পায়। সে অভাব গড়িয়া লয়। সে দুরাশা করিয়া লয়। মানব মানবী আপন কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহার জন্য আক্ষেপ করিব না; মানবের কষ্ট দেখাইতে চেষ্টা পাইব। নজিরণ নবাবের ভ্রাতৃকন্যা। কত মুসলমান সেনাপতি আমির ওমরাহ, ভিন্নদেশীয় নবাব তাহার পাণি পীড়নের প্রয়াসী। নজিরণ মুসলমান স্বামী চাহেন না। নজিরণ চাহেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিরঞ্জনকে তাহার পতিত্বে বরণ করিতে। তাঁহার সুখের পথে কণ্টক, তাঁহার ইষ্ট বস্তু লাভের পথে বাধা, তাঁহার ইষ্ট বস্তু লাভ সময় সাপেক্ষ। নজিরণের এই ক্লেশ, তাঁহার স্বকৃত ব্যাধি।

নজিরণ নিরঞ্জনকে তাঁহার ইষ্ট বস্তু করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ কষ্টের বিড়ম্বনার একশেষ। নজিরণ কালীমন্দিরে বন্দী হইয়াছেন। তাণ্ডার সর্ব্বত্র নজিরণের কুৎসা রটিয়াছে। প্রকাশ্য দরবারে নজিরণের পরীক্ষা হইয়াছে। নজিরণ বন্দিনী হইয়াছেন। আর কি নজিরণের ক্লেশ দেখিতে চাও? যদি দেখিতে চাও, তবে এস পাঠক এস, আমরা চুপে চুপে সভয়ে বঙ্গেশ্বর নজিরণকে যে উদ্যান-ভবনে বন্দিনী করিয়াছেন, তথায় প্রবেশ করি।

ছি ছি! নজিরণ! এত রোদন কেন? তোমার স্নেহময়ী জননী ইহলোকে নাই। তোমার বঙ্গবিজেতা পিতা—স্নেহপারাবার পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের জন্য কয় ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাক? কোথাকার কে নিরঞ্জন, অজ্ঞাতকুলশীল নিরঞ্জন, ঘরবার সম্পত্তিহীন ব্রাহ্মণসন্তানের জন্য এত ক্রন্দন কেন? একি তোমার স্বকৃত ব্যাধি নয়? তুমি নবাবকুমারী, সম্রাটকুমার বা অন্য নবাব-কুমারের সহিত পরিণীতা হইতে ইচ্ছা করিলে এত ক্লেশ পাইতে না। দুরাশা ক্লেশের প্রসূতি। লোকের অধিকাংশ ক্লেশ দুরাশায় হইয়া থাকে।

দুরাশায় ব্যাধির উৎপত্তি, দুরাশায় বন্দিদশায় পরিণতি, দুরাশায় মনস্তাপ। সদিচ্ছা আর দুরাশা এক নহে। যে যাহা সহজে পাইতে পারে, যাহার যাহা পাওয়া ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত, বিধিসঙ্গত, ব্যবহারসঙ্গত তাহার তাহা পাইবার আশা সদিচ্ছা। যাহার যাহা পাওয়া ধর্ম্মসঙ্গত নয়, ব্যবহার-সঙ্গত নয়, অনায়াসলভ্য নয়, তাহাই তাহার পক্ষে দুরাশা। সদাশায় লোকে সুখী হয়, দুরাশায় লোকে কষ্টে পড়ে। আশা মানবের সঞ্জীবনী শক্তি। জীবনের সম্বল। আশা গড়িতে হইবে, আশা-যষ্টি অবলম্বনে সংসারে চলিতে হইবে। আশা পরমায়ুর বৃদ্ধি করে, মানবকে পরিশ্রমে নিয়োজিত করে; অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সহিষ্ণুতা, চেষ্টা, যত্ন, আনিয়া দেয়। আশা-পূর্ণ মানব উৎফুল্ল, কর্ম্মঠ, কর্ম্মরত; আশাহীন নর বিমর্ষ, অলস, নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয়। মানব বুঝিয়া আশা গঠন কর। সদাশা ও দুরাশা বাছিয়া ফেল। সদাশায় বুক বাঁধ, দুরাশাকে নমস্কার করিয়া পথান্তর অবলম্বন কর। উচ্চ আশাই কাহার কাহার পক্ষে দুরাশা হইয়া পড়ে। বিনা উপায়ে উচ্চ আশা সিদ্ধির লালসাই দুরাশা। গোপবালার সামান্য দুগ্ধবিক্রয় করিতে করিতে দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ধনশালিনী ও পরে রাজমহিষী হইবার আশা ও সামান্য মূলধনের কাঁচের বাসন-বিক্রেতার সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান হইয়া রাজ-তনয়ার পাণি-পীড়নের উচ্চ আশা—দুরাশা। তৃণে মাতঙ্গ বাঁধিবার আশা দুরাশা। লম্ফনে বৃহৎ নদী পারের আশা দুরাশা। দৃঢ় ভিত্তিতে সদুপায় দেখিয়া আশা স্থাপন করিবে, নতুবা সংসারে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া চিরজীবন কষ্টে অতিবাহিত করিবে। নজিরণ! তুমি কাঁদিও না।

নজিরণ! তুমি সরলমতি বালিকা। তুমি আদরের পুতুল, সোহাগের প্রতিমা। তোমার আশার পথে কোন দিন কোন কণ্টক পড়ে নাই। তোমার আশার গতি কেহ কখন রোধ করে নাই। তুমি

কখন জীবনে কোন বিষয়ে বাধা পাও নাই। তোমার যৌবন বন্যায় মনো-বৃত্তি তরঙ্গে ছুটিয়াছে। তুমি কখনও এ বৃত্তি রোধ করিতে শিখ নাই—তোমার সখীগণ এ বৃত্তির গতিবৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস করিতে জানেনা; তার পর ফকির সলিম সা তোমার এই গতি ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর করিতেছে। রোরুদ্যমানা নজিরণের নিকট আসিয়া আমিরণ বলিলেন—"নবাবজাদি! আপনি শুনেছেন, আজ নিরঞ্জন ঠাকুরের কি হ'লো? নিরঞ্জন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেলেন, আর তিনি একজন বড় সৈনিক হলেন।"

নজিরণ। তাতে আমার কি? সে বামন ঠাকুর। তার সতী লক্ষ্মী স্ত্রী আছে।

আমিরণ। সে বামন ঠাকুরই হ'ক, আর যেই হ'ক, তার জন্যই ত তুমি পাগল। এমন দুধে আলতার রং তার ভাবনায় কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। চখের উপর কাল দাগ পড়েছে। দিন দিন শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। তারও ত তোমার উপর পুরা টান। তার যদি তোমার প্রতি ভালবাসাই না থাকবে, তবে সেদিন পাগল সেজে এসে তোমার কানে কানে নিজের পরিচয় দিয়ে গেল কেন? তোমার যাতে মিথ্যা কথা বল্‌তে না হয়, তার উপায় করে গেল। সেত নিজের জীবন দিতে এসেছিল বল্লেও চলে। নবাব তাকে চিন্‌তে পারলে, তার মাথা নিশ্চয় কাটতেন।

নজি। সে আমায় ভাল বেসে আসে নাই। তার দোষে একটি নারী-বধ হ'বে তাই রক্ষা কর্‌তে এসেছিল। সে বীর তার জীবনের মমতা নাই।

আমি। ভালবাসার লোককে কি এতই সন্দেহ কর্‌তে হয়? যদি ভালই না বাস্‌বে, তবে নবাব-সরকারে কাজ নেবে কেন? তার ভালবাসা না থাকলেও এই নবাব-সরকারে কাজ কর্‌তে কর্‌তে, তার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তোমায় পেতে তার ইচ্ছা হবেই হবে।

এই সময়ে সহচরী জিজিরণ আসিয়া জানাইলেন, ফকির সলিম সা নজিরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। নজিরণের অনুমতি ক্রমে ফকির নজিরণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ফকির ও নজিরণে অনেক কথা হইল। পরিশেষে ফকির বলিলেন—"মা! কাঁদিওনা, কাঁদিও না। তোমার এক ফোটা চখের পানি দেখ্‌লে আমার বুকে যেন একটা বাজ পড়ে। আর বেশী দেরি হবে না। তোমাকেও আর বন্দী দশায় থাকৃতে হবে না। আগে বাঙ্গালায় হিন্দু পাঠানে এক হ'বে, তার পরে সকল ভারতে সেই দশা হ'বে। আমার মতের লোক দিন দিন বাড়্‌ছে। হিন্দুর মধ্যেও অনেক সন্ন্যাসী তীর্থে তীর্থে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই মত প্রচার ক'চ্ছে। জ্ঞানানন্দ স্বামী এই মত প্রচার কর্‌বার জন্য আপাততঃ পুরুষোত্তমে গিয়াছেন। আমার দলের ফকিরও প্রায় ৮৮ জন হ'য়ে উঠেছে। আজ কাল আর কোথাও হিন্দুপাঠানে মারামারি কাটাকাটি নাই। পাঠানে পাঠানে ও পাঠানে আফগানে সদ্ভাব হওয়ারও প্রয়োজন। সম্প্রতি নবারসরকার হ'তে এক দল সৈন্য বিষ্ণুপুরে যা'চ্ছে। বিষ্ণুপুরের ও পাটনার জাইগিরদার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ ক'চ্ছেন। বিষ্ণুপুর, পাটনা ও বরেন্দ্রের জমিদারদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলেই দেশ শান্তিময় হয়। মা! আর শুনেছ সেই নিরঞ্জন বামন সেদিন নবাব-দরবারে "কালাপাহাড় উপাধি পেয়েছে। নিরঞ্জনও বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে।"

এই কথায় নজিরণ লজ্জাবনতমুখী হইলেন। ফকির আবার বলিতে লাগিলেন—"মা, আজ আর আমার সময় নাই। আমি অনেক স্থানে ঘুর্‌ব। আমি সেনাদলে যাব, বড় বড় সেনানায়ক ও সেনাপতিদের বাড়ী যাব। আমার মত—সাপও মরে, লাঠী'ও না ভাঙ্গে। সব সৈনিককে বেশ করে বুঝাতে হ'বে, বিদ্রোহ দমন করা চাই, আর কোন লোকের

উপর অত্যাচার না হয়—হিন্দুপাঠানের মিলনের পথে কাঁটা না পড়ে। কিসের মোগল, কিসের সম্রাট, হিন্দু পাঠানে মিলিত হইলে আমাদের সঙ্গে পারে কে? মা! আমি এখন আসি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নিরঞ্জনের শয়ন-মন্দির।

রজনী প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। ভাঙা নগরীর গোল-যোগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মানিল কুসুম-সৌরভসম্ভার হরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। রাস্তায় অতি অল্প লোকই গমনাগমন করিতেছে। দূরে দূরে আগন্তুকগণের পদশব্দে কুকুরগণ ডাকিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। শশাঙ্ক অস্ত গমন করিয়াছেন। পুরুষগণের অনুপস্থিতিতে কুলকামিনীগণ যেরূপ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া হাস্য পরিহাসে মগ্ন হয়েন, তারকা-মালাও উচ্চাকাশে যেন সেইরূপ হাস্য পরিহাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একবার পেচক ডাকিতেছে; বাদুড়, চর্ম্মচটিকা পক্ষের শব্দ করিয়া চিঁ চিঁ শব্দ করিতে করিতে একবার উড়িতেছে আবার বাসায় বসিতেছে ও রজনীর গাঢ়তা, ও নিস্তব্ধতার অপেক্ষা করিতেছে—তস্কর ও অসাধু ব্যক্তিগণেরও এই ভাব। ঠাকুর মা বা পিসিমা উপকথা বলিতেছেন, নাতিনী বা ভ্রাতুষ্পুত্রী উপকথা শুনিতেছেন; বৃদ্ধা উপন্যাস কথয়িত্রী শ্রোত্রীর নিদ্রাকর্ষণের বিষয়

অবগত না হইয়া আপন কথা আপন মনে আপনি শেষ করিতেছেন। বাগানের গোলাপ, মল্লিকা, টগর, চম্পক প্রভৃতি পুষ্প-নিকর যেমন তরু-শাখায় বায়ুভরে এদিকে ওদিকে হেলিতেছে—দুলিতেছে, সেইরূপ যৌবন-মদগর্ব্বিতা ভামিনী, কামিনী, সৌদামিনী, সরোজিনী প্রভৃতি নবীনা কুলললনাগণ হেলিয়া দুলিয়া নিজের বসন, ভূষণ ও রূপের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, তাম্বুল-রাগে স্ব স্ব অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিতেছেন।

পাঠক! আসুন আজ একবার বহুদিন পরে নিরঞ্জনের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করি। যোগমায়ার গৃহে বৃহৎ মাদুর বিস্তার করা হইয়াছে। পর্য্যঙ্কে সুন্দর শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। যোগমায়া মাদুরের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন। বড় বৌ, মেজ বৌ, সেজ বৌ ফুল বৌ, ধলা বৌ, রাঙ্গা বৌ সেই মাদুরে উপবিষ্ট আছেন। গল্পের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। রহস্যের ফুয়ারা ফুটিয়াছে। হাসির তরঙ্গিণী কুল কুল নাদে ছুটিতেছে। ফুল বৌ বলিলেন—"হ্যাঁলা দিদি! ভাসুর ঠাকুরের নাকি কি একটা উপাধি হ'লো কালাপাহাড়? আই আই এ আবার কি উপাধি! বামনের ছেলে, ভাল বীর, দ্রোণ, পরশুরাম এই রকম একটা উপাধি হ'লে বেশ হ'তো।"

রাঙ্গা বৌ বলিলেন—"দিদি! তিনি নাকি আবার ঘোড় সোয়ারের সিপাহী হলেন?"

ধলা বৌ। তিনি নাকি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যুদ্ধে চল্লেন?

মেজো বৌ। তোরা কি ঘরে বাইরে এখানে বহুরূপের সং দিতে এসেছিস্ নাকি? তুই সাজিস্ ভৈরবী, তিনি সাজেন পাগল, তুই করিস শিব পূজা, আর তিনি করেন তীরন্দাজী, তোদের ভাবটা কি, তাত বুঝিনা।

প্রবীনা বড় বধূ নথ চোক ঘুরিয়ে, বাউটী বাজিয়ে বলিলেন—"তোরা থাম্‌লো, তোরা থাম্। যার দায়, সেই বুঝে। 'পড়েছে মোল্লার হাতে,

খাবা খেতে বলে সাতে।' যথা সবস্বি গ্যাছে, তা উদ্ধার কর্‌তে হবে। ঠাকুর পো স্বাধীন প্রকৃতির লোক। দাদার কাছে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা নিলে কাজ সহজে হ'তো বটে কিন্তু তিনি তা চান্‌না। আজ কাল ঠাকুরপোর মামাদের ঘরে ঘরে যেরূপ গোল, তাতে সে টাকা নিয়ে বুড়োকে বিপদে না ফেলাই ভাল। সকল কুল বজায় রেখে ঠাকুরপো সম্পত্তি উদ্ধার করেছেন, এখন দুটা একটা যুদ্ধ ক'রে এসে বাড়ী যাবেন। দায় ঠেক্‌লে, পাগলও সাজ্‌তে হয়, অভয়াসিংও সাজতে হয়, আবার যুদ্ধেও যেতে হয়। দায় ঠেক্‌লে বিবিকেও গান শুনাতে হয়। ঠাকুরপো বুদ্ধিমান ছেলে, তাই সব পেয়েছেন। পাহাড় নামটা মন্দ কি? যুদ্ধে পাহাড়ের মত অচল অটল থাক্‌লেই পাহাড় নাম হয়।"

ন বৌ বলিলেন—"কালাপাহাড়ের বৌকে আমরা কি বলে ডাক্‌ব?"

ধলা বৌ। আমরা পাহাড়ে দিদি বলব।

রাঙ্গা বৌ। পাহাড়ে আর কিছুত নয়?

মেজো বৌ। সে ভৈরবী সাজে, পাহাড়ে আর কিছু বল্লেও বেশী হয় না। তোরা শুনেছিস্ লো! সে দিনের পাগল সাজটাও নাকি দিদি নিজেই সাজিয়ে দিয়ে ছিলেন।

ছোট বৌ। বলি দিদি! ভাসুর ঠাকুর ত সেই বিবির সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করেন না?

মেজো বৌ। তা আর করেন না? ভৈরবী বৌয়েরও তার'পর বেশ টান আছে। ভৈরবী সাজ্‌লি যেন নিজের কাজে, বলি সেদিন ঠাকুরপোকে কেন পাগল সাজিয়ে দিলি? সে বজ্জাত মরে মরুক। তাতে তোর এত দরদ কেন? তুই বুঝ্‌ছিস না, সে বেঁচে থাক্‌লে তোরই কপাল পুড়্‌বে।

সেজো বৌ। তোমরা আমায় মান আর না মান, আমি সব একটু

একটু বুঝ্‌তে পারি। আমি দিব্বি চোখে দেখ্‌ছি ভৈরবী বৌর আর কপাল পুড়্‌তে বাকি নাই। ঠাকুরপো পূজা আচ্চা ছেড়েছে, তার পরে মুসলমানের খানা ধর্‌বে, তার পরে মুসলমান হ'বে, আর যে দিন মুসলমান হ'বে, সেদিন সেই ডাকিনী টাকে বে' কর্‌বে। তখন এত সোহাগ, এত আদর, এত প্রণয়, এত ভালবাসা দুপুরের ফুলের মত সব শুকিয়ে যাবে।

বড় বৌ। তা ভৈরবী বৌ কর্‌বে কি? যা অদৃষ্টে আছে, তাই হ'বে। স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য তাই ক'চ্ছে—নারী জাতির যা কর্ত্তব্য তাই করেছে। বিপদে পতিত স্বামীকে উদ্ধার করেছে—স্বামীর দোষে নারীর মৃত্যু রক্ষা করেছে। ওর ধন্যি বুদ্ধি! ধন্যি ফিকির!

মলা বধূ বলিলেন—বলি দিদি! ভাসুর ঠাকুর তো তোকে পূর্ব্বের মতই ভালবাসে?

এই কথার উত্তর হইতে না হইতে নিরঞ্জন গলা ও পদের শব্দ করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিলেন। ঝঞ্ঝা বায়ুর প্রভাবে প্রভাতী কুসুমরাজি বৃন্তচ্যুত হইয়া যেরূপ উড়িয়া যায়, গৃহস্থের আগমনে তস্কর যেমন পলাইয়া যায়, সূর্য্যের আগমনে শশাঙ্ক যেমন পলায়ন পর হন, বধূকুল সেইরূপ নিরঞ্জনের আগমনে ভূষণ-সিঞ্জন করিতে করিতে দ্বার দিয়া বহির্গতা হইলেন। কেবল বড় বধূ একটু অপেক্ষা করিলেন! নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড় বৌ ঠাকুরাণী, আপনারা কে কে এখানে ছিলেন?"

বড় বৌ। আমরা অনেকেই এখানে ছিলাম। ঠাকুরপো! তুমি নাকি শীঘ্র যুদ্ধে যা'চ্ছ?

নিরঞ্জন। শীঘ্র নয়, কল্য।

বড় বৌ। এত তাড়াতাড়ি? ঠাকুরপো কর্‌লে কি? পূজা আচ্চা ছেড়েছ, আবার যুদ্ধে চল্লে। তুমি যে কি কর্‌তে কি করে বসো, সেই আমার ভয়।

নির। বেশী কি কর্‌বো? পূজা অর্চ্চনা বাহ্য আড়ম্বর। ভগবানে ভক্তি থাক্‌লেই হ'ল। আমি আজ কাল যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী, তাতে আর সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় নাই। প্রাণ অন্তেও হবে কিনা, সন্দেহের বিষয়।

বড় বৌ। তা যা হ'ক ঠাকুরপো! নিজের ধর্ম্ম ছেড়ো না, মুসলমান হ'য়ো না, আর সেই ডাকিনীটাকে বে করো না। আমার মাথার দিব্বি —শত দিব্বি।

অতঃপর বড় বধূ গৃহান্তরে গমন করিলেন। নিরঞ্জন আহারে বসিলেন, অশ্রুমতী যোগমায়া তালবৃন্ত ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়ে অনেক কথা হইল। নিরঞ্জনের সহস্র আশ্বাস বাক্যেও যোগমায়ার অশ্রু নিবারিত হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আবার তাণ্ডায় দরবার।

করিম। বল্ দিন ফতে মামুদ আজকের দরবারে কি হ'বে?

ফতেমামুদ। তা আর জানি না! বিষ্ণুপুর ও পাটনার জাইগীর-দারের মাথা কাটা যাবে। পাহাড় সাহেব আজ সেনাপতি হবেন।

করিম। ওরে আমাদের যে সেনাপতি আছেন। এক সেনাপতি থাকতে আর এক সেনাপতি হবেন কি করে?

ফতেমামুদ। আমাদের আছেন নামে সেনাপতি, কামে ত পাহাড় সাহেবই সব। পাহাড় সাহেবের বুদ্ধিবলেই বিষ্ণুপুর জয়। পাহাড় সাহেবের যুদ্ধকৌশলে পাটনা লাভ।

করিম। তা ভাই গুণের আদর কি সব জায়গায় হয়? তার পর পাহাড় সাহেব হেঁদু।

পাঠক বুঝিয়াছেন, উপরে যে দুই ব্যক্তির কথোপকথন উল্লিখিত হইল, তাহারা দুই জনেই সৈনিক পুরুষ। তাহারা উভয়ে পাটনা ও বিষ্ণু-

পুরের যুদ্ধকালে সৈনিককার্য্যে রত ছিল। তাহারা অদ্য তাণ্ডার দরবারে আসিতেছে ও পথিমধ্যে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছে। তাহাদের কথায় বুঝা যায়, তাহারা কালাপাহাড়ের পক্ষপাতী। তাহাদের ইচ্ছা কালাপাহাড় সেনাপতির পদ লাভ করেন, কিন্তু তাহাদের সন্দেহ, বঙ্গেশ্বর বিজেতা মুসলমান ও কালাপাহাড় বিজিত হিন্দু; এই জন্ম তাঁহার সেনাপতিত্ব লাভ হয় কি না। বিজেতা বিজিতে অল্পাধিক পরিমাণে পার্থক্য সকল কালে সকল দেশেই আছে। মুসলমান বিজেতৃগণের সময়েও বিজিত হিন্দুগণের মুসলমানের ন্যায় সকল বিষয়ে সুযোগ সুবিধা ছিল না সত্য, কিন্তু উপযুক্ত হিন্দুর পক্ষে উপযুক্ত পদ লাভের বাধাও ছিল না। হিন্দু রাজস্ব সংক্রান্ত সকল পদই পাইতেন; তাঁহার সৈনিক হইতে সেনাপতিত্ব লাভ করারও কোন বাধা ছিল না। হিন্দু নবাবের মন্ত্রিত্ব পদও পাইতেন। হিন্দু সুবাদার হইবার কোন বাধা ছিল না। হিন্দু নৃপতিগণ যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট কর নবাব সরকারে প্রেরণ করিতে পারিলে, তাঁহারা দেশ শাসন ও পালন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। হিন্দুর বুদ্ধিবল, হিন্দুর শিক্ষাবল, হিন্দুর বাহুবল পাঠান বঙ্গেশ্বরগণ সযত্নে গ্রহণ করিতেন এবং হিন্দুগণও কখন কোন পাঠান বঙ্গেশ্বরের নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হন নাই। তখন হিন্দু পাঠানের একই দেশ ছিল, একই স্বার্থ ছিল। বঙ্গের বা ভারতের উন্নতিতে, উভয় জাতিরই লাভ ছিল। তখন উভয়েই উভয়ের সহায় হইয়া কার্য্য করিত। বঙ্গের উদারনৈতিক পাঠান, আফগান, মোগল বঙ্গেশ্বরগণের কার্য্য পর্য্যালোচনা কর তাঁহাদের সময়ে বঙ্গের সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতি দেখ।

রাজায় প্রজায়, জেতায় বিজিতে মিলনের ফল দেখ, হিন্দু পাঠানে মিলনের ফল দেখ, স্যাক্সন-নর্ম্মাণের মিলনের ফল দেখ। স্যাকসন ও নর্ম্মাণের মিলনে ম্যাগনাকার্টা ও পরে বৃটেনের পার্লেমেণ্ট; হিন্দু

পাঠানের মিলনে তাণ্ডার নবনগরী ও সোলেমান কররাণির ইতিহাস-বিখ্যাত শাসনকাল। বিজেতার বিজিতের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও উভয়ে এক মত হইয়া দেশের কার্য্যে মনোযোগ করণ ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বিজেতৃগণ যদি কেবল বিজিতগণকে দলন করিতে থাকেন, একে একে তাহাদের সত্বাধিকার হরণ করিতে থাকেন, তাহাদিগের মস্তক উত্তোলনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মুষলাঘাত করিতে থাকেন, তবে আর দেশের কল্যাণ কোথায়? মোগল রাজকুল-গৌরব বাদসাহ আকবর উদার নীতি অবলম্বনে হিন্দুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করায় মোগলসাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তদীয় প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব তদ্বিপরীত রাজনীতি অবলম্বন করায় মুসলমান সাম্রাজ্য অন্তঃসার শূন্য ভঙ্গপ্রবণ পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন। বিজেতৃগণ, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া এই কথার অনুসন্ধান লও। বিজিতগণ, তোমরাও মিলনের জন্য প্রস্তুত হও। বিজেতৃগণ, মিলিতে মিশিতে আর কাল বিলম্ব করিও না। আমার কথায় যদি একজন বিজেতা ইতিহাস অনুসন্ধানে ভারত সুশাসনের মূলমন্ত্র লাভ করিতে পারেন, তবে লেখনী পরিচালন সার্থক জ্ঞান করিব ও পরিশ্রমের জন্য সফল কাম হইব।

পূর্ব্ব-বর্ণিত দরবারের ন্যায় তাণ্ডায় অদ্যও এক বিরাট দরবার। এ দরবার নবাবের সিংহাসনাধিরোহণ পর্ব্ব নহে—এ দরবার নবাবের জয়-ঘোষণা। বিষ্ণুপুরের ও পাটনার জাইগীরদারগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দিরূপে তাণ্ডায় আনীত হইয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালা বেহার, বঙ্গেশ্বর সোলেমানের করতল গত হইয়াছে। কালাপাহাড়ের সুখ্যাতিপূর্ণ বীরত্বে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়াছে। আজ যুদ্ধবিজয়ী সৈনিকগণকে উপহার

ও উৎসাহ দিবার দিন—নিরঞ্জন কালাপাহাড়ের উৎসাহ ও পদোন্নতির দিন। আজ রাজায় প্রজায় মিলিয়া জয়োল্লাস করিবার দিন। আবার ভারতে রাজায় প্রজায় মিলন হউক। আমাদের সমবেত শক্তিতে বহিঃশত্রু জয় করিয়া জয়োল্লাসে আসমুদ্র হিমালয় কম্পিত করি।

বঙ্গেশ্বর মহার্হ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আছেন। বঙ্গের মান্য গণ্য প্রকৃতিপুঞ্জ ও অমাত্যগণ যথাযোগ্য আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। বৃদ্ধ সেনাপতি নিরঞ্জনের হস্তধারণ পূর্ব্বক নবাবের সন্নিকটে যাইয়া নিরঞ্জনকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—"এই ব্রাহ্মণ যুবকের বাহুবলে ও রণকৌশলে এবারের জয়। ইহাঁর ন্যায় সাহসী, নির্ভীক, প্রত্যুৎপন্নমতি, শ্রমশীল বীর আমি এ বয়সে আর দেখি নাই। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এই যুবক বঙ্গের গৌরব, বঙ্গেশ্বর সোলেমান কররাণির গৌরব রক্ষা করিতে পার্‌বেন। ইহার কালাপাহাড় উপাধি সার্থক হইয়াছে।"

সেনাপতির এই কথায় পরে বঙ্গেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"কালাপাহাড় নিরঞ্জন! তোমার গুণে আমি পরম পরিতুষ্ট হলেম। নবাব তনয়ার সহিত পরিণয় পাশে আবদ্ধ করাই, বঙ্গেশ্বরের এতাদৃশ উপযুক্ত সেনাপতির উপযুক্ত পুরস্কার; ঈদৃশ পদ্ধতি দেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু তুমি হিন্দু, তোমাকে সে উপহার দিতে পারি না। এস তোমায় আলিঙ্গন করি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস কালে তুমি কররাণি নবাববংশের প্রধান সেনাপতি হবে। আজ তোমায় সহকারী সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলাম। তোমাকে খান সাহেব উপাধি দিয়া এই খেলাত উপহার দিচ্ছি—খেলাত পরিধান কর।"

কালাপাহাড় খেলাত গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা সূচক অভিবাদন ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ উঠিল—"কালাপাহাড় খাঁ সাহেবের জয়! কালাপাহাড় খাঁ সাহেবের জয়! কালাপাহাড় খাঁ সাহেবের জয়!"

অনন্তর বিষ্ণুপুর ও পাটনার পরাজিত জাইগীরদারদ্বয়কে দরবারে আনয়ন করা হইল। পরাজিত বিদ্রোহী জাইগীরদার ও ভূস্বামীর প্রতি পাঠান বঙ্গেশ্বরগণ কঠোর দণ্ডেরই বিধান করিতেন। অদ্য সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। আজ কালাপাহাড়ের ইচ্ছা ও অনুরোধ ক্রমে জাইগীরদারদ্বয়ের অপরাধ ক্ষমা করা হইল। উভয়কে মির সাহেব উপাধি ও খেলাত দান করা হইল। উভয়েই বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় স্ব স্ব জাইগীর লাভ করিলেন। উভয়েই উপযুক্ত যান বাহন লইয়া স্ব স্ব জাইগীরে যাইবার অনুমতি পাইলেন। দরবার 'জয়' শব্দে পূর্ণ হইল।

অতঃপর অপরাপর সৈনিকগণের পদোন্নতি ও পুরস্কার দান করা হইল। সকল সৈনিককেই মিষ্টবাক্যে উৎসাহ দান করিয়া বঙ্গেশ্বর সোলেমান আনন্দিত করিলেন। পরিশেষে ফকির সলিম সা সকলকে সম্বোধন করিয়া নিম্নের কয়েকটি কথা বলার পর সেদিনের দরবার ভঙ্গ হইল।

ফকির বলিলেন:—"এই দুনিয়ার মালিক, ঐ আকাশের দিনের কর্ত্তা, রাতের কর্ত্তা ও রাতের শোভার মালিককে সকলেই একবার মনে মনে চিন্তা কর। সকলেই তাঁর সন্তান। সকলকেই তাঁর যা দিবার শক্তি, তা দিয়েছেন। তিনি হিন্দুকেও যেমন কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়েছেন, পাঠানকেও সেইরূপ দিয়েছেন। উভয়ের বল বুদ্ধি সমান— তবে শিক্ষা ও অভ্যাসে একটু বাড়্‌তে কম্‌তেও পারে। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান। বাপের ইচ্ছা ছেলেগুলি মিলেমিশে থাকে—পরস্পর পরস্পরের সহায় সম্বল হ'য়ে সংসারে উন্নতি করে। খোদার বাঙ্গালার ঘরে দুই ছেলে হিন্দু মুসলমান, আমরা দুই ভাই হিন্দু মুসলমান। আমাদের পিতার ইচ্ছা আমরা একমত হ'য়ে থাকি, সংসারের উন্নতি করি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তাই বলি খোদার ইচ্ছা পূর্ণ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? বাপের আশা ভঙ্গ করা কি পুত্রগণের পাপ নয়? ঘরে গোলমাল করায়—ঘরে অশান্তি থাকায় কি সুখ আছে? ভায়ের দিকে ভায়ে ফিরে না চাওয়া কি মানুষের কর্ত্তব্য? ভাই সকল! আমার এই কথা শুনে কাজ কর। চোক বুজে, হাত জোড় করে, এস আমরা আল্লা তালার নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের গৃহস্বামী বঙ্গেশ্বর সোলেমান দীর্ঘজীবী হউন। আমরা ভায়ে ভায়ে মিলেমিশে তাঁর সোনার ঘরের অশেষ মঙ্গল সাধন করি। ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষের কথা খোদার তালা এদেশের কেতাব হতে উঠিয়ে দিন। এস আমরা সকলে সমস্বরে বঙ্গেশ্বরের দীর্ঘজীবন কামনা করে খোদার নামে দরবার কম্পিত করি—"আল্লা আল্লা আল্লা—আল্লা আল্লা আল্লা—আল্লা আল্লা আল্লা।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দম্পতি।

শুনেছ আজ আমার কি হয়েছে? জাইগীরদারগণের বিদ্রোহ দমনে নবাব বড় পরিতুষ্ট হয়েছেন। আজ আমি খাঁ সাহেব উপাধি পেলেম ও খেলাত পেলেম। নবাব আর বল্লেন, আমি মুসলমান হ'লে নবাব আমার সাতে তাঁর কন্যার বে দিতেন—এই কথা গুলি নিরঞ্জন রজনীতে শয়ন-মন্দিরে তাঁহার পত্নী যোগমায়াকে বলিলেন।

যোগমায়া রোদন করিতেছিলেন। নিরঞ্জনের এই কথায় তিনি অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। হাস্যের খনি, প্রফুল্লতার প্রতিমা, পতিভক্তির মূর্ত্তিমতী দেবী আজ পতির উন্নতির কথাতে এত রোরুদ্যমানা কেন? স্বার্থ! তুমি জগৎ হ'তে দূর হও। তুমি নীচতার খনি, তুমি মনুষ্যত্ব নাশের সুতীক্ষ্ণ অসি। তুমি দেবীত্ব ধ্বংশের কঠিন অশনি। তুমি গৃহবিচ্ছেদের তীক্ষ্ণধার কুঠার। তুমি ভ্রাতৃস্নেহ-নাশের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা। তুমি যৌথ ব্যবসায়-ধ্বংশের জ্বলন্ত আগ্নেয় অস্ত্র। তোমার মোহে মানব পশ্বাচার করে। তোমার অত্যাচারে জনসমাজ

ছারেখারে যায়। আইন আদালত, মামলা মকর্দ্দমা, তোমার ভেল্কি; বিচারপতি এবং ব্যবহারশাস্ত্রোপজীবিগণ তোমার ক্রীড়ার পুতুল। যুদ্ধ তুমি বাধাও। দাঙ্গা হাঙ্গামের মূলেও তুমিই আছ। যে মানব স্বার্থ বলি দিতে পারে, সেই দেবতা। বুদ্ধ স্বার্থবলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; তাই তিনি আজ জগতের এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীর উপাস্য দেবতা। খ্রীষ্ট ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং ভগবানের পুত্র। রাম রাজ্য ও বনিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন ও লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাই রাম বিষ্ণুর অবতার। স্বার্থ কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে পারিলেই মানব মর্ত্ত্য-ধামে জন্মিয়াও অমরত্ব লাভ করিতে পারে। যোগমায়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। পরে সীতার কথা মনে করিয়া অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎ-কাল মৌনী হইয়া থাকিয়া তিনি হাস্যময়ী হইলেন। তিনি স্বার্থ বলি দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চিরজীবন পতির শুভাকাঙ্ক্ষিনী থাকিবেন, স্বীয় স্বার্থ পতির চরণে উৎসর্গীকৃত করিবেন, কখনও নিজের সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না ও পতির মনে কখন কষ্ট দিবেন না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। শুনে বড় সুখী হলেম।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"এত ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হলো কেন? এ যেন তোমার মনের—প্রাণের কথা নয়।"

যোগ। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। যুদ্ধের ক্লেশ, মুসলমানের মধ্যে থাকার কষ্ট, অযত্ন, অনাহার এই সকলে তুমি বড়ই কষ্ট পাও। আর ভাবছিলেম সেনা হ'তে সহকারী সেনাপতি হ'লে ক্লেশ আরও বাড়্ল। সেনাপতি হ'লে ক্লেশের এক শেষ হবে। তবে তুমি যাতে সুখী হও, আমিও তাতে সুখী হই। তারপরে তোমার নবাবের ভাইজির সঙ্গে বের কথাটাও ভাব্ছিলেম। বে'টা হলেই বা ক্ষতি কি?

নির। তুমিত এয়ো সেজে, বরণ করে, বৌ পরিচয় ক'রে, ঘরে আন্‌তে পার্‌বে? আমার দিকে চেয়ে বল দেখি পার্‌বে কিনা?

এই কথায় যোগমায়া প্রফুল্লমুখে নিরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"এয়ো আর সাজতে হবে কেন? এয়োত সেজেই বসে আছি। বরণ ক'রে, বৌ পরিচয় ক'রে, বর বৌকে ফুলের মালায় সাজাতে পার্‌ব, কিন্তু বৌ ঘরে আন্‌তে পার্‌ব না। বৌ যে মুসলমানী।

নির। তুমি কি এয়ো? আমি জানি তুমি বিধবা।

যোগ। আমি জানি আমি এয়ো, আমি সধবা। তবে কিনা যা নিয়ে সধবা, তাকে নিতে কেহ টান্ পাড়া পাড়ি কচ্ছে।

নির। তুমি কি স্বচক্ষে দেখে এলে নাকি?

যোগ। দেখে এসেছি, দেখ্‌ছি, দেখ্‌ব।

নির। যা দেখে এসেছ, তাই দেখে এসেছ। আর কিছু দেখ্‌তে হবে না। ভৈরবী বৌ! তোমার একটা ক্ষুদ্রাশয়তা গেল না। মুসলমানকে এত ঘৃণা কর কেন? স্বামীজি তোমায় কত বুঝিয়েছেন, ফকির সাহেব তোমায় কত বুঝিয়েছেন, তবু তুমি মুসলমানের উপর ঘৃণা ছাড়্‌লেনা। সকলেই মানুষ, সকলেই এক ঈশ্বরের জীব। মুসলমানকে ঘৃণা করি, তার অত্যাচারের জন্যে, তার যদি পিশাচের ন্যায় আচার হয় তার জন্যে; কিন্তু যদি মুসলমান অত্যাচারী না হয়,সদাচার সম্পন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তবে তাহাকে কেন ঘৃণা করিবে? কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কদাচারী লোক-মাত্রেই ঘৃণার পাত্র—তাহার হিন্দুও নাই, মুসলমানও নাই। মন্‌টা একটু বড় কর। জাতীয় বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। স্বামীজি ও ফকির সাহেবের উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখ। তাঁরা বলে গিয়েছেন, তুমি আমি হিন্দু মুসলমানের একতার উপায় হব। যে বিশাল শক্তির রাজ্য আসমুদ্র হিমাচলে স্থাপিত হ'বে, তুমি আমি সেই শক্তির কেন্দ্র হ'ব। ভারতীয়

সকল জাতি সেই শক্তি-পুষ্প মালার ফুল হবে, আর স্বামীজি ও ফকির সাহেবের দল সেই মালা গাঁথ্‌বেন। তোমার যদি মুসলমানের প্রতি এত বিদ্বেষ হয়, তবে সে মহামিলন কার্য্য কিরূপে হ'বে?

যোগ। আমিত মুসলমানকে ঘৃণা করিনা। মুসলমানের মহম্মদ একজন অসাধারণ লোক। কোরাণের আল্লা ও উপনিষদের ব্রহ্ম এক। অভ্যাসের দোষে, আচারের প্রভেদে খাওয়া পরা, ওঠা বসায় আমার মুসলমানের সঙ্গে মিস্‌তে ইচ্ছাকরে না। মুসলমান দেখ্‌লেই যেন প্যাঁজ রসুনের গন্ধ আমি নাকে পেতে থাকি। গো ও কুক্‌ড়ার মাংস আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাকি। মনে ভাবি ঘৃণা ত্যাগ করি, কিন্তু ঘৃণা আপনিই এসে পড়ে।

নির। এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের দোষ।

যোগ। এ অভ্যাস আমি ছাড়্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

নির। আর কর্‌লে! তোমার শুচিবাই যেন দিন দিন বাড়্‌ছে। আমাকেই এখন স্নান ক'রে তোমার ঘরে আস্‌তে হয়।

যোগ। ঠাকুরের পক্ষে গোব্য স্নান যে সেবা ও ভক্তির লক্ষণ।

নির। কা'ল হ'তে কি সে শুলাতেও স্নান করতে হ'বে নাকি?

যোগ। নারায়ণ ঠাকুর যাতে স্নান কর্‌তে পারেন, তাতে তুমি স্নান কর্‌লে আর দোষ কি?

নির। আমিত আর নারায়ণ নয়, আমি যে কালাপাহাড়।

যোগ। কালাপাহাড়েইত নারায়ণ হয়।

নির। কালাপাহাড়ে শিল, নোড়া, থালা, বাটী, পাথর, গ্লাস, হুঁকো খল কতই হয়।

যোগ। মেয়ে মানুষের পক্ষে স্বামী নারায়ণ হতে তুমি পাথরের যত দ্রব্য বল্লে সব ছু'তে পারে।

নির। তোমার যেমন বুদ্ধি তেম্‌নি কথা। এই জন্যই ত স্বামীজি তোমাকে শক্তি সাধনের কেন্দ্র কর্‌তে চান।

যোগমায়া আর কথা বলিলেন না—কথা কাটাকাটীর কথা বলিলেন না। দম্পতির মধ্যে অন্য কথা অনেক হইল। আনন্দপ্রতিমা যোগমায়া ও আনন্দপ্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে অন্য দিন যেরূপ হাস্য পরিহাসের জমাট বাঁধিত, অদ্য সেরূপ জমাট বাঁধিল না। আজ রহস্যের কথা বড় উঠিল না—যাহা উঠিল তাহাও বিষয়ান্তরে লীন হইতে লাগিল। পাটুলীর কথা উঠিল। বাড়ী যাইবার পরামর্শ হইল। অগ্রদ্বীপের কাজির নৈশ আক্রমণ ও অত্যাচারের কথা মনে পড়িল। আবার অতিথিসেবার পারিপাটা ও দেবসেবার ঘটার বিষয় আন্দোলন হইল। গোবিন্দজির সঙ্গে একটি স্বর্ণময়ী রাধামূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হইল। পুরাতন রথ সংস্কারের প্রস্তাব হইল। এ অট্টালিকাটি একটু বড় করিতে হইবে, আর একটির একটু ছাদ বাড়াইতে হইবে। এসব কথাও কিছু কিছু উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবন্ধু থাকার দোষ গুণের আন্দোলন হইল। নিরঞ্জন ভ্রাতার সংবাদ বহুদিন পান না বলিয়া রোদন করিলেন। যোগমায়া কত সমবয়স্কার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের মাতামহসংসারের কথা উঠিল। মাতামহ মাতামহীর উচ্চাশয়তা বর্ণিত হইল। মাতুলানীদিগের ঘৃণ্য ব্যবহার নিন্দিত হইল। মাতুলদিগের স্বার্থপরতা অবজ্ঞাত হইল। মাতুলপুত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা উন্মত্ততা, স্বার্থপরতা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসযত্ন অবজ্ঞার সহিত সমালোচিত ও ঘৃণিত হইল। সকল কথা শেষ হইতে না হইতে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী শান্তিদায়িনী নিদ্রা দেবী আসিয়া দম্পতিকে স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইয়া রজনীর শেষ ভাগের নিমিত্ত স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ সংবাদ।

বঙ্গদেশের অনেক স্থান কাল-সহকারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, ইহাই ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত। বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরেন্দ্রভূমি দীর্ঘকাল হইতে বহু-সংখ্যক জমিদারগণের বাসভূমি। বর্ত্তমান সময়েও ইংরাজ-শাসনে বরেন্দ্রভূমিতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামিগণের বাস। এখন হইতে ৩॥০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বরেন্দ্রভূমি নরপতিবৃন্দে ভূষিত ছিল। যে জ্বরে গৌড় বিধ্বস্ত হয়, সেই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের রংপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জেলা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর লোকে আকীর্ণ ছিল। তখন বরেন্দ্র ও রাঢ়দেশ বঙ্গের গৌরব ছিল। নিম্ন বঙ্গের অধিকাংশ স্থান জল জঙ্গলে পূর্ণ ও শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল। প্রায় মাসাধিক হইল, ফকির সলিম সা পূর্ব্ব বর্ণিত ফকিরদুর্গে গমন করিয়াছেন। জ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার পূর্ব্বেই পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আজ তাণ্ডায় বড় গোল। ফকির সলিম সা তাঁহার এক শিষ্য-

ফকিরের সঙ্গে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, বরেন্দ্রভূমির ভূস্বামিগণ বিদ্রোহী হইয়াছেন। ইতি পূর্ব্বেও বিদ্রোহ সংবাদ আসিয়াছে! পুঁটীয়ার জমিদারগণ বিদ্রোহী হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও বঙ্গেশ্বরের নিকট কর প্রেরণের সাধ্য নাই। অবিলম্বে সৈন্য প্রেরিত না হইলে বিদ্রোহীদিগের একতা কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে— ও বিদ্রোহ পরে দমন করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে।

বঙ্গেশ্বর সোলেমান কররাণী ফকির সাহেবের পত্র পাইয়া বড় শঙ্কিত হইয়াছেন। একবার অমাত্যবর্গের সহিত, একবার সৈনিকগণের সহিত, একবার তাণ্ডার প্রধান প্রধান বড় লোকের সহিত ও অন্যবার এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কতিপয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রথম পরামর্শ সময়-সাপেক্ষ হইল; দ্বিতীয় পরামর্শের যুক্তি গুলি ভাল হইল না। তৃতীয় পরামর্শ বহু-অর্থ-ক্ষয়-কর বলিয়া সকলের সিদ্ধান্ত হইল। চতুর্থ পরামর্শে সকলে এক মত হইতে পারিলেন না। পঞ্চম পরামর্শ অমাত্যবর্গের অভিপ্রেত হইল না। ষষ্ঠ পরামর্শে তাণ্ডার জমিদারদল বাধা দিলেন। সপ্তম পরামর্শে সৈনিক দল বাধা দিলেন। প্রথম দিন এরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল।

প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে নবাব শা উদ্যান ভ্রমণ করিতে মানস করিলেন। নবাব-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী উদ্যানসমূহে সর্ব্বদাই অনেক লোক বিচরণ করেন, কিন্তু নজিরণের গৃহের চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যানে জনসমাগম অতি অল্পই হইয়া থাকে। বঙ্গেশ্বর প্রায় ৪ দণ্ডকাল সেই নির্জ্জন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিলেন। জমিদারগণের বিদ্রোহ নিবারণের উপায় স্থির করিলেন। অমাত্য ও সেনা নায়কগণের সহিত যে সকল পরামর্শ হইয়াছিল, তাহার দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া বিচার করিলেন। সকল পরামর্শ ভাঙ্গিয়া নিজে এক সিদ্ধান্ত করিলেন।

আমিরণ বড় চতুরা। সে নজিরণের পুষ্পোদ্যানে কখন কে আসে, কে যায়, কি হয়, সকল সন্ধান রাখে। সে বঙ্গেশ্বরকে নজিরণের পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। আমিরণ সে সংবাদ নজিরণকে দিয়াছে। আমিরণ ও জিজিরণ নবাব সাহেবকে কিছু বলিবার অপেক্ষায় পুষ্পোদ্যানের এক পথের পার্শ্বে এক লতিকা-কুঞ্জের অন্তরালে দণ্ডায়মান আছে।

বঙ্গেশ্বর জমিদারবিদ্রোহ নিবারণের উপায় স্থির করিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় আমিরণ ও জিজিরণ জানু পাতিয়া যুক্ত করে নবাবের সম্মুখে বসিলেন। আমিরণ বলিলেন—"জাঁহাপানা! বিবি নজিরণ হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

সেই দিন সেই দরবারের পরে আর এপর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বর নজিরণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। বঙ্গেশ্বর অতি লজ্জিত আছেন। নজিরণের তেজস্বিনী ভাষায় কথা ও সরল ব্যবহারে, তিনি তাঁহাকে শুদ্ধচারিণী ভাবিয়াছেন। নজিরণের মর্ম্মস্পর্শী উপহাসে বঙ্গেশ্বর দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। বঙ্গেশ্বরের ঈদৃশ দরবারে স্বীয় ভ্রাতৃতনয়ার চরিত্র-পরীক্ষা অনেকেই নিন্দা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই দরবারে, তাজ খাঁয়ের বংশ লোপ করাই, বঙ্গেশ্বরের উদ্দেশ্য ভাবিয়াছেন। সে দিন সৈনিকদল নজিরণকে শুদ্ধচারিণী ভাবুক আর না ভাবুক, তাহারা সজলনয়নে উচ্চরবে যে বলিয়াছে, "নবাবজাদী কলঙ্কিনী নহেন, কলঙ্কিনী নহেন" তাহাতে বুদ্ধিমান সোলেমান স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, যোদ্ধৃগণের মৃত তাজ খাঁয়ের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এখন বঙ্গেশ্বরের ইচ্ছা নজিরণকে সন্তুষ্ট করেন। আমিরণের কথায় বঙ্গেশ্বর উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, আমিরণ! নজিরণকে এখানে আসিতে বল, আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

অবিলম্বে ৪।৫টি সহচরীর সহিত নজিরণ খুল্লতাত বঙ্গেশ্বরের নিকট

আসিলেন। নজিরণের মূর্ত্তি দেখিয়া বঙ্গেশ্বর সিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"মা! আমি এতই কি পর হয়েছি যে বেমারের সংবাদও আমাকে দিতে নাই? সে বর্ণ নাই, সে রূপ নাই। চেহারায় মালুম হচ্ছে যেন কত কালের পুরাণ রোগী।"

নজিরণ উত্তর করিলেন—"আমার আছে কে? কাকে বল্‌ব? (সজল-নয়নে) পিতা মাতা ইহলোকে নাই। ভ্রাতা ভগিনী কোন দিনই ছিল না। মাতৃকুলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক অনেক দিন রহিত হয়েছে। মাতুল-কুল হিন্দু, তাঁহারা মুসলমানের সহিত সম্বন্ধই বা রাখ্‌বেন কেন? এক খুল্লতাত বঙ্গেশ্বর, আমি ত তাঁহার বন্দিনী। আমি ত বঙ্গেশ্বরের কুলের গ্লানি, কুল-কলঙ্কিনী আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীর চরিত্র পরীক্ষা আমার অদৃষ্টেই ঘটেছে। আমার ন্যায় কুলললনার—প্রকাশ্য দরবারে চরিত্রের পরিচয় পবিত্র কররাণী-বংশের গৌরবের বিষয় হইল! আমার, আর চিকিৎসার প্রয়োজন কি? যমের—"

বঙ্গেশ্বর। মা! থাম থাম। আর তিরস্কার করিতে হবে না। আমার যে ভুল হয়েছে সে ভুল কি তোমার বীর পিতার হইতে পারিত না? তোমার পিতার হিন্দু-কন্যা বিবাহ করা—বল ও কৌশলে, হিন্দু-কন্যা বিবাহ করা কি একটা ভ্রম হয় নাই? মায়ের নিকট পুত্র সর্ব্বদাই ক্ষমা পেয়ে থাকে। নজিরণ, আমায় ক্ষমা কর। আমাকে তিরস্কার ক'রে আর লজ্জা দিও না। আমি তোমার বিবাহের জন্য কয়েকস্থানের নবাবের লোক আস্‌তে লিখেছি; তোমার যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতেত আর এখন সে সব কথা হ'তেই পারে না। আমায় ঠিক বল, খুলে বল তোমার কি পীড়া?

নজিরণ। আমার কোন পীড়া নাই। বন্দিনীর বন্দিদশাই পীড়া।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে চতুরা আমিরণ পূর্ব্বের পরামর্শ অনুসারে সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"জাহাপনা! বাঁদীর ব্যাদবি মাফ ক'রবেন। নবাবজাদীর সেই ব্যারামই আছে। পানির উপরে উঠে আবার সাবেক মত বেড়ে পড়েছে। ফকির সাহেব হাত দেখে শুনে বলেছিলেন যে, নবাবজাদীর নাড়ী যেরূপ ভাবে ক্ষীণ হচ্ছে, তাতে তিনি আর ৬ মাসের বেশী বাঁচ্‌বেন না। ফকির সাহেবের ইচ্ছা ছিল, জাঁহাপনাকে এ কথা জানান, কিন্তু নবাবজাদীর বিশেষ নিষেধে জাঁহাপনাকে জানান নাই। ফকির সাহেব হাকিমের কাছে শুনে আরো বলেছেন, নবাবজাদী বজরায় উঠে ডাঙায় থাক্‌লেও চল্‌বে না—ব্যামার সার্‌বেনা। তিনি বলেছেন ডাঙা হ'তে ২।৷৷ রোজের পথ ভাটীতে যাওয়া উচিত।"

বঙ্গেশ্বর। ফকির এ কথা কত দিন বলেছেন?

আমিরণ। ফকির সাহেব ফকির-গড়ে যাবার আগের দিন বলে গিয়েছেন।

বঙ্গেশ্বর। আচ্ছা, আমিরণ! তুমি নিজে জোগাড় করে বজরা ভাওয়ালে, লোকজন, সিপাই শাস্ত্রী, টাকা কড়ি, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে নজিরণকে নিয়ে আবার পানির উপর কিছু দিন থাকগে। আমি এখনই বড় উজিরকে হুকুম দিচ্ছি, তোমরা যা চাবে তাই পাবে। নজিরণ! তুমি জাননা রাজ্য শাসন কি কঠিন কাজ। আমি তোমাকে যেমন দেখিবার অবকাশ পাই না, সেইরূপ কাহারও তত্ত্ব লইতেই সময় পাই না। কা'ল সংবাদ এসেছে বরেন্দ্রের জমিদারগুলা বিদ্রোহী হচ্ছে। এক দিনও শান্তি নাই, এক মুহূর্ত্তও শান্তি নাই।

নজিরণ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"তাত বটেই। নূতন রাজ্য। জেতা-বিজেতার ভাব এখনও যায় নাই। বাজিকরকে যেমন বনের

সিংহ, বাঘ, ভালুক, বানরকে বাধ্য ক'রে বাজি করতে হয়, বাঙ্গালায় নবাবীও এখন তেমনি হয়েছে।”

বঙ্গেশ্বর আর কথা না বলিয়া চিন্তামগ্ন ভাবে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নজিরণ সহচরীগণের সহিত কিয়ৎকাল উদ্যানে অপেক্ষা করিলেন। বঙ্গেশ্বর গমন করিলে পর, নজিরণের সহচরীগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া হাস্য করিলেন; কোন বয়ঃকনিষ্ঠা সহচরী বলিয়াই ফেলিলেন—"কাজটি বড় সহজেই হইয়া গেল।” সখীগণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া আরো হাসিলেন। এই সময় রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড অতীত হইয়াছিল। আকাশে চন্দ্রমা হাসিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারাদল হাসিতেছিল। নজিরণের উদ্যানে ফুলদল হাসিতেছিল। নজিরণ সখীদলের সহিত হাসিতেছিলেন। চন্দ্রমার হাসি ভূপৃষ্ঠে গড়াইয়া পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীও হাসিয়া উঠিতেছিলেন। বাগানে ফুল দল হাসিতেছিল, সে হাসি গড়াইতেছিল দর্শকের নয়নে। সখীগণ সহ নজিরণ হাসিতেছেন, সে হাসি গড়াইবে কোথায়? ভাবুক পাঠক! তুমি যদি রসিক হও, এই মনোহর হাস্যের মনোহারিত্ব অনুভব করিতে চাও, হাসিতে হাসি বাড়াইতে চাও, তবে গড়িয়ে পড়ুক, হাস্য গড়িয়ে পড়ুক, সহচরী-পরিবেষ্টিতা নজিরণের হাস্য, আমার নবীন পাঠকগণের নয়নেই পড়ুক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সেনাদলে।

"জেনানা লোকের এত কেন? যা বল্লেম, তাই বিশ্বাস কর। ভাল করে বল্লে, দশবার বল্লেও ত বুঝনা।' তোমাদের যে কি ভাব তা বুঝিনা। ভাল মানুষের আর কি হিন্দু মুসলমান আছে। হিন্দুও খুব ভাল হ'তে পারে, মুসলমানও খুব মন্দ হ'তে পারে, আবার মুসলমানও খুব ভাল হতে পারে, হিন্দুও খুব মন্দ হ'তে পারে। আমি যা তোমাকে বল্লেম তা ঠিক। আজ কাল পাহাড় সাহেবের আনলে আর যুদ্ধে যেতে ভয় নাই। মরার দিন ঘুনিয়ে এলে তোমার আঁচলের তলে থেকে মুরগীর সুরো আর রুটী খেলেও মরব, আর যুদ্ধে যেয়ে ঘোড়ার পিঠে নাচতে নাচতে যুদ্ধের বাদ্য শুনতে শুনতে "আল্লা হো আকবর" শব্দে পৃথিবী কাঁপাতে কাঁপাতে মরব। আমাদের সেপাহীর পক্ষে যুদ্ধে মরাই ভাল—এই কথা এক সৈনিক পুরুষ তাহার সহধর্ম্মিণীকে বলিতেছিল।

বক্তা সৈনিক পুরুষের নাম করিম। করিমের কথা শেষ হইতে না হইতে আবেদ বলিল—কি ভাই করিম কি বল্‌ছ?

করিম। কি আর মাথা মুণ্ডু বল্‌ব? জেনানা লোককে বুঝান বড় দায় হয়েছে। আমার জরু বল্‌ছেন কি না, হেঁন্দু হলো সহকারী সেনাপতি; এ যুদ্ধে তিনি হলেন করতা। তাঁর অধীনে যুদ্ধে যেওনা। বিবি সাহেব জেনানা মহলে থাকেন, পাহাড় সাহেবের গুণ কিসে জান্‌বেন?

করিমের পুত্রের নাম ফজ্‌লু। তবে তাহার আর একটা বড় নামও আছে। আবেদ করিমের স্ত্রীকে ফজ্‌লুর মা বলিয়াই ডাকিতেন। আবেদ বলিলেন—ফজ্‌লুর মা! তুমি পাহাড় সাহেবের সুখ্যাতি আজও শুন নাই। অমন মেহেরবান কাদেরদান আদ্‌মি দুনিয়ায় হয় নাই, হবেনা। খোদার তালার দোয়ায় সাহেবের যেমন যুদ্ধে কের্‌দানি, তেম্‌নি সকলের প্রতি ব্যবহার। ঐ যে হেঁদুদের যাত্রায় শুনি, কর্ণের মত দাতা নাই, যুধিষ্ঠিরের মত ধারমিক নাই, ভীমের মত গায় বল আওলা লোক নাই, অর্জ্জুনের মত তীরন্দাজ নাই. আমাদের পাহাড় সাহেবের এক ঘটে সব গুণ। পাহাড় সাহেবের গতরে যেমন বল, সকল অস্ত্র চালাতে তেম্‌নি পটু। ভয় কারে বলে, তা জানেন না। আল্লার কি মর্‌জি, পাহাড় সাহেব ছোট বড় কারে বলে জানেন না। সকলের সঙ্গে সমান ব্যাভার ব্যামোপীড়ে হ'লে, হাত পা কাটা গেলে, কালাপাহাড় তার হাকিম, বাপ, মা, পরিবার। কি কব ফজলুর মা! আমি এক মুখে তার সুখ্যেত করে উঠ্‌তে পারি না। যখন আমাদের বুড়ো সেনাপতি সাহেব বাঁকুড়া ছেড়ে আস্‌বেন ঠিক কর্‌লেন, তখন পাহাড় সাহেব বল্লেন, একটা রাত অপেক্ষা করুন। পাহাড় সাহেব, হনুমান পাঁড়ে আর ছাবেদ খাঁ রাত্রের অন্ধকার মধ্যে সাঁতরিয়ে গড় পার হলেন। গড়ের তিনটা

শাস্ত্রীকে বেঁধে রেখে গোপনে গড়ে প্রবেশ কর্‌লেন, গড়ের দরজা খুলে দিলেন, তখন সকল সৈন্য গড়ে ঢুক্‌লো সেই রাত্রেই গড় ফতে হ'লো। পর দিন বিষ্ণুপুর ফতে হ'লো। "রেশ্‌মি লোক ও লুটের দ্রব্য কালা-পাহাড় পরোশও কর্‌লে না।"

এই কথা হইতে হইতে যোবেদ, উমেদ, রূপলাল সিং, রামরূপ সিং প্রভৃতি অনেক সৈন্য করিমের বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন করিমের পত্নী আবেদকে বলিলেন—"সেই পাহাড় সাহেবকে একদিন দেখাতে পার?"

এই কথায় করিম বলিল—"না না, তা হবেনা, তা হবে না। নবাবের ভাইজি পাহাড় সাহেবের রূপ দেখে পাগল, তুমি তাঁকে দেখ্‌লে কি আর আমার ঘরে থাক্‌বে? তা হ'লে আমি একেবারে গিছি, একেবারে গিছি। তুমি আমার আঁধার ঘরের কালো মাণিক। তুমি আমার বুড়ো কালের দুরন্ত মুরুব্বি। তুমি আমার খানা পিনার খেজমতগার বাবরচি

এই কথায় করিম পত্নী অভিমানিনী হইলেন। করিমের অদৃষ্টে কিছু হইত—ঝড় বজ্রপাত সকলই হইত; কিন্তু কয়েকটি সৈনিককে আগমন করিতে দেখিয়া করিম-পত্নী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অভিমান সাগরেই লম্ফ প্রদান করিলেন। করিম সযত্নে আগন্তুক সৈনিকগণকে উপ-বেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। রূপলাল পাঁড়ে বলি-লেন—"কা'ল সকালেই ত আবার যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।"

যোবেদ। পাহাড় সাহেব সহকারী সেনাপতি হলেও এবার আমা-দের কর্ত্তা হয়ে যাচ্ছেন।

উমেদ। সেনাপতি ত আমাদের নামে সেনাপতি, কামে সেনাপতি ত পাহাড় সাহেব। এর মধ্যে যে কয়টা লড়াই আমরা ফতে করেছি, সবই পাহাড় সাহেবের গুণে।

রামরূপ। গত কয় যুদ্ধে ত সেনাপতি সঙ্গে ছিলেন, এবার যাবেন পাহাড় সাহেব একা।

আবেদ। তা হ'ক, তা হ'ক। সেনাপতি সঙ্গে থাক্‌লে খানা কম দেয়, মাংস কম দেয়, আটা ঘি ত দিতেই চায় না। পাহাড় সাহেব তেমন নন। পাহাড় সাহেবের সব দিকে দৃষ্টি—কিসে কার ভাল কর্‌বেন এই ইচ্ছা।

করিম। বরেন্দ্রতে আমাদের থাক্‌তে হ'বে কত দিন? ক'টা জমিদার ক্ষেপেছে? পাহাড় সাহেবের নামেও এরা ভয় খায়না?

যোবেদ। পিঁপ্‌ড়ের ফড়্‌ উঠে মর্‌বার তরে।

সৈনিকগণের মধ্যে এইরূপ কত কথা হইল। অদ্য সৈনিক দল পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে। কল্য প্রাতঃকালে বিংশ সহস্র সৈন্য কালা পাহাড়ের অধীনে বরেন্দ্র প্রদেশে যাত্রা করিবে। রাশি রাশি যুদ্ধাস্ত্রে তরণী পূর্ণ করা হইতেছে। গাড়ী গাড়ী খাদ্য সামগ্রী নৌকায় উঠিতেছে। রাশি রাশি বারুদ গোলাগুলি সযত্নে লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। মাতঙ্গ দল সাজান হইতেছে। তুরঙ্গম দল মনোনীত করা হইতেছে। ভারবাহী উষ্ট্রদল নির্ব্বাচন করা হইতেছে। আয়ুধ সকল পরিষ্কৃত হইতেছে। ঢাল সকল রঞ্জিত করা হইতেছে। কার্ম্মুক সকল পরিষ্কৃত করা হইতেছে। তাণ্ডায় আজ মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যেন রণরঙ্গিণী অসুরঘাতিনী মহাশক্তি অসুর নিপা-তের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন।

স্থানে স্থানে যুদ্ধ বাদ্য বাজিতেছে। কোথাও যুদ্ধের জয়ঢক্কা সংস্কার করা হইতেছে। কোথাও দামামার পুরাতন চর্ম্মের পরিবর্ত্তে নূতন চর্ম্ম সংলগ্ন করা হইতেছে। কোথাও ভেরীর স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইতেছে। কোথাও তূরীর স্বর পরীক্ষা করা হইতেছে। কোথাও সকল বাদ্য যন্ত্রের সুর মিলাইয়া উত্তম বাদ্য হইতেছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোন সৈনিক-বধূ রন্ধনের ঘটা করিতেছেন; কোন সৈনিক-মাতা পুত্রের পরিচ্ছদের সংস্কার করিতেছেন। কোন সৈনিক-ভ্রাতা ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়িতেছেন না। কোথাও সৈনিকপরিবার একত্র হইয়া কত গম্ভীরভাবে কথোপকথন করিতেছেন। কোথাও সৈনিকবধূ সৈনিক-মাতা, সৈনিক-ভগিনী প্রভৃতি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গোপনে অশ্রুজল মুছিতে-ছেন। কোথাও কর্ত্তব্যপরায়ণা ঐ সকল বীরললনা সৈনিককে স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া রণক্ষেত্রের মৃত্যুর সুখ বর্ণনা করিতেছেন। রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন মহাপাপ বুঝাইয়া দিতেছেন। কোথাও নকিব দল হিন্দি ও পারশিক ভাষায় উত্তেজনাপূর্ণ বীররসাত্মক সঙ্গীত গান করিয়া বীর হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিতেছে। কোথাও ভাটদল ও ভাটবালকদল বীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বীর হৃদয় বীরত্বে পূর্ণ করিতেছে ও বীর প্রসবিনী ভারত মাতার জয় জয় নাদে দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। তাহারা গাইতেছেঃ—

বহু বর্ষ হ'লো রাম নাই হেথা।
বহু বর্ষ হ'লো ভীষ্ম গেছে কোথা।
পার্থ ছিল অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ যথা।
কালের কবলে সকলি লয়॥
পাণ্ডবের গুরু দ্রোণাচার্য্য নাই।
নাই বলী ভীম তুল্য নাহি পাই।
নাই কংসঅরি সদা যারে চাই।
সকলি হয়েছে কালেতে লয়॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বীরের প্রধান।
সে পরশু রাম ব্রাহ্মণ সন্তান।
সুধন্বা সুধীর অব্যর্থ সন্ধান।
গিয়েছে গিয়েছে কালের কোলে॥

প্রবীরের নাম জানে হিন্দুগণ।
অভিমন্যু-কথা জুড়ায় শ্রবণ।
ঘটোৎকচ বীর সাবাস কেমন।
হায় কোথা গেল হরিয়া নিলে ॥
মরেছে মরেছে গিয়েছে গিয়েছে।
সুকীর্ত্তি তাঁদের পড়িয়ে রয়েছে।
শ্রীরামে এখন সকলে পূজিছে।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয় ॥
কুমার ভীষ্মের নাহিক সন্তান।
তথাপি কোথায় যাবে তাঁর মান।
তোয়াঞ্জলি করে হিন্দু মাত্রে দান।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয় ॥
সুকৌশলী যোদ্ধা অর্জ্জুন সুমতি।
লক্ষ্য ভেদি লভে কৃষ্ণা গুণবতী।
কুরুক্ষেত্র রণ জয়ী মহারথী।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয় ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সুধন্বা প্রবীর।
পরশু রামাদি অভিমন্যু বীর।
তাঁহাদের যশে ঝরে অক্ষিনীর।
ধন্য বীরগণ! বীরত্বে জয় ॥

আজ তাণ্ডা সজীব। আজ তাণ্ডার উৎসাহ, উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা, কর্ম্মকুশলতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান ও মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ তাণ্ডায় এমন নর-নারীর মুখ নাই, যাহা উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ নহে। আজ তাণ্ডার এমন লোক নাই, যে সযত্নে কর্ম্ম না

করিতেছে। আজ তাওয়ায় এমন লোক নাই, যে ক্ষিপ্রভাবে চলাচল ছুটাছুটি না করিতেছে। সংগ্রাম! তোমার দোষ অনেক আছে, গুণও যে না আছে, এমত নহে। আজ তোমার পূজা করিতে বসিয়াছি, তোমার দোষ বলিব না, গুণ বলিব। তুমি জ্বলন্ত উদ্যম। তুমি আদর্শ উৎসাহ। তুমি নির্ভীকতার রঙ্গালয়। তুমি মনুষ্যত্ব প্রতিপাদনের ক্রীড়া ক্ষেত্র। তুমি স্বার্থে জন্মিলেও তুমি এক অর্থে স্বার্থবলি গ্রহণের মহা-শক্তি। মা রণশক্তি! তুমি সকল দেশের স্বদেশ-প্রেমিকগণকে তোমার চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া জয় জয় শব্দ শুনিতে শুনিতে অমর ভবনে গমন করিতে দেও—স্বদেশ-আক্রমণকারী শত্রুকে বহিষ্করণে তাহাদের বাহুতে অসীম বল দেও—তাহাদের মস্তিষ্কে অপার কৌশল দেও। পৃথিবী মাতৃভক্ত সুসন্তানে পূর্ণ হউক, মাতৃদ্রোহী রসাতলে যাউক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্র ভূমে।

শাস্ত্রী। বন্দেগি।

নিরঞ্জন। বন্দেগি। কি খবর কোরমাণ?

শাস্ত্রী। হুজুর! একটা নূতন খবর আছে। সাহস দিলে বল্‌তে পারি।

নির। এত ভয় কি? বলনা।

কো। তুরস্ক না আবিসিনীয় দেশ হ'তে দুইটা ছোঁড়া এসেছে। তারা নকরি মাঙ্গ্‌ছে। তারা কান্নাকাটী করে তিনদিন আমায় বড় ধচ্ছে। হুজুরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।

নির। আচ্ছা, নিয়ে এস।

এই কথা গুলি নিরঞ্জন ও কোরমাণ খাঁয়ের সহিত হইল। নিরঞ্জন এখন বরেন্দ্র ভূমিতে। পুঁটীয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন। শুনা যায়,

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তোগলক বংশীয় সম্রাট আলা উদ্দীনের সময় ইঁহারা জমিদারী লাভ করিয়াছেন। আলাউদ্দীনের দুইটি মুসলমান চর বঙ্গদেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বরেন্দ্র ভূমিতে উপনীত হয়। সেই দুই চর, কাহারও মতে এক দল দস্যু, তাহাদিগের শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইবার উপক্রম হয়। সেই দুই মুসলমান চর পুঁটীয়ার রাজবংশের আদি পুরুষের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই আদি পুরুষ অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিজের বিপদের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ও শঙ্কিত না হইয়া, শরণাগত অতিথিকে আশ্রয় দান করেন। সম্রাট-চর-যুগল বিপদ অতীত হইলে স্বদেশে সম্রাটের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিছু দিন পরে বঙ্গদেশ তোগলক সম্রাটগণের পদানত হইলে, সেই দুই চর পুঁটীয়ার রাজবংশের আদি পুরুষের সন্ধান লয় এবং সম্রাটকে বলিয়া কৃত উপকারের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাহাদের নামানুসারে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দুইটি পরগণার জমিদারী প্রদান করায়। পুঁটীয়ার রাজবংশ কখন রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট হন নাই। সোলেমান কররাণির সময়ে বরেন্দ্রে জমিদারবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, এই রাজবংশ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। ইঁহারা বিদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করেন নাই, অথচ বিদ্রোহিগণের ভয়ে নবাব-সদনে কর প্রেরণ করিতেও পারিতেছেন না।

স্রোতস্বতী পদ্মার তীরবর্ত্তী এক পল্লীর প্রান্তস্থিত প্রান্তরে সোলেমানের সহকারী সেনাপতি কালাপাহাড় শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। লাল খাঁ নামক এক ব্যক্তি অগ্রে আসিয়া—পটনিবাস সকল সংস্থাপন করিয়াছেন। সমর-সম্ভার এই স্থানে নৌকা পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সকল স্থলপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সৈন্যগণ কেহ জলপথে কেহ স্থলপথে আসিয়া এস্থানে উপনীত

হইয়াছেন। এই স্থান পুঁটীয়ার রাজবংশের জমিদারীর অন্তর্গত। পুঁটীয়ার রাজবংশ তোগলকদিগের সময়ে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই সময়ে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাজবংশ নবাব-সৈন্যের আগমনে ভয়শূন্য ও চিন্তাশূন্য হইয়া নবাব-চমূর সহায়তা করিতেছেন। এই স্থান সেই লাল খাঁর নামানুসারে লালপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। এই স্থান এক্ষণে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ও নাটোর মহকুমার অধীন। (এই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে একটি পুলিশ ষ্টেসন, একটি ইংরাজি বিদ্যালয়, একটি পোষ্ট আফিস, পুঁটীয়া রাজ বংশের কাছারী ও নীলকর সাহেবের কুঠী বাড়ী আছে।) এই লালপুরের এক সর্ব্বোচ্চ শিবিরে নিরঞ্জন রায় কালাপাহাড় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন্ পথে কোন্ দিক দিয়া যাইয়া বিদ্রোহি-সৈন্য আক্রমণ করিবেন, তাহার উপায় ও রাস্তাদির অনুসন্ধান করিতেছেন। এই শিবিরেই শান্ত্রী কোরমাণ আসিয়া দুইটি আবিসিনীয় যুবকের আগমন বার্ত্তা জানাইয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোরমাণ আবিসিনীয় যুবকদ্বয়ের সহিত কালাপাহাড়ের শিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কালাপাহাড় কোরমাণকে বিদায় দিয়া যুবকদ্বয়কে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। এ সময়েও কালাপাহাড় হিন্দুর ভয়ের আস্পদ কালাপাহাড় হন নাই, তিনি সনাতন ধর্ম্মরত সর্ব্বসদ্‌গুণ সম্পন্ন উদারচরিত বীর নিরঞ্জন রায়।

নিরঞ্জন যুবকদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুবকদ্বয়ের দুগ্ধফেননিভ উজ্জল বর্ণ। দীর্ঘ আকর্ণ বিশ্রান্ত সরলতা ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক নয়ন। তাঁহাদিগের বর্ম্মাবৃত শরীর। কটিদেশে অনতিদীর্ঘ কোষবদ্ধ অসি। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। মুখে অনতিদীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রু। তিনি তাহাদিগকে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোন্ ভাষায় কথা বলিতে পার?"

যুবকদ্বয় উত্তর করিলেন—"তাঁহারা উর্দ্দুর ২।৪টি কথা জানেন ও বলিলে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা আরবিক ও পারশিক ভাষায় ভাল কথা বলিতে পারেন।"

অতঃপর নিরঞ্জনের সহিত তাঁহাদিগের পারশিক ভাষায় কথোপকথন হইতে লাগিল। আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই কথোপকথনের মর্ম্ম এস্থলে বঙ্গভাষায় দিব।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি কাজ জান? কোথায় কি কোন কাজ করিয়াছ?"

যুবকদ্বয়। আমরা অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করিতে পারি। আমরা শরীর-রক্ষকের কাজ খুব ভাল জানি। আমরা তুরস্কের সুলতানের শরীর রক্ষকের কাজ করেছি।

নিরঞ্জন। সে কাজ ছেড়ে এদেশে এলে কেন?

যুবকদ্বয়। দেশ পর্য্যটন ও আদি সভ্য ভারতের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি দেখ্‌তে।

নির। কত দিন থাক্‌তে পার?

যু। ছয় মাস, এক বৎসর।

নির। তোমাদের নাম কি?

যু। সের আলি আর নুর আলি।

নির। কি বেতন চাও?

যু। আহারীয় আর পরিধেয়।

নির। আমার ত শরীররক্ষকের প্রয়োজন নাই। অশ্বারোহী দলে তোমাদিগকে রাখ্‌তে পারি।

যু। আপনার ন্যায় সেনাপতির শরীর রক্ষকের প্রয়োজন নাই?

বিস্ময়! বিস্ময়! তাজ্জব! তাজ্জব! বিদ্রোহীর মধ্যে এসেছেন, সেনাপতির গুরু কার্য্যের ভার আপনার মাথায়।

নির। আমি শরীররক্ষক রাখা ভীরুতা মনে করি।

যু। আমরা খেজ্‌মতগারের কাজও ভাল জানি। আমাদিগকে আপনার খেজ্‌মতগার রাখুন।

নির। আমি হিন্দু, তোমরা মুসলমান। তোমরা আমার কি খেজ্‌মত কর্‌বে?

যু। আমরা হুজুরের জুতা ঝাড়্‌বো। পোষাক রাখ্‌ব। ঘর দ্বার পরিষ্কার করব। শয্যা পাত্‌ব। ঘোড়া সাজিয়ে দিব। অস্ত্রাদি সাফ্ করে দিব। আমরা পার্‌বনা কেবল খানা পিনার জোগাড় কর্‌তে।

কালাপাহাড় নিরুত্তর হইলেন। যুবকদ্বয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না। তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য ২।৪ দিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যুবকদ্বয় কিছু দিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমরা বিদেশী লোক। আমাদের আচার, ব্যবহার, পান, ভোজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি আমরা অনেক সৈনিকের কথাও বুঝিনা। আমাদের বাসের জন্য আমরা একটি পৃথক ক্ষুদ্র তাঁবু চাই, আর সরকারী অশ্বশালায় আমাদের অশ্ব রাখ্‌বার একটু স্থান চাই।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন—"তা পাবে।"

অনন্তর যুবকদ্বয়কে বিদায় দিবার পূর্ব্বে লাল খাঁকে ডাকিয়া যুবকদ্বয়ের বাসস্থানের ও অশ্ব রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যুবকদ্বয় সসম্ভ্রমে সেনাপতিকে নমস্কারপূর্ব্বক বিদায় হইল।

মানব চিনিবার শক্তি বিশেষ হিতকরী। নিরঞ্জনের মানব চিনিবার শক্তি ছিল। তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিয়াছিলেন যুবকদ্বয় কোন ছদ্মবেশী শত্রু নহে। তাহাদিগের মুখশ্রীতেই সরলতা ও পবিত্রতা প্রকাশ

পাইতেছিল। কথোপকথনে সেনাপতির প্রতি তাঁহাদিগের একটু আন্তরিক স্নেহ ঘোষণা করিতেছিল। শুভক্ষণের গুণে নিরঞ্জনেরও যুবকদ্বয়ের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আশ্রয়হীন বিদেশীর ক্লেশ নিরঞ্জন জানিতেন। তিনি বিদেশী যুবকদ্বয়কে আশ্রয় দিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যুবকদ্বয় যেমন ভারতের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি জানিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল, নিরঞ্জনও সেইরূপ বৈদেশিক ব্যবহার জানিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। মানব! তুমি বড় মূর্খ। তুমি বড় ক্ষুদ্রাশয়। তুমি আমার আমার করিয়া মর, কিন্তু তুমি তোমার কে তাহা চিননা। তুমি তোমার অপরিচিত লোক দেখিলেই ভয় কর। তুমি তোমার অব্যবহৃত বস্তু দেখিলেই পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা কর। তুমি কাচ হীরা চিননা। অমৃত হলাহলের প্রভেদ বুঝ না। তুমি জল মিশ্রিত দুধ হইতে হংসের ন্যায় সার গ্রহণে সমর্থ নহ। তুমি রূপ ও গতি শিশুর ন্যায় দেখিয়া কখনবা বিষধর অহিবরকে আলিঙ্গন করিতেছ, কখনবা বা মলিনতা বা অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বহুমূল্য হীরক খণ্ড পরিত্যাগ করিতেছ। মানব! একটু ধীর হও—স্থির হও—সত্যতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হও।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রভূমিতে কার্য্যের সূচনা।

লালপুরে থাকিতে থাকিতেই পুঁটীয়ারাজ বাকি রাজস্ব ও উপায়নের সহিত আসিয়া বঙ্গেশ্বর-প্রেরিত সেনানায়ক রায় নিরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তি সপ্রমাণ করিলেন। তাঁহার লোক জন পূর্ব্বেই লাল খাঁর ও পরে রায় মহাশয়ের অভ্যর্থনা ও সহায়তা করিতেছিলেন। পুঁটীয়ারাজ ও রায় মহাশয়ের কয়েক দিনের পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব জন্মিল।

একদিন সেনাপতি ও পুঁটীয়ারাজ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন প্রহরী পারশিক ভাষায় লিখিত একখানা পত্র আনিয়া দিল। প্রহরী বলিয়া দিল, পত্র এবাদত খাঁ লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্রে এবাদত খাঁর সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এক্ষণে বরেন্দ্রভূমির যে প্রকাণ্ড ভূভাগের উপর বলিহার, ধুবল-হাটী, কাশিমপুর, মহাদেব পুর ও তাহেরপুরের জমিদারগণ জমিদারী

কার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন, এই উপন্যাসের সময়ে এই ভূখণ্ডে এক জন পাঠান কর সংগ্রাহক নবাবের পক্ষে কর সংগ্রহ করিতেন। ইঁহারা চারি পুরুষ কর সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। এবাদত খাঁ, এই কর-সংগ্রহ কারকের চতুর্থ বংশধর। এবাদত খাঁর সৈন্য সামন্ত ও গড়বেষ্টিত দুর্গ আছে। সোলেমান কররাণি তাজখাঁয়ের মৃত্যুর পর তাণ্ডায় নব নগরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যখন রাজত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, তখন এই এবাদত খাঁই বরেন্দ্রের ভূম্যধিকারিগণকে বাধ্য করিয়া লইয়া বিদ্রোহ-বহ্নি জাজ্বল্যমান করিয়া মনে মনে সোলেমানের প্রতিদ্বন্দ্বী নবাব হইবার আকাশকুসুম দেখিতেছিলেন। তিনি যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সৈন্য বৃদ্ধির ব্যপদেশে বরেন্দ্রের জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিতেছিলেন। স্থূল কথা এবাদত বঙ্গের নবাব হইয়া বসিয়াছিলেন।

সংপ্রতি যে ক্ষুদ্র কলনাদিনী তটিনী ইংরাজ-রাজত্বে গঞ্জিকা উৎপত্তির স্থান নওঁয়া গাঁয়ের পাদদেশ বিধৌত করিতেছেন, ইনি এই আখ্যায়িকার সময়ে এক খরতোয়া—বৃহতী নদী ছিলেন। এবাদতের দুর্গ কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তি প্রভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এই নদীর উদরসাৎ হইয়াছে। সেই গুরুপাক বস্তু ভোজনেই যেন এই তটিনী রুগ্না, কঙ্কালাবশেষা ও মৃতপ্রায়া হইয়াছেন।

এখন আর সে চঞ্চল গতি নাই, নৃত্যপরা তরঙ্গিণীর আর সে ভাব নাই, এখন নাম নাই, যশ নাই—আছে কেবল মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণে বর্ষার কুলকুল নিনাদচ্ছলে পরিতাপ ও রোদন। এই বরেন্দ্রের নবাব এবাদত খাঁর পত্র নিরঞ্জন আগ্রহের সহিত হস্তে লইলেন। তিনি পত্রের উপরিভাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষান্তে পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। সেই পত্র বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ এইরূপ।

মহামহিম মহাপ্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়, কালাপাহাড় বঙ্গেশ্বরের সহকারী সেনাপতি মহোদয় প্রবল প্রতাপেষু :—

সেনাপতি মহাত্মন্!

সেলাম বহুত বহুত আরজ্ঞঞ্চ বিশেষ। আমি জাতিতে মুসলমান তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি বঙ্গেশ্বরের করসংগ্রাহকের বংশধর তাহাও হুজুর পরিজ্ঞাত আছেন। বঙ্গেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁয়ের পূর্ব্বে বঙ্গের অরাজকতার অবস্থা আপনি বিদিত হইয়াছেন।

সোলেমান কররাণি উত্তরাধিকার সূত্রে নবাবের মস্‌নদে সমাসীন হন নাই। তিনি তাঁহার ভ্রাতার বিজিত রাজ্য শাসন ও পালন করিতেছেন।

আমি বঙ্গের নবাব অধীনের কর সংগ্রাহক। কররাণি বংশীয় নূতন নবাবের সহিত আমার কি সম্বন্ধ তা আমি এপর্য্যন্ত বিদিত হইতে পারি নাই। আমাকে কখন নবাব দরবারে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই এবং আমিও কখন নূতন বঙ্গেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করি নাই। বঙ্গের নবাবি মস্‌নদে কররাণিবংশীয়দিগেরও যেরূপ অধিকার তাহাতে আমার অধিকারও তাঁহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অধিকন্তু নূতন নবাব প্রাচীন বঙ্গের রাজধানীর প্রাচীন নবাবি গদিতেও অধিরোহণ করেন নাই।

যাহা হউক যখন বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারিগণ, করসংগ্রাহকগণ ও জাইগিরদারগণ নূতন নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতেছেন, তখন আমার স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করা ঔদ্ধত্য মাত্র। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় হিন্দু বীরপুরুষ যাঁহার সহকারী সেনাপতি, তাঁহার অধীনতা স্বীকারে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

আপনি আমার শাসনাধীন প্রদেশের কোন স্থানে আসিয়া শিবির-

সন্নিবেশ করিবেন। আমি এবাদতপুরই আপনার শিবির সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান মনে করি। আপনি শিবির সংস্থাপন করিলেই আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইব। বরেন্দ্রের অপরাপর ভূস্বামিগণের সহিত আমি জোট বদ্ধ নহি। তাঁহারা কি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার সম্বন্ধে আমি অকপটে বলিতেছি সন্ধি করাই আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে।

অধিক কি লিখিব আর আর বিস্তারিত আপনার সাক্ষাতে নিবেদন করিব। বাহুল্যে অলম্ ইতি সন ৯৫৭ তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।

নিতান্ত অনুগত
শ্রীএবাদত খাঁ

নিরঞ্জন পত্র পাঠ করিলেন। পুঁটীয়ারাজ মনোযোগের সহিত পত্র শ্রবণ করিলেন। নিরঞ্জন পরে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন —পত্রে যাহা লিখেছে, তাই যদি এবাদতের মনের কথা হয় তা হ'লে বরেন্দ্র জয় করাত অতি সহজ হবে।

রাজা। এবাদতই এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা। পত্রের কথা এবাদতের মনের কথা ব'লে আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। যে এবাদতপুরে আপনার শিবির সংস্থাপন করতে বল্‌ছে, সে স্থানটী ভাল নয়। তার এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেখানে শিবির সন্নিবেশ করিলে আপনি তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইতে পারেন। কৌশলে আপনাকে বিপন্ন করা এবাদতের ইচ্ছা বোধ হয়।

নিরঞ্জন। এবাদতপুরের এক দিকে নদী আছে। আমি এরূপ ভাবে আমার ছাউনি করিব যে চারিদিক হ'তে আক্রান্ত হলেও আমাকে বিশেষ বিপন্ন করতে না পারে। এই অপরিজ্ঞাত বিল নদী পূর্ণ দেশে এসেছি

কিন্তু আমি স্থলে জলে নির্ভয়ে থাকতে পারি। আমার সেনাদল তেমন ভীরু বা রণবিমুখ নহে।

এই কথোপকথনের পর কালাপাহাড়, রাজা ও অন্যান্য সেনানায়কগণের এই মত হইল যে পরদিন প্রত্যুষেই তাঁহারা এবাদতপুরে যাত্রা করিবেন। এবাদত খাঁর পত্রের নিম্নলিখিত রূপ উত্তর দান করা হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

মহামহিম মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত খান এবাদত সাহেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

খান সাহেব বাহাদুর,

আপনার প্রেরিত লোকের হস্তে আপনার পত্র পাইলাম। আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি। আমরা কল্য প্রত্যুষেই সসৈন্যে এবাদতপুরে যাত্রা করিব। সাক্ষাতের দিন সময় এবাদতপুরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপন করিব।

কররাণি-বংশীয় নবাব সোলেমান পৈতৃক নবাবি মস্‌নদে অধিরোহণ করেন নাই সত্য। বঙ্গের নবাবি মস্‌নদে ধারাবাহিক রূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে নবাবগণ অধিরোহণ করেন না। শৌর্য্য বীর্য্যে যিনি বঙ্গের মস্‌নদ দখল করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বঙ্গেশ্বর হইয়া থাকেন। সোলেমান অতি বিচক্ষণ নবাব। তাঁহার যশঃসৌরভে বাঙ্গালা বেহার পূর্ণ। যে যে জাইগিরদার ও ভূস্বামী সোলেমানের অবাধ্য ছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে সোলেমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুর ও পাটনার জাইগিরদার সোলেমানের বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত সোলেমানের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তাঁহারা বন্দী হইয়াছিলেন

মহাত্মা সদাশয় সোলেমান কেবল যে জাইগিরদারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা সোলেমানের বাধ্য অনুগত থাকায় অঙ্গীকার করায় তিনি তাঁহাদিগের জাইগির প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

আমার সহিত সৈন্যসামন্ত নিতান্ত কম নহে। হস্তী, অশ্বও অনেক আছে। আমাকে সমস্ত বরেন্দ্রভূমিতে বেড়াইতে হইবে। কোন্ ভূস্বামী কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এদেশ ও এদেশের সৈন্য সামন্তের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সকল ভূম্যধিকারীর পক্ষে নবাবের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধি করা উচিত। আমি আপনার সাধু প্রস্তাবে পরম প্রীত হইয়াছি। আশা করি, আপনি আমার বরেন্দ্র বিজয়ের প্রধান সহায় হইবেন। বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিবেদন করিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত নিবেদন ইতি সন ৯৫৭ তারিখ ১৭ ফাল্গুন।

নিং শ্রীনিরঞ্জন দেবশর্ম্মা।

পত্র পত্রবাহকের নিকট অর্পিত হইল। পত্র প্রেরণের পর নিরঞ্জন লাল খাঁকে ডাকিয়া এবাদতপুরে যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইতে বলিলেন। পুঁটীয়ারাজ নিরঞ্জনের ব্যবহারে ও তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পুঁটীয়ারাজ প্রৌঢ় ও নিরঞ্জন যুবক। তিনি নিরঞ্জনকে বরেন্দ্রভূমিতে অতি সতর্কতার সহিত গমনাগমন করিতে ও যুদ্ধাদি করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন বরেন্দ্রভূমির অনেক জমীদার পূজা অর্চ্চনা, দান, অতিথিসৎকার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ খ্যাতিপন্ন হইলেও তাঁহাদের অনেকেই ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয় ও ন্যায়বান নহেন। প্রজাপীড়ন ও স্বার্থপরতা দোষে তাঁহারা অনেকেই কলঙ্কিত। নিরঞ্জন পুঁটীয়ারাজের উপদেশ বাক্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ না পিশাচ।

নবাব-বাহিনী এবাদতপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে সেনাপতির সর্ব্বোচ্চ শিবির। সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত অশ্বারোহিগণ দুই শ্রেণীতে সর্ব্বদাই বিচরণ করে। অশ্বারোহীদিগের পুরোভাগে আর দুই শ্রেণীতে পদাতিকগণ বিচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে নবাব-অনিকিনীর শিবির একটি সমচতুষ্কোণ ব্যূহ। রণকুশল বীরমাত্রেই এই সেনা-নিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিবেন ইহা ব্যূহ; সাধারণ যুদ্ধশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকমাত্রই ইহা একটি সেনানিবেশ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিবেন না। এই ব্যূহের দ্বার, দ্বাররক্ষী, সেনাপতির স্থান প্রভৃতি সুন্দর রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

সেই আবিসিনীয় যুবকদ্বয় ব্যবহারে ও কর্ম্মকুশলতায় সেনাপতির শিবিরের ভৃত্য হইয়াছেন। সেনাপতিরও তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহারাও প্রকৃত প্রভুভক্ত কিঙ্করের ন্যায় প্রভুর প্রতি

যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাঁরা সর্ব্বদাই সেনাপতির নিকটে থাকিয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সংবাদ বহন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ, পুষ্পমালাদি বিরচন, পটমণ্ডপ সুসজ্জিত করণ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। সেনাপতি তাঁহাদিগের সহিত কোরাণের বিচার করিয়াও সুখী হইয়াছেন। যুবকদ্বয় অনেক পারশিক গ্রন্থেও পণ্ডিত।

আজ সেনাপতির শিবিরে এবাদত খাঁর আগমনের দিন। বেলা ৪ দণ্ড উভয়ের সাক্ষাতের সময়। এবাদত ৫ শত সৈনিক সহ সেনাপতির শিবিরে আসিবেন, ৫০টি মাত্র সৈন্য সহ সেনাপতির শিবিরে যাইতে পারিবেন। সেনাপতি কেবল দুইটি মাত্র বিদেশীয় ভৃত্য নিকটে রাখিতে পারিবেন, এইরূপ বন্দোবস্তে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইবে। সেনাপতির গৃহে কথোপকথন কালে সেনাপতি তাঁহার এদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ দুইটি যুবক ভৃত্য ও এবাদত খাঁ ভিন্ন আর কেহই থাকিতে পারিবেন না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবাদত খাঁ আসিলেন। তিনি সেনাপতির পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। আদর অভ্যর্থনা ও পরস্পরের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা শেষ হইল। পরে উপস্থিত কার্য্য বিষয়ে কথা আরম্ভ হইল। উভয়েই বীর, উভয়েই নির্ভীক। উভয়ের মধ্যে একখানি মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুসজ্জিত গোলাকার মঞ্চ ও তাহার উভয় পার্শ্বে দুই জনে উপবেশন করিবার মহার্ঘ্য আসন।

এবাদত বলিলেন—"শুনেছি আপনি হিন্দু ব্রাহ্মণ। আপনার প্রতি নাকি নবাবের লোক, অগ্রদ্বীপের কাজি বিশেষ অত্যাচার করেছিল?"

নব পরিচিত ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন ভদ্রতা বিরুদ্ধ হইলেও নিরঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—"হাঁ হয়েছিল—খুব বিবাদ হয়েছিল। আমি সেই বিবাদে সর্ব্বস্বান্ত হই।"

এবাদত। সেই নবাবের সরকারে আপনি কার্য্যগ্রহণ কর্‌লেন কেন ?

নিরঞ্জন। উপায়ান্তর নাই ব'লে।

এবাদত। আপনি যেরূপ বীর, সৈন্যগণ আপনার যেরূপ অনুগত তাতে ইচ্ছা কর্‌লে সোলেমান যেরূপ নবাব আপনিও সেরূপ নবাব অনায়াসে হ'তে পারেন।

নির। সৈন্যত আমার নিজের নয়। তার পরে অর্থ কোথায় পাব ?

এবা। সৈন্য কাহারও পৈতৃক নহে। চেষ্টা কর্‌লে অর্থের অভাব কি ?

নিরঞ্জন এবাদতের মনোভাব বুঝিয়া এবাদতের এবংপ্রকার কথার প্রশ্রয় না দিয়া বলিলেন—"খাঁ সাহেব! বিশ্বাস-ঘাতকতা মহাপাপ। আমি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ঘটনা চক্রে পড়ে হউক, সোলেমানের দাসত্ব গ্রহণ করেছি। অঙ্গীকার করেছি, আমি তাঁহার কল্যাণ সাধন কর্‌ব। তাঁর রাজ্যাধিকার যেরূপেই হউক, দাসের তাহা প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। আমি দাস, দাসের কার্য্য করিব—প্রভুর হিত-সাধন কর্‌ব—বরেন্দ্রের বিদ্রোহ দমন কর্‌ব।"

এবাদত কম চতুর নহেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমি আপনার মন পরীক্ষা কর্‌লেম। এই যে সন্ধি পত্রের আমি এক মুসবিদা করেছি, অনুগ্রহ করে দৃষ্টি করুন।"

নিরঞ্জন মনোযোগের সহিত সন্ধি পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সন্ধি পত্রে সেনাপতির মন আকৃষ্ট হইলে, এবাদত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি "বেলা কত হইল, বেলা কত হইল" বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া মঞ্চের এক পার্শ্বে—পট মণ্ডপের এক পার্শ্বে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং হঠাৎ ঠিক সেনাপতির পার্শ্বের দিকে আসিয়া বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে এক সুতীক্ষ্ণ হস্তপ্রমাণ ছুরিকা বাহির করিলেন। সেই ছুরিকা নিরঞ্জনের

পৃষ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার হস্তে এমন এক কঠিন দণ্ডাঘাত হইল যে, তাহাতে এবাদতের হস্ত হইতে ছুরিকা ছুটিয়া যাইয়া পটমণ্ডপের দ্বারে দশ হাত দূরে পড়িল। দণ্ডাঘাতও ছুরিকাপতনের শব্দে নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিলেন—দণ্ডহস্তে সের আলি ও এবাদত ভূপতিত ছুরিকা উত্তোলন করিতেছে। নিরঞ্জন দৃষ্টি করিলেই সের আলি বলিল—"বিশ্বাস ঘাতক নৃশংস এবাদত আপনার নিধন সাধনে যত্ন করিয়াছিল।" এবাদত ছুরিকা উঠাইয়া লইয়া বলিল—"কৌশলে শত্রু বিনাশ হইল না, যুদ্ধে হইবে।"

সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় নিরঞ্জন অসি হস্তে এবাদতের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এবাদত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল এবং শরীর রক্ষকগণের সহিত সবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। নিরঞ্জনও অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সেনাপতির শিবিরের সম্মুখে নবাবসৈন্যের সহিত খাঁসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম বাধিল। নিকটস্থ বনের মধ্য হইতে খাঁর প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য বহির্গত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। খাঁয়ের সাড়ে তিন হাজার সৈন্য নিরঞ্জনের দশ হাজার সৈন্যের নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে লাগিল। ঝটিকা প্রবাহিত হইলে শিমূল তরুর স্ফুটন্ত ফল মধ্য হইতে তুলারাশি যেরূপ উড্ডীন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ নবাব সৈন্যের সহিত খাঁর সৈন্যের দুই দণ্ড যুদ্ধ হইতে না হইতেই খাঁর সৈন্য দ্রুতবেগে পলায়ন পর হইল। কতিপয় সৈন্যের সহিত কালাপাহাড় এবাদত খাঁর অনুগমন করিলেন। পলায়িত এবাদতও পশ্চাৎ ধাবিত কালাপাহাড় নক্ষত্র বেগে ছুটিতে লাগিলেন। মৃত মাতঙ্গ ও তুরঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ণ হইল। এবাদতের তিন সহস্র সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইল। এবাদতপুর শোণিতরাগে রঞ্জিত

হইল। মৃত হস্তীর পর মৃত হস্তী, মৃত অশ্বের উপর মৃত অশ্ব, মৃত মনুষ্যের পর মৃত মনুষ্য, মনুষ্যের পর হস্তী, অশ্বের পর মনুষ্য, মৃত অশ্ব হস্তী মনুষ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে আকীর্ণ হইয়া পড়িল। হস্তহীন, পদহীন, আহত সৈনিক দলের চীৎকারে যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ণ হইল। নবাবসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উচ্চ জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়া উচ্চরবে বলিতে লাগিল—আল্লা-আল্লা-আল্লা। জয় বঙ্গেশ্বরের জয়! জয় সোলেমান কররাণীর জয়!

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বারকয়ের জমিদারী।

বর্ত্তমান সময়ে রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী নওয়া গাঁ মহকুমা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে ধুবলহাটী গ্রামে যে দানশীল রাজবংশ আছেন, তাহা অনেক বঙ্গবাসী অবগত আছেন। এই রাজবংশের জমিদারীকে যে বারকয়ের জমিদারী বলে, তাহাও রাজসাহী অঞ্চলের অনেকে বিদিত আছেন। এই জমিদারীর সহিত কালাপাহাড়ের বরেন্দ্রবিজয়ের সংস্রব আছে। আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই ইতিহাস বিবৃত করিব।

ধুবলহাটীর রাজবংশ শৌণ্ডিক জাতীয়। ইহাঁদের আদি পুরুষ অতি ধার্ম্মিক মধ্যবিৎ গৃহস্থ ছিলেন। অতিথিসৎকারের নিমিত্ত তাঁহার নানাবিধ আয়োজন থাকিত। অতিথিকে যে দিন তিনি আহার দিতে না পারিতেন, সেদিন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে দিনাতিপাত করিতেন। রৌদ্রের তেজ বাড়িলে তিনি পথিমধ্যে খাদ্যোপকরণ লইয়া অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের নামে ছত্রের নাম রাখিতেন। পান্থগণ কাহার ছত্র জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার গুরুদেবের নাম করিয়া বলিতেন, ছত্র রামা-

নন্দ গোস্বামীর। যাঁহারা অন্ন ব্যঞ্জন খাইতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন দিতেন। যাঁহারা অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে অসম্মত হইতেন, তাঁহাদিগকে রীতিমত সিধা দান করিতেন। সেই জমিদার বংশের আদিপুরুষের নাম বাহির করিবার জন্য দান ছিল না।

একদা মধ্যাহ্নের, তপনের,প্রখর করে কোন পান্থ ক্লান্ত হইয়া তাঁহার প্রান্তর মধ্যস্থিত ছত্রে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে তাহার শ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তিনি পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে কোথায় ছিলেন, তাহা পান্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্থ বলিতে লাগিলেন—"কল্য বেলফুলিয়া গ্রামে রামদেব ভট্টাচার্য্যের বাটীতে অতিথি ছিলাম।"

অনন্তর অতিথিকে মুখ ও পা ধুইবার জন্য অতি শীতল জল দিলেন। পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

জমিদার বংশের বৃদ্ধ আদিপুরুষ তাঁহার নিজেরই যেন শ্রান্তি দূর হইল এইরূপ ভাবের উত্তর করিলেন— আ—আ—আ, তারপর—

পান্থ। তারপর শীতল জলে স্নান করলেম! উত্তম পুষ্প বিল্ব ও তুলসী পত্রে পূজা করলেম। পরিপাটী জল খাবার, ডাবের জল, মিশ্রির পানা মুগের অঙ্কুর, ছানা, সর, চিনি শাঁকআলু —

আঃ পু। আ— আ— আ—, তারপর —

স্থূল কথা জমিদার বংশের আদিপুরুষ অনুভব শক্তিতে, সহানুভূতিতে আগন্তকের সহিত একমন, একপ্রাণ হইয়া যাইতেন। সেই লোকের সুখে সুখী হইতেন, সেইলোকের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। আগন্তুক পান্থ যদি বলিতেন, গত দিন কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া কোন আশ্রয় যত্ন পান নাই, তাহা হইলে তিনি সেই গৃহস্থকে গালিবর্ষণ করিতেন। পান্থ পূর্ব্ব দিনের পান ভোজনের যেরূপ ঘটা বলিতেন, তিনি তদপেক্ষা ভাল পান ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ধার্ম্মিকের মনপ্রাণ আর তোমার আমার মনপ্রাণে স্বর্গ নরক প্রভেদ। ধার্ম্মিকের যে কথা শুনিয়া আমরা উপহাস করিব, ধার্ম্মিক সেই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তোমার আমার যে কথায় কিছু মাত্র দয়া হয় না, ধার্ম্মিক শিক্ষার গুণে হৃদয়ের ভাবে সেই কথায় হয় ত কত অশ্রু বর্ষণ করিবেন। কেহ কোন নিরাশ্রয় বালক দেখিলে, 'দূর হ, দূর হ' বলিয়া তাড়াইয়া দিবে, কেহ তাহার অনাথ বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইবেন। সংসার বৈচিত্র্য খনি। এখানে কত চরিত্র সমান্তরাল ভাবে চলিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য সমান্তরাল ভাবে চলিতেছে। কেহ দানে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কেহ পরের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কেহ জীবনে মিথ্যা বলিতেছে না, কেহ মিথ্যা বলাই জীবনের এক মাত্র ব্রত স্থির করিয়াছে। কেহ পরের উপকার ভিন্ন করে না, কেহ বা পরের অহিত করিয়াই জীবন পাত করে। দস্যুতা কাহারও ব্যবসায়, আর দস্যু দলন কাহারও জীবন ব্রত। এই রঙ্গ মঞ্চে—এই ভব-স্বপ্নাগারে—এই সংসার-বাতুলালয়ে কে কোন খেলায় জীবনপাত করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এবাদতের পলায়িত সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগে কালাপাহাড়ের সৈন্য অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল। এক এক দল বিদ্রোহি-সৈন্যের পশ্চাতে, এক এক দল নবাব-সৈন্য সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। স্বয়ং কালাপাহাড় এবাদতের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের সহিত কতিপয় সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

এবাদতের বিশ্বাসঘাতকতায় বেলা দেড় প্রহরের সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুই দণ্ড কাল তুমুল সংগ্রাম হয়। প্রায় দুই প্রহরের সময় পলায়ন ও পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ হয়। যে দিন এবাদতপুরে যুদ্ধ হয়, সেই দিন প্রায় বেলা সার্দ্ধ তিন প্রহরের সময় ছয়জন অশ্বারোহী পুরুষ বর্ম্মাক্ত

কলেবরে রুধিরসিক্ত বসনে ধীরে ধীরে অশ্বারোহণে সেই রাজবংশের আদিপুরুষের ছত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কত গ্রাম, কত স্থান অতিক্রম করিয়াছেন, কেহই তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন নাই। সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বীরোচিত রুধিরাক্ত বসন, সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ, উচ্চ উচ্চ অশ্বের ক্ষিপ্র গতি দর্শনে সকলেরই ভয় হইয়াছে। রাজবংশের আদিপুরুষ তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া বলিলেন—"আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। এই কুটীরে আসুন। বড় শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। পানাহারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।"

সৈনিকগণ পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছেন। তাঁহারা বিনাবাক্য ব্যয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ব্যস্ততার সহিত স্নান আহ্নিক করিলেন। তাঁহারা সুশীতল বারি পান করিলেন। এই সময়ে ছত্রের অপরাপর অতিথিগণ আহার ও বিশ্রাম করিয়া বিদায় হইয়াছিলেন। আগন্তুক সৈনিকগণ যে যে আহারীয় দ্রব্য পাইলেন, তন্মধ্যে বারটি কৈ মৎস্য প্রধান; সেরূপ কৈ মৎস্য—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ব্যস্ততার সহিত স্বপাক অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া আবার যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। যাত্রাকালে ছত্রের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় দয়া করিয়া আপনার নামটি বলুন।"

ছত্রের কর্ত্তা নাম বলিলেন এবং আগন্তুকদিগের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন সৈনিকদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন—"আমাদের নাম ধাম জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা নবাব-প্রেরিত সৈনিক। এবাদতপুরে আমাদের ছাউনী। এবাদতপুর এখান হইতে কোন দিকে, কত দূর?

আমরা আশীর্ব্বাদ করি, আপনার এই পুণ্যফলে আপনি ও আপনার বংশধরগণ রাজোপাধিধারী জমিদার হউন। একটি কথা আপনাকে ব'লে যাই, যদি কখন বঙ্গেশ্বরের সহকারী সেনাপতি নিরঞ্জন রায় আপনাকে ডেকে পাঠান, তবে আপনি অবশ্য দেখা করবেন।”

ছত্রস্বামী উত্তর করিলেন—“এবাদতপুর তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব দিকে—এই মাঠ,ঐ গ্রাম ও তার পরের মাঠ পার হইলেই এবাদতপুর। আজ্ঞে, আমি জমিদারী চাই না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ও আমার বংশধরগণের যেন দেবদ্বিজে ভক্তি হয় ও পরলোকে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। আর আশীর্ব্বাদ করুন, বরেন্দ্রে শান্তি স্থাপিত হউক, নর-রক্তে আর যেন বরেন্দ্র প্লাবিত না হয়।”

সৈনিকগণ এই কথায় আর উত্তর না করিয়া লম্ফ প্রদানে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা অশ্বে কশাঘাত করিয়া অশ্ব এবাদত পুরের দিকে ছুটাইয়া দিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবিরে উৎকণ্ঠা।

চৈত্র মাসের প্রথমভাগ। সূর্য্য অস্তাচলে গিয়াছেন। প্রকৃতি-সুন্দরী কৃষ্ণকেশে তারকা-কুসুমের মালা পরিয়া নীলাম্বরী বসনে শরীর ঢাকিয়াছিলেন। অদ্য প্রকৃতি-সীমন্তে শশাঙ্ক-সিন্দূর-বিন্দু নাই, ধরিত্রী প্রকৃতির সাজ দেখিয়া কুসুমদন্ত-বিকাশ করিয়া হাস্য করিলেন। বার্দ্ধক্যে দন্ত-বকুল উড়িল—শেফালিকা-দন্ত পড়িল—করবী-দন্ত হেলিয়া দুলিয়া কতক পড়িল, কতক থাকিল। অন্যান্য দন্ত নড়িয়া আবার আসিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল। যুবক পবন এই রহস্য দেখিয়া পত্র-করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। খদ্যোতিকাকুল প্রকৃতির সীমন্তে সিন্দূর নাই বলিয়া উপরে উঠিয়া প্রকৃতির সীমন্তে বসিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল—কিন্তু তত উপরে উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধা পৃথিবী-সুন্দরীর বিড়ম্বনায় পবন প্রথমে করতালি দিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু পরে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করিতে লাগিল। ধরণী গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিলেন। ধরণী কুকুরের

স্বরে, ফেরুপাল-রবে গাভীর ডাকে, রাখালের চীৎকারে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পবন সান্ধ্য শঙ্খঘণ্টার বাদ্য আনিয়া—দেবালয়ের আরতির গন্ধ ছড়াইয়া দীপ জ্বালিয়া ধরিত্রীর সোহাগ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই আর পবন পৃথিবীকে হাসাইতে পারিলেন না।

এস আমরা এই সময়ে এবাদতপুরের শিবিরে যাই। প্রায় আড়াই প্রহর হইল, আমরা সেই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি। যুদ্ধকালে যে ক্ষেত্র বাদ্যের ধ্বনিতে, পশুদলের চীৎকারে, অস্ত্র শস্ত্রের শব্দে, কামান বন্দুকের নিনাদে, যোদ্ধৃগণের চীৎকারে, কল্লোলময় জলধি-প্রায় ছিল, এক্ষণে সেই শিবিরে বিশাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে—নৈরাশ্য চিন্তাও আসিতেছে। এবাদতের সৈন্য পলায়নপর হইলে, কালাপাহাড়ের এক এক দল সৈন্য এবাদতের এক এক দল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সকল দলই সন্ধ্যার মধ্যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু আসেন নাই——কালাপাহাড় ও পাঁচ জন ক্ষত্রিয় সৈন্য। তাঁহাদিগের জন্য সিপাহীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

আবিসিনীয় নবনির্ব্বাচিত যুবক ভৃত্যদ্বয় বিশিষ্টরূপ নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে—অন্যান্য সেনানায়কগণকে পাহাড়সাহেবের অনুসন্ধানও করিতে বলিতেছে। আজ সেনানিবেশে জয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে নৈরাশ্যের বিষণ্ণতা —

কালাপাহাড়ের শিবিরের দ্বারে দুই মঞ্চে সেই ভৃত্যদ্বয় অতি বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগের এক জনের নয়ন হইতে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতেছে—অপরের চক্ষু জলে পূর্ণ। সেনাপতির পট-মণ্ডপে ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। অকস্মাৎ শিবিরের দক্ষিণ পশ্চিম দ্বারে তূর্য্যধ্বনি হইল, রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আল্লাহো আকবর রবে দিগন্ত কম্পিত হইল, যুবকদ্বয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহারা ভাবিলেন আবার বুঝি যুদ্ধ বাধিল। তাঁহারা নৈরাশ্য-জনিত নিশ্চেষ্টভাবে শিবিরের দ্বারেই বসিয়া থাকিলেন—ঘটনা কি অনুসন্ধান করিলেন না। তাঁহাদিগের যেন মনের ভাব যাহা হইবার হউক, আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

তূর্য্যধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি হইবার প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড পরে যুবক দ্বয় মনে করিল, তাঁহাদের সম্মুখে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা বদন উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সেনাপতি! তাঁহারা উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া [illegible] উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাঁদিতেছিলে কেন?"

যুবকদ্বয়। আপনার অনুপস্থিতিতে।

সেনাপতি। বটে—বটে—বটে! এস, তাঁবুতে এস।

অনন্তর সেনাপতি পটমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। সের আলি ও নুর আলি তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্যান্য সেনানায়ক ও প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ তথায় আগমন করিলেন। সকলেই যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেনাপতি বলিতে লাগিলেন—"আপনারা জানেন না, আজকার প্রভুভক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সতর্কতায় আপনারা বিষম বিষাদের পরিবর্ত্তে জয়োল্লাস করিতেছেন। এই আবিসিনীয় যুবক অদ্য আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এবাদত খাঁ আমাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিতে চেষ্টা করেছিলেন। ইহাঁর বিষম দণ্ডাঘাতে ছুরিকা হস্ত হইতে ১০ হাত দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সের আলি আমার জীবনরক্ষক। সের আলির প্রভুভক্তি, সতর্কতা প্রভৃতির জন্য সের আলিকে বিশিষ্টরূপ পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক। আপনারা কি পুরস্কার দেওয়া সঙ্গত মনে করেন?"

একজন সেনানায়ক উত্তর করিলেন—"আবিসিনীয় যুবকদিগের ব্যবহারে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজ তাঁহাদিগের চতুরতা ও কর্ম্মকুশলতায় বিশেষ প্রীত হলেম। ইহাঁরা যে কাজ করেছেন, তার পুরস্কার নাই, তবে এই কার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই কর্‌তে পারেন।"

নিরঞ্জন। আমি জানি যুবকদিগের অর্থে বা কোন দ্রব্যে স্পৃহা নাই। ইহাঁরা আমার তাঁবুর প্রহরী ছিলেন। আজ বুঝ্‌লেম আমার শরীর-রক্ষকের প্রয়োজন আছে। আজ হ'তে ইহাঁদিগকে আমার শরীর-রক্ষক পদে নিযুক্ত কর্‌লেম। আর ইহাঁরা আজ আমার যে উপকার কর্‌লেন তাহার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ এবাদতপুরের নাম আমরা সেরপুর রাখ্‌লেম।

সকল সেনানায়ক ও সেনাপতিগণ বলিয়া উঠিলেন—"বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা—কিস্মৎ—কিস্মৎ।"

সের আলি বিনীতভাবে বলিলেন,—"আমি বিশেষ কোন্ কাজ করি নাই। আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। এর জন্য যদি সেনাপতি সাহেব কিছু কর্‌তে চান, তবে আমি যে সুলতানের দেশ হ'তে এসেছি সেই সুলতানের নামানুসারে এবাদতপুরের নাম সুলতানপুর রাখা হউক।"

সের আলির ইচ্ছানুসারে এবাদতপুরের নাম সুলতানপুর রাখা হইল। এই সুলতানপুর এক্ষণে নওয়াগাঁর নিকটবর্ত্তী উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের সুলতানপুর জংসন ষ্টেসন হইয়াছে।

অতঃপর কোন্ সেনানায়ক কোন্ দিকে যাইয়া কি করিয়াছেন, সেই সকল কথা হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে সেনাপতির কথা হইল। তিনি বহুদূর এবাদত খাঁর অনুগমন করিয়া এবাদত কোন বনে প্রবেশ করিল, তাহাকে আর বন হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর এবং যুদ্ধ ও পর্য্যটনে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া এক আতিথের অন্ত-

লোকের অতিথি হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহারে তিনি বড় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ভদ্রলোক তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত এই অপরাহ্ন কালে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ কৈ মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মৎস্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নাম ধাম লেখাইয়া রাখিলেন। বরেন্দ্র বিজয় হইলে সেই ভদ্রলোককে জমিদারী দিয়া পুরস্কৃত করা হইবে, ইহাই সকলের মত হইল। অনন্তর অরাতির অনুগমনকারী অন্যান্য সেনানায়ক দল তাঁহাদিগের অনুগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে এক গুপ্তচর আসিয়া জানাইল, অপর জমিদারগণের সৈন্য দল বগুড়া হইতে ৫ পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোন বৃহৎ প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। গত রজনীতে ঝড়, বৃষ্টি ও করকাপাত না হইলে অদ্য এবাদতখাঁর কথোপকথন সময়ে সেই সব সৈন্য আসিয়া নবাব সেনার চারিদিকে আক্রমণ করিত। এবাদতখাঁর সহিত জমিদার সৈন্যের এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। এবাদত এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুনরায় সৈন্য সমবেত করিয়া সম্ভবতঃ-জমিদার সেনাদলের সহিত মিলিত হইবে।

অনন্তর কালাপাহাড় সেনানায়কগণের সহিত যুদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলের মতে এই পরামর্শ স্থির হইল, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে অদ্য রজনীতেই বগুড়াভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। বিপক্ষ সেনা অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে হইবে। নবাবসেনা ভিন্ন ভিন্ন পথে যত গোপনে যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইবে। সকল সৈন্য মিলিত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। পথিমধ্যে এবাদতের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কতক সৈন্য এবাদতের কটকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ও কতক সৈন্য বগুড়ায় যাইবে। এবাদতের সৈন্যের সহিত জমিদার-সৈন্যের মিলন হইতে দেওয়া হইবে না। যুদ্ধে

মুখে আরও শুনা গেল যে, এবাদতের সৈন্য জমিদার সৈন্যের নিকট যাইবার জন্য অথবা জমিদার সৈন্য এবাদতের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য পথমধ্যস্থিত সকল নদীতেই নৌকার সেতু প্রস্তুত রহিয়াছে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে প্রহরিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত সৈনিক ও হস্তী অশ্বাদির খাদ্য সামগ্রীও রহিয়াছে। এবাদতের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গমন করিতে পারিলে, তাঁহারা পথিমধ্যে বিশেষ সহায়তা পাইবেন আশা করা যায়।

এবাদতপুরের যুদ্ধ জয়ের আমোদ আহ্লাদ থামিয়া গেল। সৈনিকগণকে স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য ঘন ঘন বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। সৈনিকদল দ্রব্যাদি বন্ধন করিতে লাগিল। যানবাহন সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। যুদ্ধসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী সকল শকটে ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে উত্তোলন করা হইতে লাগিল। অতঃপর গতিসূচক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বগুড়ার নিকটস্থ প্রান্তর।

গত পরশ্ব রজনীতে বিষম ঝড় বৃষ্টি ও করকাপাত হইয়া গিয়াছে। বগুড়া হইতে পাঁচ কি ছয় ক্রোশ দূরস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে নানা জমিদার-সেনা—হিন্দু মুসলমান জমিদার-সেনা পৃথক পৃথক্ শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। ঝড়, বৃষ্টি ও করকাপাতে সকল জমিদার সৈন্যেরই বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। কাহারও পটমণ্ডপ ছিঁড়িয়াছে, কাহারও যান-বাহন আহত হইয়াছে, কাহারও সৈনিকদল বিশেষ ক্লেশ পাইয়াছে, কাহারও খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হইয়াছে, কাহারও যুদ্ধসম্ভার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কাহারও কোন কোন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পলায়ন করিয়াছে এবং কাহারও বা একাধিক বিপৎপাত হইয়াছে। জমিদার-সৈন্যের এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের এই প্রান্তর ছাড়িবার উপায় নাই। গত রজনীশেষে সংবাদ আসিয়াছে এবাদত খাঁ এই প্রান্তরে জমিদার-সৈন্যের নিকটে আসিতেছেন। জমিদার-সৈন্যগণ

নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব নষ্ট ও অপহৃত দ্রব্যের সদুপায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

বেলা এক প্রহরও নাই। গৃহিণী যে সময়ে দিবায় নিদ্রিতা বধূদিগকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইতে ছিলেন, বধূগণ যে সময়ে শশব্যস্তে উঠিয়া ক্ষুণ্নমনে নিদ্রোত্থিত অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে উচ্ছিষ্ট বাসন জলাশয়ে লইয়া মাজিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় অপরা সমবয়স্কা বধূকে পাইয়া শ্বশুর কুলের শাশুড়ী ননদিনীগণের গুণবর্ণনে বাগ্মিতার পরিচয় দিতেছিলেন, যে সময়ে ভদ্রপল্লীর মহাশয়েরা দাবা, পাশা, ও তাসের খেলায় গণ্ডগোল করিতেছিলেন, যে সময়ে মাঠের রাখালগণ গবাদি পশুকে শস্পাস্বাদনে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া হোল ডুগ্ ডুগ্ ও ডাণ্ডাগুলি খেলায় প্রমত্ত হইতেছিল, যে সময়ে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, মালাকর মধ্যাহ্নের আহার বিশ্রামান্তে নবোদ্যমে আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিল, যে সময়ে ক্ষৌরকারবধূ আল্‌তা গুলিয়া ক্ষুর নরুণ ধার দিয়া অলক্তরাগে ললনা-চরণ রঞ্জিত করিবার উদ্‌যোগে ঝাঁপী সাজাইতেছিল, যে সময়ে তাঁতিকুল ঘন ঘন মাকু চালাইয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছিল, যে সময়ে রজককুল স্ব স্ব বনিতার সহিত হাস্য পরিহাসের সঙ্গে সঙ্গে কখন গৃহিণীর অঞ্চল টানিয়া, কেশ নাড়িয়া, নথাকর্ষণে নাসিকায় বেদনা দিয়া ধৌত বস্ত্র ভাঁজ করিতেছিল, যে সময়ে ভদ্রপল্লীর বয়োধিকা বামাদল, সর্ব্ববিদ্যা বিষয়ক বাগ্‌বিতণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে, তাম্বূল চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে, কাঁথা, শিকা, চুলের দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিলেন, যখন পবন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর জাগ্রত হইবার উপক্রমে হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা একটু একটু নাড়িতেছিলেন, যখন নৈশপুষ্পসুন্দরীগণ কোরকাকারে দুলিতেছিলেন ও ভ্রমর গুঞ্জনে লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন এবং যখন জলে নলিনী, ও স্থলে সূর্য্যমুখী প্রাণপতি দিবাকরকে

স্ব স্ব পতিভক্তি দেখাইয়া প্রণয়-পিপাসায় আকুলতা দেখাইতেছিলেন। তখন সেই প্রান্তরে সংবাদ আসিল,—"এবাদত খাঁ সসৈন্যে উপনীত হই-লেন।" সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। এবাদতের সৈন্য আসিয়া জমিদার সৈন্যের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। হায় একি সর্ব্বনাশ! এত এবাদত নহে, কালাপাহাড়! তখন জমিদার-সৈন্যের মধ্যে রোল উঠিল—"সাজ সাজ, মার মার, কাট কাট।" এই শব্দের সহিত নবাব-সৈন্যের আল্লা-ধ্বনি ও কামানগর্জ্জন মিশ্রিত হইয়া দিগন্ত কম্পিত করিল।

জমিদারসৈন্যের আর রীতিমত সাজ সজ্জা করিবার অবসর হইল না। যে যে অস্ত্র পাইল, তাহা লইয়াই যুদ্ধে অগ্রসর হইল। যে যে বাহন পাইল, সে তাহাতেই আরোহণ করিল। ধীবর যেরূপ বেড়জালে বৃহৎ জলাশয়ের বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আবদ্ধ করে, এই বৃহৎ প্রান্তরে জমিদার ও জমিদার সৈন্যগণ নবাব-বাহিনী কর্ত্তৃক সেইরূপে আবদ্ধ হইলেন। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল—প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত জমিদার-সেনা ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মুসলমানের আল্লা আল্লা রব দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিল। কত জমিদার বন্দী হইলেন। কত জমিদার হত হইলেন। জমিদার সেনার পলায়নের উপায় নাই, যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই, মরণ ভিন্ন আর জমিদার সেনার গত্যন্তর নাই। কালাপাহাড় উচ্চ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যপরিচালন ও স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছিলেন। হঠাৎ চারিদল জমিদারসৈন্য নৈরাশ্যের সাহস উদ্যমে চারিদিক হইতে সবেগে কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড় একশত মাত্র বাছা বাছা সৈন্য ও শরীর রক্ষক সের আলি ও নুর আলি কর্ত্তৃক বেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারাও দুর্দ্দমনীয় বেগে শত্রুদলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বৈরিদলের আক্রমণ বিফল হইলে পর, তাঁহারা পর-

পয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সের আলিসহ বিংশতি জন সৈন্য সমরে পতিত হইয়াছে। কালাপাহাড় দেখিলেন, নুর আলি কাঁদিতেছে। তখন আর কথার সময় নাই। যুদ্ধের বেগ হ্রাস হয় নাই। কালাপাহাড় নুর আলিকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—“সের কতদূরে কতক্ষণ কিরূপে পড়িয়াছে?”

নুর আলি উত্তর করিলেন—“বলিবার সময় এখনও হয় নাই।”

যুদ্ধ প্রায় আর দুই দণ্ড হইল। জমিদার-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। যখন পাঁচ কি ছয় সহস্র সৈন্যমাত্র জীবিত থাকিল, তখন তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া নবাব সেনাপতির শরণ লইল। সেনাপতি যুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে অভয় দিলেন। নবাব-সৈন্য আল্লা—আল্লা রবে দিগন্ত কম্পিত করিল।

অহো! যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর মহামারী! সংগ্রাম কি মহাপাপ! আহব কি নিষ্ঠুরতার রঙ্গ ভূমি! রণ কি জীবন্ত জীবের সমাধিক্ষেত্র! সমর কি মূর্ত্তিমান যম! স্বার্থ অভিমান! সংগ্রাম তোমাদেরই পৈশাচিক কাণ্ড। উচ্চাশা! তুমি কি ভয়ানক রাক্ষসী। রাজপদ! তুমি কি ঘোর নরক। রাজ্যলিপ্সা! তুমি কি নিষ্ঠুরা ডাকিনী। রণক্ষেত্র কি বাস্তবিক, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, ভূত, প্রেত প্রভৃতির রঙ্গালয়? বাস্তবিক তাহা নহে। স্বার্থ ভূত, অভিমান প্রেত, অহঙ্কার রাক্ষস, উচ্চাশা রাক্ষসী, রাজ্যলিপ্সা ডাকিনী, অর্থপিপাসা যোগিনী, তাহাদের রঙ্গালয়ই সমরক্ষেত্র। মানব! তুমি কি ক্ষুদ্রাশয় স্বার্থপর! তুমি স্বার্থের মোহে, ভোগ বাসনার লালসায় না করিতে পার এমন কাজ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তোমার কথার কথা। দয়া, মমতা, সহানুভূতি তোমার ছলনা। তুমি নিষ্ঠুর—তুমি নিষ্ঠুরাদপি নিষ্ঠুর। তুমি মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতা। তোমার স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িলে তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, দয়ামমতা সব

পলায়ন করে। পরের নিন্দা কালে তুমি কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দ ব্যবহার কর। তোমার চরিত্র যতই পর্য্যালোচনা করি, ততই তোমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করি। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি স্থলচর আর হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর আমরা জীবনাশক বলিয়া ঘৃণা করি, কিন্তু মানবের ন্যায় জীবনাশক জন্তু জীবজগতে আর কোথায় মিলিবে? মানব! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকে ধিক্! তোমার ঈশ্বরপ্রেমে, স্বজাতিপ্রেমে—তোমার নরজাতি প্রেমে ধিক্! আবার বলি, তুমি স্বার্থের দাস, মূর্ত্তিমান পাপ। ঈশ্বরের নাম তোমার ছলনা, বৃথা ভণ্ডাম। তুমি ঘোর নাস্তিক। তুমি আস্তিক হইলে, স্রষ্টাকে বিশ্বপিতা বলিয়া মানিলে, সৃষ্টজীব কখনও হনন করিতে পারিতে না। তুমি যখন স্বার্থের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হও, নীচাশয়তার টুসি নয়নে পর, তখন, তোমার স্বার্থ আর ঈশ্বর সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুলাদণ্ডে তুলনা করিয়া, তুমি তোমার স্বার্থকে সূর্য্য আর সমস্ত এক কণা বালুকার ন্যায় গণনা কর কিনা সন্দেহ। তোমার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র দুহিতা, বন্ধু বনিতা কেহই তোমার নহে। তোমার স্বার্থের তোপের মুখে পড়িলে সব মিছা। তাই বলি মানব! তুমি আর কিছুই নহ, কেবল স্বার্থ, দম্ভ, অহঙ্কার, ক্ষুদ্রাশয়তা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা প্রভৃতি।

যুদ্ধকালে সেনাপতির বৃহৎ পটমণ্ডপ ও আর কয়েকটি বড় বড় পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত হইয়াছে। জমিদার, সেনানায়ক ও সৈনিকগণকে ভিন্ন ভিন্ন পটমণ্ডপে বন্দিদশায় রাখিবার অনুমতি দিয়া ও আহতদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া সেনাপতি নিজ শিবিরে গমন করিলেন। তিনি শিবিরে গমন করিয়াই নূর আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইহার কোথায় সের আলি পড়িয়াছে তাহার কোন চিহ্ন রাখিয়াছ? সের আলি কিরূপে পড়িল?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নুরআলি। সের যেখানে পড়েছে, সেই স্থানে সেরের হাতের নিশানটি স্তূপীকৃত মৃত জীবের মধ্যে বসাইয়া আসিয়াছি। সের হুজুরকে বাঁচাইতে যাইয়াই নিজে মরিয়াছে। হুজুর যে সময় তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন জমিদার-সেনার একজন তীরন্দাজ হুজুরকে লক্ষ্য করে এক সুতীক্ষ্ণ তীর ছাড়ে, সেই তীরে হুজুরের জীবন নষ্ট হতে পারিত। সের ঢালে পেট ঢাকিয়া কাত হইয়া সেই তীরের সম্মুখে থাকে। সেই শর লাগিয়া সের ঘোড়া হ'তে পড়ে যায়। তখন তুমুল যুদ্ধ—সেরের কোথায় শর লাগিল, তাহা দেখিতে পাই নাই।

কালাপাহাড়। সের তবে না মরিতেও পারে।

নুর। তা হতে পারে।

তখন সেনাপতি ও নুর আলি আর কালবিলম্ব না করিয়া আলোক লইয়া কতিপয় ভৃত্যের সহিত সেরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রণাঙ্গন কি ঘোর শ্মশান।

যুদ্ধের রজনীতে যুদ্ধক্ষেত্র কি ঘোর শ্মশান! মড়ার উপর মড়া, শবের উপর শব। মৃত অশ্বের উপর মৃত অশ্ব, মৃত হস্তীর উপর মৃত হস্তী, মৃত মনুষ্যের উপর মৃত মনুষ্য স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃত অশ্ব, হস্তী, মানুষ এক স্তূপে রহিয়াছে। কোথাও বালুকার উপর রক্ত শুকাইয়া আছে। কোথাও একটু নিম্নস্থানে রক্ত জমিয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতজীব এত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া গমনের উপায় নাই। অস্ত্র শস্ত্রও এরূপভাবে পড়িয়া আছে। আহত অনেক জীব এখনও হস্ত পদাদি নাড়িয়া শব্দ করিতেছে, অজ্ঞানের আর সন্ধান নাই, সজ্ঞানে যাহারা চীৎকার করিতেছে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করা হইতেছে! শৃগাল কুকুর দলে দলে আসিয়া মৃত পশু ও মনুষ্যগণের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার। অস্ত্র শস্ত্রই বা কত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।

প্রধান প্রধান মৃত সৈনিক পুরুষের সন্ধান হইতেছে। যে সকল সৈনিকের আত্মীয় সৈনিকদলে আছে, তাহাদিগেরও সন্ধান লওয়া হইতেছে। এই সময়ে সমরক্ষেত্রে স্বয়ং কালাপাহাড় নুর আলি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত সেরের শরীর অনুসন্ধান করিতেছেন। অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর নুর আলি বলিলেন—"ঐ যে সে নিশান দেখা যাইতেছে।" যে স্থানে সেই পতাকা দৃষ্ট হইল, সেই স্থানেই মৃত জীবের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুসন্ধান করা হইতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল একটি অশ্ব স্থির হইয়া দণ্ডায়মান আছে। লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে দূর হইতে অনুমিত হইল, অশ্বটি সম্ভবত সের আলির। বহুকষ্টে মড়ার উপরের মড়া পার হইয়া নিকটে যাইয়া দেখা গেল, তুরঙ্গটি সত্যই সের আলির। আরও নিকটে যাইয়া দৃষ্ট হইল, তাহার মুখের কাছে একটি মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে। নুর আলি শবের পাগড়ী দেখিয়াই বলিল,—"এই সের আলি!" অনন্তর নুর আলি লম্ফ প্রদানে মৃতদেহ রাশি অতিক্রম পূর্ব্বক সের আলির নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সের মরে নাই। সেরের নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া দেখ্‌লেম, এখনও নিশ্বাস বচ্ছে। হাত কপাল গরম আছে।"

সেনাপতিও নিকটে গমন করিলেন। উভয়ে সেরের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একটি তীর সেরের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিয়া পেটের দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত বহির্গত হইতেছে। সেনাপতি শর বাহির করিতে গেলেন; নুর আলি নিষেধ করিয়া বলিলেন—"আপনি সেরকে স্পর্শ করিবেন না। আমাদের একটা প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমাদের একজন অচেতন হইলে, অপরে তাহার শুশ্রূষা করিবে, অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না। হাকিম সঙ্গেই ছিলেন। হাকিমের উপদেশ ক্রমে নুর আলি শরটি বাহির করিলেন।

ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। বিশিষ্টরূপ যত্ন সহকারে সেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে এক নির্জ্জন পটমণ্ডপে লওয়া হইল। বারটার মধ্যে সেরের জ্ঞান হইলনা। যখন জ্ঞান হইল, তখন সের কেবল পানীয় জল চাহিলেন। তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা নুরের নিকট জানিলেন। সেনাপতিও রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অতি উৎকণ্ঠায় অতি-বাহিত করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর সেরের জ্ঞান হইলে, সেনাপতি শয়ন করিলেন। রজনীর শেষ ভাগে সের আলির ভয়ানক জ্বর হইল। নুর আলি ও সের আলির পটমণ্ডপে হাকিম বা সেনাপতি যাইতে পারিতেন না। নুর আলির মুখে রোগীর অবস্থা শুনিয়া হাকিম ঔষধ দিতেন। সের আলি, 'এখন মরে তখন মরে' এইরূপ অবস্থায় সাত দিন অতীত হইল। অষ্টম দিন হইতে ক্রমশঃ অবস্থা ভাল হইতে লাগিল। এক পক্ষ মধ্যে সের আলি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা গেলনা।

যে দিন অপরাহ্নে বগুড়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এবাদত খাঁর সকল সৈন্য সুলতানপুর হইতে বগুড়ায় আসিবার পথে আসিয়া সমবেত হয়। কালাপাহাড়ের যে সকল সৈন্য এবাদত খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য পথিমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহারা আসিয়া সবেগে এবাদত খাঁকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে এবাদত খাঁ নিহত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধে বন্দী হইল। কতক সৈন্য পলায়ন করিল। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে বিজয়ী সৈন্যদল বন্দী সৈন্যের সহিত কালাপাহাড়ের নিকটে উপনীত হইলেন।

বরেন্দ্রভূমিতে জমিদার-বিদ্রোহ উপলক্ষে আর একটি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অবশিষ্ট সকল জমিদার-সৈন্য পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধে নুর আলি,

অত্যদ্ভুত কৌশলে হোসেন খাঁ নামক একজন প্রধান সেনা-নায়কের জীবন রক্ষা করেন। শেষোক্ত রণক্ষেত্রের নাম এক্ষণে সুরপুর হইয়াছে। সের আলির দুর্ব্বলতার জন্য সুরপুরের যুদ্ধের পর সেনাপতির ইচ্ছানুসারে সের আলি ও নুর আলি বগুড়া হইতে শিবিকা-যানে লালপুর ও লালপুর হইতে নৌকাযোগে তাণ্ডায় প্রেরিত হইয়াছিলেন

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি দরবারে।

যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সের আলি কালাপাহাড়ের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আজ সুবৃহৎ দরবার। বৃহৎ নীলরত্নাদি-খচিত ঝালর-যুক্ত চন্দ্রাতপ সকল উত্তোলন করা হইয়াছে। পুষ্পমালা, সুদৃশ্য লতা, সুদৃশ্য পত্র ও সুদৃশ্য কদলী তরু দ্বারা দরবার ক্ষেত্র অতি সুন্দররূপে সুসজ্জীভূত হইয়াছে। বরেন্দ্রের সকল জমিদারগণ, সমবেত হইয়াছেন। সুলতানপুরের নিকটবর্ত্তী ধুবলহাটির জমিদারবংশের আদিপুরুষ সেই ধার্ম্মিক অতিথিভক্ত শৌণ্ডিক মহাশয়েরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে—অদ্য দরবারে বরেন্দ্রভূমিতে শান্তি স্থাপিত হইবে। অদ্য দরবারের কার্য্য-তালিকা সুবৃহৎ। দরবারের উপরে যেরূপ চন্দ্রাতপ উত্তোলন করা হইয়াছে, নিম্নে সেইরূপ রক্ত বর্ণ বস্ত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে। মহার্ঘ আসন সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে—মহার্ঘ বেশভূষণধারী সৈনিকগণ দরবার-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। সমর-বাদকগণ উৎসাহের বাদ্য বাজাইতেছে। সামরিক গায়কদল বীররসাত্মক বীর-কাহিনী গান করিতেছে।

সকল শ্রেণীর লোক সভায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। বাদ্যোদ্যম থামিল, গভীর-নিনাদ কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য দরবার নিস্তব্ধ হইল; নকিব আসিয়া সেনাপতির আগমন ঘোষণা করিল, সেনাপতি গম্ভীরভাবে দরবারে আসিয়া স্বীয় আসন পরিগ্রহ করিলেন। ভাটগণ বীণাযোগে তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণন করিতে লাগিল। তাহারা বীণা যোগে গাইল :—

জয় জয় জয় সেনাপতি জয়।
সুধীর সুমতি সর্ব্বগুণময়।
বীরত্বে যেমন তেমনি সদয়।
এসুখ মিলনে সুশান্তি হবে॥
জয় সেনাপতি বঙ্গের ভূষণ।
জয় সেনাপতি দ্বিজের নন্দন।
জয় সেনাপতি অরি বিমর্দ্দন।
শান্তি দরবারে এস হে সবে॥

এই ভাবে ভাট দীর্ঘ গীত আরম্ভ করিয়াছিল। কালাপাহাড় তাহাদিগকে তাঁহার স্তুতি গান করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি ভাটগণকে বলিলেন—"তোমাদের যদি হিন্দুমুসলমানের মিলন সম্বন্ধে কোন নূতন গান প্রস্তুত থাকে, তবে তাহা গান করিতে পার।"

তাহারা গাইতে লাগিল :—

এই আর্য্যভূমে দেখনা চাহিয়ে।
অরাতি আসিছে যাইছে লুটিয়ে।
কত কোটি লোক দেখিছে বসিয়ে।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥

গ্রীক, শক, হূন, পারশি, তাতার।
এক যায় লুটে আসে অন্য আর।
কত দুখ সহে বার বার ম'ার ?
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥
হিন্দুগণ আছে বহু দিন হেথা।
পাঠান রয়েছে যাবেনাকো কোথা।
কর হেন কাজ যুক্তি হয় যথা।
একতা অভাবে এদুখ হায়॥
পাঠান হিন্দুর ঐক্য প্রয়োজন।
নহিলে হেথায় থাকে নাকো ধন।
মরিছে মরিছে লোক অগণন।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥
গিয়েছে বাণিজ্য গেছে কৃষিকাজ।
নীরব নিস্তেজ হিন্দুর সমাজ।
মুখ দেখাইতে পাই সদা লাজ।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥
এস হিন্দুগণ, এস হে পাঠান।
ত্যজ ত্যজ ত্যজ জাতি অভিমান।
একতা-শৃঙ্খলা করহ সন্ধান।
একতা অভাবে এদুখ হায়॥

ভাটের গান শেষ হইলে সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দরবারে উপস্থিত সকল লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"উপস্থিত হিন্দুমুসলমানগণ! আপনারা সকলেই বোধ হয়, কুরুযুদ্ধের উদ্দেশ্য জ্ঞাত আছেন। যদুকুলপতি দ্বারকানাথ কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল, ভারত-

বর্ষ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিল, তৎসমুদয় কুরু-যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়া ভারতবর্ষ এক প্রবল-প্রতাপান্বিত একছত্র ভূপতির শাসনে আনয়নপূর্ব্বক এক মহতী শক্তি স্থাপন করেন। রুক্মিণীকান্তের উদ্দেশ্য সফল হউক আর না হউক, আমাদিগের বরেন্দ্র জয়ের উদ্দেশ্য তদ্রূপ। মোগল আগত প্রায়। মোগল-বালসূর্য্যের কিরণে মধ্যভারত-বর্ষ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালে এই করজালের প্রচণ্ড তেজে সমগ্র ভারতবর্ষ সন্তাপিত হইবে। হিন্দু-পাঠানের যুদ্ধ কালে বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। আবার যদি পাঠানে মোগলে সংগ্রাম বাধে, তবে বঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইতেও শোচনীয়তর হইবে। এখন আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? এখন আমরা গৃহ-বিচ্ছেদ ভুলিয়া—হিন্দু পাঠান দুই ভুলিয়া—জাতীয় ও ধর্ম্ম পার্থক্য ভুলিয়া—চর্ম্ম পার্থক্য ভুলিয়া—এক হইব; বাঙ্গালা হিন্দুর দেশ, এখন পাঠানেরও দেশ; হিন্দুমুসলমান এক বঙ্গমাতার সন্তান; হিন্দু মুসলমান দুই ভাই। গৃহ-বিচ্ছেদ সর্ব্বনাশের মূল, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্ব্বনাশের আকর। এ সময়ে একে অপরের বল হওয়া উচিত—একে অপরের সহায় হওয়া উচিত। বঙ্গে পাঠান-হিন্দুতে মিলনের জন্য আমি বরেন্দ্র ভূমিতে আসিয়াছি। আমি কাহারও রাজ্য গ্রহণ করিতে অথবা কাহারও রাজকোষ লুণ্ঠন করিতে আসি নাই। এক সাগরের সহিত সকল নদ নদীর মিলন থাকা যেরূপ শুভকর, সেই রূপ এক প্রধানা শক্তির সহিত সকল শক্তির মিলন থাকা বিধেয়। বরেন্দ্র এক মত, বাগড়ী অপর মত, রাঢ় তৃতীয় মত অবলম্বন করিয়া থাকিলে, দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। সকলকে এক মতে আনিবার জন্য আমার এই সমরায়োজন। এবাদত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার নিধন সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি আমি এবাদত বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষমা করিতাম—

এবাদত রণে নিহত হওয়ায় আমি দুঃখিত হইয়াছি। এবাদতের জমিদারি এক্ষণে বঙ্গেশ্বরের খাস হইয়াছে। এই জমিদারীর কতক অংশ আমি এই আতিথেয় ধর্ম্মশীল ভদ্রলোককে দিলাম। ইঁহার জমিদারিকে কোন গূঢ় কারণে আপনারা বারকচের জমিদারী বলিয়া জানিবেন। এই ধর্ম্মশীল মহাত্মাকে আমি রাজা উপাধি দিলাম। অবিলম্বে বঙ্গেশ্বর ইঁহাকে নিজ স্বাক্ষরিত সনন্দ প্রদান করিবেন। আমি বন্দী ভূস্বামিগণকে মুক্তি দিলাম। আমি পরাজিত ও বন্দীকৃত জমিদারগণকে তাঁহাদিগের জমিদারী ও সৈন্যসামন্ত প্রত্যর্পণ করিলাম। তাঁহারা সকলেই এই দরবারে অঙ্গীকার করিবেন যে, তাঁহারা নবাব-সরকারে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিবেন, প্রয়োজন মতে বঙ্গেশ্বরকে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিবেন ও বঙ্গেশ্বরের অন্যান্য আজ্ঞা পালন করিবেন। তাঁহারা প্রজাপীড়ন করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত নিয়মে প্রজাপালন করিবেন। হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ রহিত করিয়া একতা বন্ধনে বদ্ধ করিবেন। দেশীয় শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন। তাঁহারা রাস্তা, ঘাট, গোলা, গঞ্জ, জলাশয়, দেবালয় প্রভৃতি করিয়া দেশের উন্নতি করিবেন। তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধ সম্ভার রাখিবেন। আমি এই দরবারে আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই যুদ্ধক্ষেত্র আমার প্রিয় বিশ্বস্ত শরীর-রক্ষক সেরআলির নামানুসারে সেরপুর নামে খ্যাত হইবে। সেরআলি এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেরের ইচ্ছানুসারে এবাদতপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অদ্য সুলতানপুর বলিয়া ঘোষণা করিলাম। নুরআলি যে যুদ্ধে হোসেন খাঁর জীবন রক্ষা করিয়াছিল, ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের নাম এখন হইতে নুরপুর হইল। আমি বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপে অঙ্গীকার করিতেছি, এই দরবারে অদ্য যে যে

জমিদারগণ বঙ্গেশ্বরের করদ, বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিবার অঙ্গীকার করিবেন, তাঁহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ না করিলে, বঙ্গেশ্বরের পক্ষ হইতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইবে না। যে ব্রাহ্মণ-যুবক চতুরতার সহিত বিশ্বস্তভাবে এই অপরিজ্ঞাত প্রদেশের পথ ঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাকে এবাদতের অবশিষ্ট জমিদারি দিলাম এবং তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া তাহেরপুরে বাস করিবেন।”

এই কথা বলিয়া সেনাপতি উপবেশন করিলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে বিষম জয়োল্লাস হইল। সকলেই ‘জয়, জয়, উদার-চরিত সেনাপতির জয়’ বলিতে লাগিলেন। আবার কিয়ৎক্ষণের জন্য দরবার নিস্তব্ধ হইল। একে একে তালিকানুসারে জমিদারগণ সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞার সহিত নির্দ্দিষ্ট কর দিতে এবং বঙ্গেশ্বরের বাধ্য ও অনুগত থাকিতে অঙ্গীকার করিলেন। সেনাপতি বঙ্গেশ্বরের ও তদধীন জমিদারগণের সম্বন্ধ বিষয়ে যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে জমিদারগণ সম্মত হইলেন। একে একে জমিদারগণের অঙ্গীকার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

দ্বিতীয় বার সেনাপতি বলিলেন—“আপনাদিগের জমিদারে জমিদারে বিবাদ বাধিলে, সে গোল বঙ্গেশ্বর মীমাংসা করিবেন। আপনাদিগের উত্তরাধিকার লইয়া কলহ হইলে, উহাও বঙ্গেশ্বরের সভায় বিচারিত হইবে। আপনারা অঙ্গীকার ভঙ্গ বা অন্য কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে, বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইবেন। বঙ্গেশ্বরের বিনা অনুমতিতে আপনারা কোন যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। বঙ্গেশ্বরের বিনা অনুমতিতে কোন বৈদেশিককে আপনাদের জমিদারিতে স্থান দিতে পারিবেন না। বৈদেশিক আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের শুল্ক বঙ্গেশ্বর পাইবেন। প্রয়োজন

মতে আপনাদিগকে বঙ্গেশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সকল কথায় আপনারা সম্মত আছেন?"

জমিদারগণ সমস্বরে উত্তর করিলেন—"আছি, আছি।"

অতঃপর তোপধ্বনি ও সামরিক বাদ্যগীতে দরবার ভঙ্গ হইল। বরেন্দ্র-ভূমিতে শান্তি স্থাপিত হইল। লিখিত অঙ্গীকার পত্র জমিদারগণ যথা-সময়ে সাক্ষর করিয়া সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা যথাসময়ে বঙ্গেশ্বর-প্রদত্ত সনন্দ পাইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তাণ্ডায় নিরঞ্জনের অভ্যর্থনা।

বরেন্দ্র-বিজয়ী সহকারী সেনাপতি তাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাণ্ডার প্রধান প্রধান রাজপথ জয়তোরণে সজ্জিত হইয়াছে। নৃত্য বাদ্য গীত মহোৎসব চলিতেছে। সেনাপতি হিন্দু, বঙ্গেশ্বর ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন মুসলমান। অভ্যর্থনা-ক্ষেত্রের নিকটেই এক পটমণ্ডপে কালাপাহাড় অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গেশ্বর কালাপাহাড়কে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়াছেন। কালাপাহাড়ও বরেন্দ্রের বাকি রাজস্ব ও উপায়নাদি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলই বঙ্গেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন। আজ তিন দিন তাণ্ডায় আনন্দ উৎসব চলিতেছে। প্রথম দিন অভ্যর্থনা ক্ষেত্রে আলিঙ্গন অভ্যর্থনার পর, পথের দুর্গমতা, পথশ্রম, লাল খাঁর বুদ্ধি কৌশল ও সেনানিবেশ সংস্থাপনের সুবন্দোবস্ত, সের আলি ও নুরআলির বিশ্বস্ততা, এবাদত খাঁর বিশ্বাস ঘাতকতা, দুর্গ-জয়ের কৌশল, সেনা-রক্ষণ, সেনা বিভাগ করণ প্রভৃতি বিষয়ে কথোপ-

কথন হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনের অভ্যর্থনায় বরেন্দ্রভূমির অবস্থা, বরেন্দ্রের জমিদারগণের সহিত সখ্য স্থাপন, ধুবলহাটীর রাজবংশের আদিপুরুষের আতিথেয়তা, পুঁটীয়া রাজবংশের আনুগত্য ও সহায়তা, বরেন্দ্রের উৎপন্ন দ্রব্য, জল বায়ু ও খাদ্য, লোক সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছে। এই দিন অভ্যর্থনা-ক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বর কালাপাহাড়কে তাঁহার প্রধান সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি বার্দ্ধক্য বশতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই দিন বঙ্গেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কালাপাহাড় হিন্দু না হইলে নজিরণের শুভ পরিণয় তাঁহার সঙ্গেই হইত। নিরঞ্জন কালাপাহাড়ের ন্যায় বীর, পণ্ডিত ও সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত জামাতা বঙ্গদেশে বিরল। নজিরণও কিছু দিন জলবাসের পর নবাব-প্রাসাদে উঠিয়াছেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও কিন্তু আর কোন পীড়া নাই। বঙ্গেশ্বর ইহাও বলিয়াছেন, এই জয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নজিরণের বিবাহ দিতে হইবে।

তাণ্ডায় প্রতি ঘরে আনন্দ। যুদ্ধ-বিজয়ী সেনানায়ক, সৈনিক, সৈন্যের আহার-সংগ্রাহক, অশ্ব-রক্ষক, হস্তি-পালক—সকলের গৃহেই আনন্দ। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্র পাইয়াছেন, বনিতা পতি পাইয়াছেন, ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতা পাইয়াছেন, পুত্রকন্যা পিতা পাইয়াছেন, বন্ধু বন্ধু পাইয়াছেন, ও প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গ পাইয়াছেন; কেন না তাণ্ডাবাসীর আনন্দ হইবে? আজ শিশু পুত্রকন্যা "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া পিতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া আনন্দের একশেষ দেখাইতেছে। আজ ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতার সুখ দুঃখের কথা শুনিয়া কখন হর্ষিত কখন দুঃখিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। বন্ধু বন্ধুর সহিত মিলিয়া আজ কত কথাই বলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা ভয়ঙ্কর রণ-রাক্ষসের গ্রাসমুক্ত পুত্রমুখ অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন—আজ প্রণয়

জলনিধিতে জোয়ার আসিয়াছে, আজ বনিতা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বার বার স্বীয় পতিকে সন্দর্শন করিয়া আপন মনে আপনি হাসিতেছেন —দেখিয়া দেখা দিয়া ও সাজিয়া সাজ দেখাইয়া, লেখকের বর্ণনার অসাধ্য, ভাবুকের ভাবনার অবোধ্য, অরসিকের চিন্তার অতীত, প্রেমিকের চিন্তার অসাধ্য এক অপার্থিব, অননুভবনীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। আজ তাণ্ডায় কি সুখের তরঙ্গ উঠিতেছে। মিষ্টান্ন ভারে ভারে বিক্রীত হই-তেছে। মাংস মৎস্যের দর চড়িয়াছে। বসনভূষণ বহুলপরিমাণে বিক্রীত হইতেছে। আনন্দ-তরঙ্গ গৃহস্থালয় হইতে রাজপথে, রাজপথ হইতে বাজারে, বাজার হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তিন দিনের মধ্যে সেনাপতি কালাপাহাড়ের ক্ষণ মাত্র অবসর নাই। তাঁহার পটমণ্ডপে আমির ওমরাহগণ নিরন্তর আসিতেছেন। সৈনিক-গণ উন্নতির প্রার্থনা করিতেছেন। সেনা-নায়কগণ বিশেষ বিশেষ সুবি-ধার আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। মৌলবী পণ্ডিতগণ দর্শন-লালসায় আসিতেছেন। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা-লালসায় আসিয়া জমা হইতেছেন। আহা! কালের কি বিচিত্র লীলা! পদের কি আকর্ষণী শক্তি! কিছু দিন পূর্ব্বে যে নিরঞ্জন দ্বারে দ্বারে সামান্য করুণার ভিখারী হইয়াছিলেন, আজ তিনি করুণার কল্পতরু। আজ বাঙ্গালা বিহারের সকল ব্যক্তি তাঁহার করুণা-কণার ভিখারী। অদ্য স্বয়ং বঙ্গেশ্বর তাঁহার ভয়ে ভীত, তাঁহার নামে শঙ্কিত এবং তাঁহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিলে পরিতৃপ্ত।

অভ্যর্থনার তৃতীয় দিনে প্রাতঃকাল হইতে, এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সামান্য ভার-বাহক হইতে প্রধান উজির পর্য্যন্ত কালাপাহাড়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। সের আলি ও নুর আলি সৈনাপতির সহিত এ পর্য্যন্ত কেন [illegible] করিলেন না? তাহাদিগের কোন অনুসন্ধানও পাইলেন না।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইবার পর, সেনাপতির পটমণ্ডপ ক্ষণকালের জন্ম একটু নির্জ্জন হইল। তিনি প্রিয়তমা যোগমায়া, জীবন-রক্ষক সের আলি, উপদেষ্টা ফকির, প্রিয় ভ্রাতা সুধীর, প্রিয় জন্মস্থান পাটুলী মনে করিতেছেন। আজ সেনাপতির দ্বার অবারিত। এই সময়ে দুইটি লোক আসিয়া তাঁহার হস্তে দুই খানা পত্র অর্পণ করিল। পত্র দুইখানার শিরোনামা পড়িতে পড়িতে পত্র বাহকদ্বয় প্রস্থান করিল। সেনাপতি সম্মুখস্থিত মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত মঞ্চের উপর পত্র উন্মোচন করিতেছেন, এমন সময়ে এক দোয়াত কালী পড়িয়া একখানা পত্রের অনেক অংশ কালীতে নষ্ট হইল। সেই পত্র খানা যোগমায়ার। অপর পত্র সের আলি লিখিয়াছেন। সের আলি লিখিয়াছেন,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব। যোগমায়ার পত্র বড়। পত্রের কতক অংশ পাঠ করিতে করিতে আবার সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন সৈনিক পুরুষ আসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কথা শেষ হইতে না হইতে, বহুদিন পরে, অন্ধ ফকির সলিম সা আসিয়া সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। সেনাপতি সাদরে ফকির সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। দীর্ঘকাল পরে ফকির সাহেবের সহিত নিরঞ্জন রায়ের দেখা হইল। ফকির সাহেব বলিলেন—"বন্দেগি সেনাপতি সাহেব! আজ অবারিত দ্বার, তাই বিনা এত্তলায় নিকটে এসেছি। অপরাধ ক্ষমা করবেন। চিন্‌তে পেরেছেন ত?"

নিরঞ্জন। কি ফকির সাহেব! আপনি এরূপ আলাপ কচ্ছেন যে? আমি কি পূর্ব্বপরিচিত কোন লোককে চিনি নাই? কোন বিষয়ে আমার কি গর্ব্ব প্রকাশ পেয়েছে? আমি পণ্ডিত নিরঞ্জন রায়ে যত গর্ব্বিত হতেম, সেনাপতি কালাপাহাড় নামে তত গর্ব্বিত নহি। সে পদে আমার দাসত্বের পরিচয় ছিল না। আপনার আজ্ঞায়, আপনার পরামর্শে

আমি জাতিধর্ম্মের দিকে না চেয়ে, আপনার মান অপমানের দিকে না লক্ষ্য করে, হিন্দু পাঠানের মিলন—এদেশে একটি প্রবলা শক্তির স্থাপন বিষয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা পাচ্ছি। কোন অপরাধ ক'রে থাকি, উপহাস না ক'রে সরলভাবে বল্লেইত আমার শিক্ষা হতে পারে।

ফকির। না না নিরঞ্জন! আমি তোমাকে রহস্য কর্‌লেম। বড় পদে যেন তোমার গর্ব্ব না হয়, এই আমার ইচ্ছা। সকলকে চিন্‌তে পারা বড় সহজ নয়।

নিরঞ্জন। বলুন, ফকির সাহেব! বলুন আমি কাকে চিন্তে পারি নাই?

ফকির। যাউক, সে কথায় কাজ নাই। বরেন্দ্রের অবস্থা কিরূপ বল।

নিরঞ্জন। হিন্দু মুসলমানে মনের মিল হয় নাই। যুদ্ধের ভয়ে, জীবন নাশের ভয়ে, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার ভয়ে, হিন্দুগণ মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। আমার এখন মত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ধর্ম্ম পৃথক রেখে হিন্দু পাঠান এক হবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। হিন্দু পাঠানকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করবে না, তবে এখন সকল হিন্দু যদি মুসলমান হয়, তবে পাঠানের সঙ্গে হিন্দুর মিল হ'তে পারে।

ফকির। সে তোমার ভ্রম। কত শক, কত হুন এসেছে। তারা কি হিন্দুর সঙ্গে মিশে নাই? অশোকের পরে সকল হিন্দু বৌদ্ধ হ'য়ে ছিল, তারা কি আবার হিন্দু হয় নাই? চন্দ্রগুপ্ত কি সেলুকসের কন্যা বিবাহ করেন নাই? এই বিবাহে চন্দ্রগুপ্ত কি হিন্দু সমাজচ্যুত হয়েছিলেন? সংপ্রতি শুনেছ ত বাদসাহ আকবর মাড়োয়ার রাজ উদয় সিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেছেন। পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম পার্থক্য থাকলেও যদি বিবাহাদি চলে, তা হ'লেই কালে এক হবে। সকল হিন্দুকে মুসলমান করা সহজ নয়। হিন্দুধর্ম্মের নানা শাখা, অনেক সম্প্রদায়।

এইরূপ অনেক কথা হইতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সহরের কোলাহলের বিরাম হইয়াছে। এই সময়ে সেনাপতিশিবিরে সেরআলি ও নুরআলি যথাবিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেনাপতি সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা আজ তিন দিনের মধ্যে আমার সহিত দেখা কর নাই কেন? তোমরা কোথায় আছ? কিরূপ আছ? পথে ও এখানে এসে কোন কষ্ট পাও নাই ত? আমি তোমাদের দেখা না পেয়ে বড় চিন্তিত হয়েছিলেম।"

সের। আমরা ভালই আছি; নজিরণ বিবি আগে যে বাড়ীতে থাকতেন, আমরা সেই বাড়ীতে আছি।

সের আলির কথা শেষ হইতে না হইতে ফকির সলিম সা অতি গোপনে ধীরে ধীরে সেরের নিকটে যাইয়া পশ্চাৎদিক হইতে সেরের মস্তকের উষ্ণীষ ও মুখের শ্মশ্রু-গুম্ফ খুলিয়া ফেলিলেন। তখন সের বিস্ময়ে ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল—"কি করিলেন! কি করিলেন। আমার সর্ব্বনা—"

নিরঞ্জন বিস্ময়ে সেরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"সের! তুমি সের নহ, নজিরণ! এবাদতের হস্ত হইতে আমর জীবনদায়িনী নজিরণ! সেরপুরের যুদ্ধে আমার জীবনরক্ষাকারিণী নজিরণ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ নজিরণ দেবী। আমার জীবন রক্ষার জন্য স্বর্গের দেবী কি নজিরণ মূর্ত্তিতে ভূতলে? ধন্য তুমি নজিরণ! ধন্য তোমার প্রেমের গভীরতা! নজির—"

এই পর্য্যন্ত সেনাপতি বলিতে বলিতে ফকির নুরকেও সেরের মত বিডম্বিত করিলেন। সেনাপতি অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, —"নুর! তুমি আমিরণ! একি ভোজবাজি না স্বপ্ন? আমি মায়ার জগতে না প্রকৃত পৃথিবীতে? হরি! হরি! হরি! বৃদ্ধ ফকিরের দৃষ্টি আমা

অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর! আমিরণ! আর এখানে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রো না—তোমাদের পবিত্র গাঢ় প্রেমে আর কলঙ্ক স্পর্শ করতে দিও না। সের তুমি সের বেশে গৃহে যাও। নুর তুমি সেরকে লইয়া যাও। নজিরণ তোমার প্রেমের গভীরতা—অতলস্পর্শী গভীরতা, বিশুদ্ধতা, স্থিরতা, দৃঢ়তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করলেম। নুর ওরফে আমিরণ—চতুরা আমিরণ! তোমার আশাও কাল পূর্ণ হবে, হোসেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। হোসেন তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না। ফকির সাহেব, আপনি কল্য প্রত্যূষে ঘোষণা করবেন—আমি কা'ল কল্‌মা প'ড়ে মুসলমান হ'ব—প্রকাশ্যে মুসলমান হ'ব, কাল সূর্য্য অস্ত গমনের পূর্ব্বে আমি নবাবের অনুমতি লয়ে নজিরণের পাণিগ্রহণ করব।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল সের, নুর ও ফকির সাহেব আর বাক্যব্যয় না করিয়া, তিন জনে এক সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শয়নে সেনাপতি।

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সেনাপতি শয়ন করিয়াছেন। নানা কথা যুগপৎ মনে উদয় হইতেছে—পাটুলী, অগ্রদ্বীপের কাজি, পীড়িতা পিতৃস্বসা গৃহে বিপদ, স্বজন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ, তাণ্ডায় আগমন কালে সঙ্গে আসিবার জন্ত যোগমায়ার কাতরোক্তি—এই সকল কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যোগমায়ার পত্র খানি মঞ্চের উপর পড়িয়া আছে। অমনি ব্যস্ততার সহিত পত্র আনিলেন। পত্রে এই রূপ লেখা আছে:—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রাণেশ্বর। আমার বুঝিতে কিছুই বাকি নাই। নজিরণ আমা অপেক্ষা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ও কল্যাণদায়িনী। আপনার বয়েন্দ্রের শরীর-রক্ষক সের ও নুর যথাক্রমে নজিরণ ও আমিরণ। যে মুহূর্ত্তে আপনি জানিবেন, এবাদতের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে সের আপনার জীবন রক্ষা

করিয়াছে; যখন জানিবেন, সের সেরপুরের যুদ্ধে স্বীয় জীবন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়াছে; সের দেশে দেশে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মায়ায়,—নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া,—পুরুষ বেশে ভ্রমণ করিয়াছে; আর সেই সের—বিবি নজিরণ; তখন আর আপনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া তাহাকে বিবাহ করবেন। পুরুষবেশী আমিরণেরও হোসেনের সহিত বিবাহ হইবে। আপনার বিবাহের দিন উপস্থিত। ঘটক মধ্যস্থের অভাব নাই। বড় আশা ছিল, আপনি মুসলমান হইবার পূর্ব্বে আপনার চরণ যুগল একবার পূজা করিব; তাহা আর পোড়া কপালে হইল না। আজ তিন দিনের মধ্যে একবার দেখা পাইলাম না। রমণীর প্রেম, রমণীর ভক্তি, যশোলিপ্সু কার্য্যকুশল সেনাপতির মনে স্থান পায়না। পূর্ব্বে আক্ষেপ করিতেন—

পত্রের এই অংশ পর্য্যন্ত সেনাপতি পাঠ করিলেন। পত্রের অপর অংশ মসীপতনে এরূপ নষ্ট হয়েছিল যে, তাহা আর বহুযত্নেও সেনাপতি পাঠ করিতে পারিলেন না। এখন সেনাপতির নানা চিন্তা আসিল। অন্তঃপুরবাসিনী যোগমায়া এ সব কথা কোথায় পায়। নানা চিন্তা করিতে করিতে সেনাপতি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত অবস্থায় কত স্বপ্নই দেখিলেন। কোন স্বপ্নে কাঁদিতে লাগিলেন। কোন স্বপ্নে হাস্য করিয়া উঠিলেন। চিন্তাকুল ব্যক্তির নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের বিরাম থাকেনা। অস্তু সেনাপতিরও স্বপ্ন দর্শনের বিরাম নাই।

সেনাপতি প্রথম স্বপ্ন দেখিলেন—বঙ্গের মধ্যস্থানে একটু ধূম দৃষ্ট হইল। ঐ ধূম কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুসংযোগে জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ধূম ক্রমে বিষম হুতাশন হইয়া সকল বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম পরিব্যাপ্ত হইল। ঐ আগুন আকাশ স্পর্শ করিল। ঐ আগুনে পুড়িয়া ঐ সকল দেশ ভস্মীভূত হইল। কত হিন্দু পুড়িল—হিন্দুর গ্রন্থ পুড়িল!

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় হাহাকার রব উঠিল। দুইটি বৃহৎ নদী দুই পার্ব্বত্য পথ দিয়া আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে দুই নদী শুষ্কপ্রায় হইল। তার পরে ঐ দুই নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড এক মরুভূমি পড়িয়া রহিল। সেই মরুভূমি দেখিয়া সেই দেশের অধিবাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সেই হাহাকারে সেনাপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেনাপতি রাম রাম বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নিদ্রিত হইলেন।

সেনাপতি আবার স্বপ্ন দেখিলেন—এক ক্ষীণাঙ্গী রুক্ষকেশা মলিন-বসনা অসিতবর্ণা পাগলিনী অসিচর্ম্ম হস্তে ক্ষিপ্রগতিতে বিচরণ করিতেছে। তাহার চক্ষু দুইটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। তাহার হৃদয়ে এক গগনস্পর্শিনী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, মুখে অট্টহাস। সে যাহা পাইতেছে তাহাই কাটিতেছে। সে কত কদলী তরু কাটিল, সে কত স্বর্ণলতিকা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সে কত রসাল তরু বিনষ্ট করিল। তাহার পদভরে পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার তর্জ্জনগর্জ্জনে অশনি-পতনের ন্যায় বিকট শব্দ উঠিতে লাগিল ও তাহাতে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। পাগলিনীর করে শঙ্খ, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ও কর্ণে জবাফুল। পাগলিনী আপন মনে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে—পরের কথায় কর্ণপাত করিতেছেনা। পাগলিনী মুখব্যাদান করিয়া সেনাপতিকে গ্রাস করিতে আসিল। সেনাপতি ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি হরি হরি বলিয়া, আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় বারে সেনাপতি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন—গয়া ধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করিতে বসিয়াছেন। পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অকস্মাৎ এক রক্তের নদী প্রবাহিত হওয়ায়

তাঁহার পিণ্ডাদি ভাসিয়া গেল। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বিশাল দণ্ড হস্তে করিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন—রে কুলাঙ্গার! রে বিধর্ম্মী মুসলমান! তুই ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক। তুই আমাদের বংশের গ্লানি। তুই বঙ্গদেশের পাপ—তুই হিন্দুর ত্রাস। তুই হিন্দু দেব দেবীর অরি। তোর জল পিণ্ড আমরা স্পর্শ করিবনা। যা যা, তুই মুসলমান-পদ-লেহনকারী কুকুর। তুই মক্কায় যাইয়া তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কালাপাহাড় কি যেন কি উত্তর করিতেছিলেন, সেই উত্তরে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি এবারে কোন দেব দেবীর নাম মুখে উচ্চারণ করিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন স্বপ্ন সকল অলীক চিন্তা। কোন দেব দেবী নাই—ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্ম সমাজ সংস্থাপনের কথা শিশুকে জুজুর ভয় দেখানের মত একটা ভয় দেখানে কথা মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি স্থিতি—ঐ নিয়মেই লয় প্রাপ্তি। স্বর্গ নরকও মিছে কথা। কর্ম্ম কিছুই নয়, পুরুষকারই সব। পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম নাই। সমুদ্রে যেমন জলবুদ্‌বুদ্ আপনিই উঠিতেছে, আপনিই লয় পাই-তেছে, সেইরূপ এই জড়াত্মক পৃথিবীতে জীবের আপনিই উৎপত্তি হইতেছে, আবার আপনই লয় হইতেছে।

সেনাপতি আর শয্যায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন। প্রভাত-বায়ু মৃদু মৃদু তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন—হিন্দু মুসলমান এক। সকলেই মানুষ। সকলেই এক রকম মনো-বৃত্তি, প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি ল'য়ে পৃথিবীতে এসেছে। মুসলমানকে কেন দ্বেষ করিব? চাই বল, চাই শক্তি। হিন্দু মুসলমানে মিলন অসম্ভব। ফকির ও স্বামীর মত ভ্রান্ত। বঙ্গে বল সঞ্চয় করতে হ'লে, হয় মুসলমান হিন্দুকে গ্রাস কর্‌বে, আর না হয়

হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করবে। হিন্দুর মুসলমানকে গ্রাস করবার সাধ্য নাই। অতএব মুসলমানেরই হিন্দু গ্রাস করাই উচিত। হিন্দু ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ লয়ে ক্ষুণ্ণমনে ভগ্নহৃদয়ে আর কত কাল হিন্দুগণ মুসলমানের অত্যাচার সহ্য করবে। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেওয়া অপেক্ষা একেবারে কাটা ভাল। তুষানলে পোড়া অপেক্ষা জ্বলন্ত আগুনে পোড়া ভাল। এই আমার দৃঢ় মত, এই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি আজ হ'তে প্রাণপণ যত্নে হিন্দু গ্রাসের চেষ্টা করব। সকল হিন্দুকে মুসলমান করব। হিন্দু দেবদেবীর লোপ করব। হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ ভস্মাবশেষ করব। বঙ্গে থাকবে এক পাঠান। তুমি একজাত আর তুমি ওজাত বঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে হবেনা। এক মহাশক্তির আবির্ভাব করব। বঙ্গের শক্তি আর্য্যাবর্ত্তে প্রসারিত হবে। সে শক্তি আর্য্যাবর্ত্ত গ্রাস ক'রে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করবে। এক মহতী—অতিমহতী শক্তি হবে। সেই শক্তির পদতলে সমগ্র পৃথিবীকে লুণ্ঠিত হ'তে হবে। আর কোন বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষের প্রতি উঁকি মারতে পারবে না।

যে আমার, আমি তার। ধর্ম্ম জাতি মিছে কথা। নজিরণ আমার, আমি নজিরণের হ'ব। আমার কি আর কেহ নাই? সুধীরঞ্জন কোথায় গেছে, খোঁজ নাই। যোগমায়া, প্রিয়তমা যোগমায়া, সে এতে কি ক্ষুণ্ণ হবে? আমি ত তার, নিশ্চয় তার, তবে ক্ষুণ্ণ হবে কেন? এক গাছে কি দুই ফুল ফোটেনা? এক গাছে কি দুই লতা উঠেনা? যোগমায়ার প্রেম গভীর, অতি গভীর। নজিরণের প্রেমও গভীরতাশূন্য নহে। আমি নজিরণকেও সুখী করিব, যোগমায়াকেও দুঃখিত করিব না। মুসলমানের চার স্ত্রী পর্য্যন্ত গ্রহণ করা নিয়ম আছে। হিন্দুর স্ত্রীর সংখ্যা নাই। এতে যদি দোষ হবে, এতে যদি শান্তি নষ্ট হবে জানতেন, তবে চিন্তাশীল শাস্ত্রকারগণ এক বিবাহেরই ব্যবস্থা করতেন।

হিন্দু ধর্ম্ম কিছু নয়, কোন ধর্ম্মই কিছু নয়। তবে হিন্দু শাস্ত্রকারগণের চিন্তা গুলি মন্দ নয়—যুক্তি গুলি গভীর। যে জাতির শাস্ত্রপ্রণেতারা বায়ুর প্রকৃতি দেখিয়া গোমাংস খাওয়া নিষেধ করেছেন, তিথি বিশেষে তরকারী বিশেষ খাওয়া নিষেধ করেছেন, গ্রহের সহিত পৃথিবী ও নর-দেহের সম্বন্ধতত্ত্ব যাঁরা অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরা অবশ্যই বিবাহের দোষগুণ ভেবেই বহুবিবাহের নিষেধ করেন নাই। যোগমায়ার প্রেম তুচ্ছ প্রেম নহে। যোগমায়ার ইচ্ছা পৃথিবীর লোকে আমাকে ভালবাসুক, জগতের লোকে আমায় ভক্তি করুক। আমি তার একার ঠাকুর হব, এ তার ইচ্ছা নয়।

আর একটা কথা। যোগমায়া বড় হিন্দু, গোঁড়া হিন্দু। তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস অতি দৃঢ়। সে যুক্তি মানে না, তর্ক কথা শুনেনা। তাকে মুসলমান করা বড় কঠিন হবে। তা যা হ'ক সে মেয়ে মানুষতো। তাকে ছলে, বলে, কৌশলে মুসলমান করব। যা দেখ্‌বে তাই শিখ্‌বে।

কালাপাহাড় এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে ফকির সলিম সা আসিয়া বলিলেন—"বেলা প্রায় ৪ দণ্ড হইয়াছে। তোমার কলমা পড়িয়া মুসলমান হইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক। আজ তাণ্ডার সকল লোক মসজিদে জড় হয়েছে। তুমি আর দেরি করিও না।

কালাপাহাড় ব্যস্ততার সহিত শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষিপ্রতার সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। অবিলম্বে উভয়ে সত্বরগতিতে তাণ্ডার প্রধান মসজিদে গমন করিলেন। ধিক্ নিরঞ্জন, তোমার বেদবেদান্ত পাঠে! ধিক্ নিরঞ্জন, তোমার শাস্ত্রজ্ঞানে! ধিক্ নিরঞ্জন! তোমার শিক্ষায়। কর দেশে শক্তি স্থাপন। বুঝিব তুমি স্বার্থসেবক না শক্তি সেবক।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার সমীপে।

৯৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সেনাপতি কালাপাহাড় বরেন্দ্র জয় করিয়া তাণ্ডায় আসিয়াছেন। ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসেই নজিরণের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় মহা-সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। আমিরণের সহিতও হোসেন পরিণীত হইয়াছেন। আজ শ্রাবণের প্রথম ভাগ। আকাশে মেঘ টল্ টল্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে—মধ্যে মধ্যে মেঘ সকল প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে। ভাগীরথীর বেগ খরতর হইয়াছে—ভাগীরথী যেন যৌবনমদে মাতিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া অহঙ্কারে কটাক্ষ করিতে করিতে আপন মনে আপন কথা বলিতে বলিতে স্বীয় গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছেন। প্রবল গর্ব্বিত লোক গমন কালে যেমন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জীবকে একটু কিছু জানাইয়া যায়, ভাগীরথীও সেইরূপ দুই তীর ভূমি ভাঙ্গিয়া বৃক্ষ লতা

ফেলিয়া ও বাঁশ ঝাড় বেগে ঠেলিয়া লইয়া স্বীয় পরাক্রম দেখাইতে ছিলেন। ভেকগণ ডাকিয়া ডাকিয়া বর্ষারাণীর গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। ধরণী সুন্দরী আর্দ্র সবুজরঙ্গের বসন পরিয়া সাদা ফুলের সাজ পরিয়াছেন। পাঠক! এই বর্ষার দিনে প্রাতঃকালে আমরা কাহার গৃহে যাইব? হাস্য পরিহাস-মগ্না নজিরণ ও আমিরণের কক্ষে প্রবেশ করিব, না পতির ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মর্ম্মপীড়িতা বিরসবদনা চিন্তামলিনা যোগমায়ার ভবনে উপস্থিত হইব? পাঠক! তুমি বাসন্তী সন্ধ্যা চাও? না শীতের তামসী রজনীর মধ্য সময় ভাল বাস? সময়বিশেষে তুমি শেষোক্ত যামিনী পছন্দ কর। আমরা আজ যোগমায়ার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিব।

রায় নিরঞ্জন কালাপাহাড় সেনাপতি মহাশয়ের মাতামহ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মাতামহী সহমৃতা হইয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মাতুল ও মাতুলপুত্রগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিলনা। তাঁহারা প্রত্যেকেই পিতৃধন আত্মসাৎ করিয়া ভ্রাতৃবঞ্চনা করিয়া ধনী হইতে অভিলাষী ছিলেন। নিরঞ্জন যেরূপ উৎকোচ দিতে ঘৃণা করিতেন, সেইরূপ মাতুল কুলের অর্থ সাহায্য লওয়াও অসঙ্গত কার্য্য মনে করিতেন। এই কারণেই পূর্ব্বে উৎকোচ দানে উজির আমিরগণকে বাধ্য করিয়া সম্পত্তির উদ্ধার হয় নাই। যে দিন নিরঞ্জন মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন, সেই দিন তাণ্ডায় প্রকাশ হইয়াছিল, কালাপাহাড় আর হিন্দু ধর্ম্ম রাখিবেন না। হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ লোপ করিবেন। এই জনশ্রুতির সুযোগ লইয়া নিরঞ্জনের মাতুলগণ যিনি যে অর্থ হস্তগত করিতে পারিয়াছেন, তাহাই লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। নিরঞ্জনের মাতামহের প্রচুর অর্থ ছিল। তাঁহার যে মাতুল যাহা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন মনে করিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে ইহাও প্রকাশ হইয়াছিল, কালাপাহাড় অগ্রে মাতুলবংশকে

মুসলমান করিবেন। তাণ্ডার বাস ভবন ও বিপণি গৃহের উপর নিরঞ্জনের মাতুলগণ আর কেহ দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা সকলে ঐ সকল অট্টালিকা পরে বিক্রয় করিবেন। তাঁহারা কেহ যোগমায়াকে সঙ্গে লইতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের সকলের আশঙ্কা যোগমায়াকে সঙ্গে লইলে, কালাপাহাড় তাঁহাদিগের প্রতি প্রধাবিত হইবে।

বেলা ছয় দণ্ড হইলেও দিবস মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন এই প্রভাত হইল। নিরঞ্জনের মাতামহালয়ে এক্ষণে কেবল এক যোগমায়া ও এক বৃদ্ধা পরিচারিকা আছেন। আজ আনন্দ বাজার নিস্তব্ধ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আজ রঙ্গালয় নিস্তব্ধতা রাক্ষসীর বাস ভবনে পরিণত হইয়াছে। যোগমায়া চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। পরিচারিকা বলিল—"বেলা কম হয়নি, তরকারী টরকারী কুটে নিন। বসে বসে সারা রাত দিন ভাব্‌লে আর কি হবে! যা কপালে ছিল হয়েছে।"

যোগমায়া। খাওয়াত প্রতিদিনই আছে, এক সময়ে খেলেই হ'লো। আমার কপাল মন্দ কিসে? যার স্বামী নবাবের সেনাপতি, তার আর কপাল মন্দ কিসে? তবে আমার এক আক্ষেপ এই যে, তিনি মুসলমান হয়েছেন।

পরিচারিকা। ঠাকুরাণি! থাম থাম। অমন স্বামী থাক্‌লেই বা কি, ম'লেই বা কি। জাতনাশা অলপ্পেয়ে নজিরণ মাগীকে বে' না ক'রে আর এ বাড়ী মুখো এলোনা। এখন এসেই বা কি করেন, কেবল বলেন মুসলমান হও, আর সেই মুসলমানীর বাড়ীতে চল।

জানিনা পরিচারিকা কালাপাহাড় কে কিরূপ চক্ষে দেখিত, কিন্তু সে সর্ব্বদাই যোগমায়ার নিকট কালাপাহাড়ের নিন্দা করিত ও গালি

দিত। অনুমান হয়, পরিচারিকা ইচ্ছা করিত যোগমায়া কালাপাহাড়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। যোগমায়া উত্তর করিলেন—"দেখ ঝি! তুমি এমন করে আমার সাক্ষাতে গাল্ দিওনা। তাঁর দোষ কি? লোকে বড় পণ্ডিত হ'লে, তাঁর ধর্ম্মমত বিগ্‌ড়ে যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর তাই হয়েছে। আমা অপেক্ষা নজিরণ তাঁকে বেশী ভালবাসে। নজিরণ নিজের জীবন দিয়ে আমার স্বামীর জীবন রক্ষা কর্‌তে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। আজ নজিরণের গুণেই তাঁকে মধ্যে মধ্যে দেখ্‌তে পাই। নজিরণের সেবায় তুষ্ট হয়ে, ফকিরের পরামর্শ লয়ে, তিনি নজিরণকে বে' করেছেন। রূপের মোহ ত কম নয়? নজিরণ পূর্ণিমার নিশি আর আমি মেঘআঁধারে অমাবস্যার রাত্রি। যা হ'ক তিনি যা হয়েছেন, সুখে থাক্‌লেই ভাল। আমি অন্য সুখ চাই না, তাঁর সুখ সম্পদ হলেই আমি সুখী হই।"

এই কথা হইতে না হইতে কালাপাহাড় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যোগমায়া সাদরে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। কালাপাহাড় বসিয়া বলিলেন—"মায়া! তুমি কেন কাঁদছিলে?"

যোগমায়া কথা বলিতে না বলিতে ঝি বলিল—"কাঁদ্‌বেন না ত কি? যার এত বড় স্বামী, তাঁর কত দুঃখ। স্বামী এক মুসলমানী বে' করেছেন, মুসলমান হয়েছেন, জিজ্ঞাসাটাও করেন না। উনি কাঁদ্‌বেন না ত কে কাঁদ্‌বে? উহাঁর মত দুঃখ কার? উনি সধবা হয়ে বিধবার বাড়া। ঠাকুর, তুমি যা করেছ, তা কি আর বল্‌তে পারি? তুমি এমন সোণার চাঁদের মত মেয়ে, এমন ভালবাসা, এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ফেলে কোথাকার এক মুসলমানী বে কর্‌লে, জাতি খোয়ালে."—

যোগমায়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ঝি! চুপকর, তোমার একি রোগ? ওঁকে দেখ্‌লেই এরূপ কর কেন? কাকেও কি গাল্ দিতে আছে?"

ঝি এই কথায় রাগিয়া গর্ গর্ করিতে করিতে বেগে সম্মার্জ্জনী চালাইয়া গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

যোগমায়া কালাপাহাড়কে বলিলেন—"আমি কাঁদি নাই।"

কালাপাহাড়। তোমার চখে জল তবু কাঁদ নাই?

পরিচারিকা ক্রোধে আর থাকিতে পারিল না, সে স্বগতই আরম্ভ করিল। ই—ই—ই, চখের জলে ঘড় পুরে গেল। মেয়ে টাকে দগ্‌ধে মার্‌লে। নিজে কাঁদান আর জিজ্ঞাসা করেন চখে জল। উনি কাঁদ্‌বেন না ত কাঁদ্‌বে কে? অমন পোড়া কপাল আর কার?

যোগমায়া পুনরপি পরিচারিকার স্বগত বাক্যাবলী নিষেধ করিয়া কালাপাহাড়কে বলিলেন—"না আমি কাঁদিব কেন, কাঁদি নাই।"

কালাপাহাড় বলিতে লাগিলেন—"দেখ মায়া! শান্তি সুখ তোমারও গিয়েছে, আমারও গিয়েছে। "তুমি কাঁদবেনা ত কাঁদ্‌বে কে" ঝির এই কথা খুব সত্য। আমিও কাঁদ্‌ছি। ভেবনা, নবাবের ভাইঝি নজিরণকে বে করে আমি বড় সুখে আছি। আমি আমার হৃদয়ে দাবানল জ্বেলেছি। এখন আমার শান্তি তোমাতে। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তুমি আমার বাল্য সখী। তুমি আপন, নজিরণ এখনও পর। নজিরণকে ভালবেসেছি কি না বল্‌তে পারি না; তার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার কর্‌ব। তুমি জান, সকল কাজ এক স্থানে হয় না। রন্ধন, ভোজন, পান, শয়নের ভিন্ন গৃহের প্রয়োজন। নজিরণ সুন্দরী রসিকা, এ কথা স্বীকার করি। তুমিও আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী, বুদ্ধিমতী ও আমার শান্তিদায়িনী। নজিরণ পুষ্পোদ্যান, তুমি অন্তঃপুর। নজিরণ বৈঠকখানা, তুমি শয়ন ভবন। নজিরণ সুখ, তুমি শান্তি। নজিরণ গোলাপের মালা, তুমি স্নিগ্ধ সৌরভশালিনী বেলের মালা। নজিরণ সুরা, তুমি সুধা। নজিরণের সহবাসে ক্ষণেক

তৃপ্তি, তোমার সঙ্গ লাভে নিরন্তর সন্তোষ লাভ! নজিরণ পরী, তুমি দেবী। নজিরণকে দেখিয়া সুখ, তুমি আরাধনার পাত্রী। নজিরণের গুণে মুগ্ধ হই, তোমার গুণে মাতিয়া থাকি। মায়া! আর কষ্ট দিও না। আর আমার শান্তি হরণ করোনা। আমার সঙ্গে এক মত হও। তুমি জেন, নিরঞ্জন-জীবনের তুমিই আশা, তুমিই শান্তি। তুমিই কল্যাণ-দায়িনী দেবী। তোমার অভাবে নিরঞ্জনের হৃদয় মরুভূমি। নিরঞ্জন পাষণ্ডাদপি পাষণ্ড। তুমি গোঁড়াম ছাড়। ধর্ম্ম কিছুই নয়। যদি থাকেন, তবে এক ঈশ্বর থাকিতে পারেন; তাঁহার চক্ষে হিন্দু মুসলমান সমান। মায়া! প্রাণের মায়া! আর কষ্ট দিও না। আমার কথা শুন, আমার মতাবলম্বিনী হও। তুমি হাজার হলেও মেয়ে মানুষ। আমি গেলেম—আমি মলেম। তোমার যদি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে আমার কষ্ট বুঝে, আমার সকল শান্তি হ'রে নিয়ে এই নির্জ্জন বাটীর দেবী হয়ে বসে থেকোনা। মায়া! প্রিয়তমা মায়া! আমার হৃদয় দেখ। তুমি কর্ত্রী হবে, নজিরণ তোমার দাসী হবে। তুমি মুসল-মান নাই হ'লে, তুমি আমার সঙ্গে চল আমায় স্পর্শ কর। মাড়োয়ার-রাজ উদয়সিংহের ভগিনী যোধা বাই পাতসাহ আকবরকে বে করিছেন। আকবর মুসলমান, তিনি হিন্দু। বেগম হিন্দু দেবদেবীর পূজা করেন ও হিন্দু খাদ্য খান, অথচ মুসলমান স্বামীর সহিত এক বাটীতে বাস করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যা ঐলবেলাকে বিবাহ করেন। ঐলবেলা যোব, নেপটিউন, কিউপিড প্রভৃতি দেবতার পূজা করতেন, অথচ হিন্দু রাজার মহিষী ছিলেন। মায়া! তোমার মায়াময়ী শক্তি হতে আমাকে বঞ্চনা করো না।

যোগ। আপনি আর যা বলবেন আমি তাই শুনব। কিন্তু আমি জীবনে আর আপনাকে স্পর্শ করব না। আপনার সঙ্গেও যাব না।

আপনি দেখা দিলে সুখী হব, মনে মনে আপনার পূজা করব। আপনি কাতর হ'য়ে কিছু বল্‌বেন না। আপনার কাতর ভাবে দুঃখ পাই। নজিরণেই আপনি সুখ শান্তি দু'ই পাবেন। আমায় আপনি ভুলে যাউন।

কাপা। তুমি যাবে না?

যোগ। না।

কাপা। তুমি যাবে না?

যোগ। না।

কাপা। তুমি যাবে না?

যোগ। না।

এই কথায় কালাপাহাড় আরক্তনয়নে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দেখ যোগমায়া! তোমার প্রতি বল প্রয়োগ কর্‌ব না, এতটুকু ভালবাসা তোমার প্রতি আমার এখনও আছে। কাঁদ্‌বে, এই নির্জ্জন বাটীতে বসে কাঁদ। তোমার হিন্দুধর্ম্ম লোপ করব; তোমার হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে দিব, তোমার হিন্দুশাস্ত্র পুড়িয়ে ছারখার কর্‌ব। কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা ভেঙ্গে গঙ্গার জলে ভাসাব, আর সেই দেবদেবীর মন্দিরে গো হত্যা করব। গোরক্তে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির ধৌত কর্‌ব। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম উঠিয়ে ফল্গুতে ফেলে দিব। নবদ্বীপ পোড়াব—পণ্ডিতের শাস্ত্র পোড়াব। পুরীর জগন্নাথ হয় পুড়িয়ে ছারখার করব, না হয় বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দিব। কামাখ্যার মন্দির ও পিঠচিহ্ন উপ্‌ড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেল্‌বো। তোমার পাপে—তোমার অবাধ্যতায় বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম লয়ে যে আগুন জাল্‌ব, তাতে হিন্দুর সব পোড়াব—হিন্দু নাম এদেশে লোপ কর্‌ব। এই জেন আমার কথা—এই জেন আমার প্রতিজ্ঞা। মলিম সা ফকিরের ভুল। জ্ঞানানন্দ স্বামীর ভুল। পোড়া-কপালে হিন্দুর গোঁড়াম যাবে না। একটা

পতিপ্রাণা বালিকা পতির খাতিরেও ধর্ম্ম-গোঁড়ামি ছাড়ে না, তাই কি হিন্দু মুসলমানে মিল্‌বে? সকল হিন্দু নাশ করে এক মুসলমান কর্‌ব—কাশী হ'তে কামাখ্যা, হিমালয় হ'তে বঙ্গোপসাগর আল্লা আল্লা ধ্বনিতে, লায় লাহা এল্ এল্লা কলমায় এদেশ কম্পিত কর্‌ব। জেন যোগ! তোমার দোষে সোণার বাঙ্গালা ছারে খারে চল্‌লো।

যোগমায়া আর ভয়ে কথা বলিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় বেগে গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমিরণের গৃহ।

আমরা নজিরণ ও আমিরণকে বীরবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। ইহাঁদিগের নারীজনোচিত গুণগ্রাম আছে কিনা, তাহা কি এক বার আমাদিগের অনুসন্ধান করা উচিত নহে? হোসেন ও আমিরণের একটু পরিচয় জানাও আবশ্যক। আমিরণ ভাগলপুর অঞ্চলের একজন মুসলমান জমীদারের কন্যা। হোসেন আমিরণের খুল্লতাত পুত্র। হোসেনের পিতার মৃত্যু হইবার পর হোসেন জ্যেষ্ঠতাতের অধীনে আমিরণের সহিত এক সঙ্গে লালিতপালিত হইতে থাকেন। আমিরণের পিতা সোলেমানের ভ্রাতা তাজখাঁয়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি তাজ খাঁকে কর দিতে অসম্মত হন। তাজ খাঁর সহিত আমিরণের পিতার যুদ্ধ হয়। হোসেন বালক হইলেও পিতৃব্যের পক্ষে তুমুল সংগ্রাম করেন। যুদ্ধে আমিরণের পিতা নিহত হন। আমিরণ পিতৃমাতৃহীনা বালিকা তাজ খাঁর অধীন হয়েন ও নজিরণের সহিত বাস করিতে থাকেন। হোসেন কিছু দিন পলায়িত অবস্থায় ছিলেন, পরে যখন হোসেনের নাম অনেকেই ভুলিয়া

গেল, তখন তিনি আমিরণের অনুসন্ধান পাইয়া সোলেমানের অধীনে সৈনিক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন ও আমিরণে পূর্ব্বেই অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। তাণ্ডায় মধ্যে মধ্যে আমিরণ ও হোসেনে দেখা সাক্ষাৎ হইত। উভয়ের মধ্যে বাল্যকালের অনুরাগ এক্ষণে যৌবনের প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর বরেন্দ্র ভূমিতে শান্তি স্থাপিত হইবার পর কালাপাহাড়ের ইচ্ছায় ফকির সলিম সার মধ্যস্থতায় আমিরণ ও নজিরণ উভয়েরই এক দিনে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

শরৎ কাল উপস্থিত। আগামী পরশ্ব কালাপাহাড় সসৈন্যে বারাণসী যাত্রা করিবেন। এ যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য কাশীজয় ও কাশীর দেবদেবীর ধ্বংস সাধন। অদ্য আমিরণ ও হোসেনের গৃহে নজিরণ ও কালাপাহাড়ের নিমন্ত্রণ। কালাপাহাড় সেনাপতি ও হোসেন একজন মান্য গণ্য সেনা-নায়ক। নজিরণ ও আমিরণের যেরূপ প্রণয় কালাপাহাড় ও হোসেনেও সেইরূপ সদ্ভাব।

অগ্নির দাহন করিবার শক্তি আছে, তাই কি সকল সময়ে দহ্যমান কাষ্ঠ সমান ভাবে জ্বলে? প্রাকৃতিক নিয়মে নানা কারণে জ্বলার মধ্যে মধ্যে বিরাম আছে। জলধারায় অনেক সময়ে অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয়—অনেক সময়ে বাতাসে বহ্নি ধূ ধূ জ্বলিতে থাকে। কালাপাহাড়-কাষ্ঠে যোগমায়া অশান্তির অগ্নিশিখা জ্বালিয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু নজিরণ ও আমিরণ ইহাতে প্রেম ও স্নেহের বারি ধারা বর্ষণ করিতেছেন ও সেনা-পতির গুরু কর্ত্তব্য কাষ্ঠের গিরায় বাধিয়া বহ্নি-শিখা নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছে। আমরা শোক, তাপ ও জ্বালা ঢাকিয়াই সংসারে চলিতে চাই। কর্ত্তব্যের ভারে অনেক জ্বলাই নিভিবার উপক্রম হয়। সংসারে কে না কাঁদে, কে না হাসে? আমরা এক চ'খে কাঁদিতেছি, অন্য চ'খে হাসিতেছি। ঘরে বসিয়া কাঁদিলাম, বাহিরে বন্ধু দেখিয়া হাসিলাম। কঠিন মনঃপীড়ায়

কাঁদিতেছি। আবার কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্য-সাধনে প্রভুর প্রশংসাবাদে—পার্শ্ববর্ত্তী লোকের গুণ কীর্ত্তনে হাসিয়া উঠিতেছি। স্মৃতি ও বিস্মৃতি স্ব স্ব মায়া বিস্তার করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বিস্মৃতি মায়া-জালে সকল কষ্ট ঢাকিবার চেষ্টা পাইতেছেন, স্মৃতি সকল দৃশ্য নয়নের উপর আনিয়া ধরিতেছেন। আমরা স্মৃতি বিস্মৃতির হাতের ক্রীড়ার পুতুল হইয়াছি। আমরা স্মৃতিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিস্মৃতির মায়া-জালের ছায়ায় উপবেশন করিয়া সকল ক্লেশ অপনোদন করিতে চাহি। এই সুখ দুঃখের বিচিত্র ভাণ্ডার সংসারে, বিস্মৃতির বটচ্ছায়া ও স্মৃতির উত্তপ্ত মরু উভয়ের সুখ দুঃখই আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে। আমিরণের বাড়ীতে নজিরণ অগ্রেই আসিয়াছেন। সেনাপতি কালাপাহাড় পরে অশ্বারোহণে সেই ভবনে উপনীত হইলেন। তিনি বহির্ব্বাটীতে অবস্থান না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আমিরণ নিকটে আসিয়া বলিলেন—"কি দুঃসাহস! ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ। এখনই ধরে বিচারের জন্য পাঠাব।"

কাপা। আমি বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি। আমার সের আলি ও নুর আলি নামে দুই জন শরীর-রক্ষক পালিয়েছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে এসেছি। আমার অব্যাহতগতি।

আমি। আমিও বেরব। আমার ঘোড়াও বাহিরে সাজান আছে। আমার সখীর একটি ক্রীতদাস পালিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

কাপা। বটে—বটে। আগে আমি আমার শরীর-রক্ষক গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাই।

আমি। ক্রীতদাস বলে যদি ধরা পড়ে যান?

কাপা। ধরা দিলে ত ধরা পড়ব।

আমি। ধরাও দিয়েছেন ধরাও পড়েছেন।

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে হোসেন নিকটে আসিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সেনাপতি কি কাশী যুদ্ধে আবার সের আলি ও মুর আলিকে সঙ্গে লয়ে যাবেন। সেরূপ আবিসিনীয় শরীর রক্ষক আর হয়না।"

এই সময় নজিরণ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলেন এবং বলিলেন—"এ যুদ্ধেও আমাদের নিয়ে চল না? আমরা যে মেয়ে মানুষ তাত তোমরা কিছুই ঠিক পাও নাই।

কাপা। খুব পেয়েছি।

নজি। খুব পেলে আর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতে দিতে না।

কাপা। ছদ্মবেশী পুরুষ বলে আমার অনেকবার সন্দেহ হয়েছে।

এই সময়ে জিজিরণ একখানা পরিষ্কৃত পাত্রে করিয়া কয়েকটি ভাল ভাল ফুলের মালাও তোড়া আনিতে আনিতে ডাক ছাড়িল—"ভাল ভাল ফুলের মালা চা—আ-আ-আ-ই—ভাল ভাল ফুলের তোড়া চা—আ—আ—আ—ই—"

আমিরণ বলিল—"জিজিরণ! তুই বোকা। সেনাপতি কি আর ফুলের মালা কিন্‌বেন? তিনি ফুলের মধুর চাক পেয়েছেন।"

জিজিরণ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"তিনি চাক পেয়েছেন, হোসেন খাঁরও কি পেতে বাকি আছে? আমার পোড়া কপাল, আমার ফুলের তোড়া মালা কেহ কিনলে না—।"

আমিরণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—"পোড়ার মুখী। তোর মালঞ্চে কি এত ফুলই ফোটে যে তা সব আর বিক্রোয় না? একটু দেরি কর, তোর মালি এলোবলে।"

জিজিরণ উত্তর করিল—"তোমরা এখন মরজি করে যা বল। আমি ক্ষুদ্র মেলেনো, আমার ফুলটা আস্‌টা আমার মালিকেই দেই।

আমার মালঞ্চে মধুর চাকও নাই, আর দশে বিশে মধুর মাছি এসে মধুও ঢালেনা।”

এই সময়ে নজিরণ বলিল—“পোড়ার মুখী জিজিরণ, তুইত এখন খুব কথা শিখেছিস।”

এই রূপ কথা হইতে হইতে ছবিরণ গোটাকতক পান ও আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত কেলো ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং ডাক ছাড়িল—“তোমরা কেউ গোলাপী খিলি নেবে গো? দুই খিলি এক মন।”

কৃষ্ণচন্দ্র ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই সেনাপতি ও সেনানায়ক হোসেনকে দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন—“আজ্ঞে, আজ্ঞে এখানে সেনাপতি ও খাঁ সাহেব। আমি—আমি—”

কালাপাহাড় ডাকিয়া বলিলেন—“কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজা। আমি বাঙ্গালা বেহারের সেনাপতি আপনার কাছে কি? আমি আপনার কাছে পূর্ব্বে ছিলাম নিরু ঠাকুর, এক্ষণে আছি নিরু খাঁ পাঠান। আপনি আমার বাল্যবন্ধু; আমি সেনাপতি বলে কিছু মাত্র ভয় করবেন না। জিজিরণের সঙ্গে বে’ আমি নিশ্চয় দেব।”

সেনাপতি জিজিরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—“কেমন জিজিরণ, তুমি ত মুন্সিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বে করছ?”

জিজিরণ মস্তক অবনত করিয়া বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। ছবিরণ ও জিজিরণের বিবাহও প্রধান প্রধান সৈনিকের সহিত হইয়াছিল। কালু সে বিবাহের কথা জানিত না।

কালাপাহাড় আবার কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন—“মুন্সিরাজ ঘোষজা। নেচে, গেয়ে, বাজায়ে আমাদিগকে একটু সুখী কর। তোমার মত গায়ক, তোমার মত বাদক, তোমার মত নর্ত্তক এ সহরে আর নাই।”

নজিরণ, আমিরণ, ছবিরণ ও জিজিরণ চারি জনেই এক সঙ্গে কালুর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা আরও জিজিরণের মুখ টিপিয়া বলিলেন—"ওলো জিজিরণ! তোর বড় কপাল, এমন রসিক চূড়ামণির সঙ্গে তোর বে।"

কৃষ্ণচন্দ্রের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নানা অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে গান ধরিলেন—

জিজিরণ রূপের ডালি, কমল কলি,
ফোটা গোলাপ ফুল।
জিজিরণ হাস্‌ছে বসে, ফুল পড়ছে খঁসে,
রসিক ভ্রমরা আকুল॥
জিজিরণ ডাঙ্গায় চাঁপাফুল, জলে কমল ফুল,
পরী বলে মনে করি ভুল।

এই সঙ্গীত হইতে হইতে আমিরণ বলিলেন—"জিজিরণ ত এখন তোমার। জিজিরণের রূপের গুণের গান তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে শুনিয়ো; এখন শ্যামা বিষয়, ভবানী বিষয়, টপ্পা, খেয়াল, দেহতত্ত্ব, সংকীর্ত্তন, এই সকল গানের একটা গাও।"

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন।—"তবে আচ্ছা আমি ক্রমে ক্রমে সব গাচ্ছি। আগে শ্যামা বিষয়ই ধরিঃ—

খাঁড়া ধরা ভয়ঙ্করা শ্যামারে মা,
রণে ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী দিগম্বরী রে মা,
কভু সিংহ পরে চড় দশ হাতে অস্ত্র ধর॥
দৈত্যদলে দমন কর উমারে মা,
কখন বা হাঁ করে দাঁড়িয়ে শম্ভু উপরে,
সংহার মূর্ত্তিতে হও সর্ব্ব সংহারিণী রে মা।

কখন বা হিমালয়ে সখীদলে সঙ্গে লয়ে,
মেনকায় মা মা বলে ডাক রে মা।
কখন বা বৃন্দাবনে, গোপালগণের সনে
আকুল গোকুল নারী কর রে মা।

অতঃপর তাঁহারা মিষ্ট কথায় ও কিছু অর্থ দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বিদায় করিলেন। আর বলিয়া দিলেন—"বিবাহের জন্য চিন্তা নাই, শুভ দিনে শুভ লগ্নে নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে।"

কৃষ্ণচন্দ্র এক সঙ্গে দুই মুদ্রা পাইয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া বগল বাজাইতে বাজাইতে তাণ্ডার বাজার অভিমুখে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য কৃষ্ণচন্দ্র স্বকৃত গান ব্যতীত পরকৃত গান কখনও গাইতেন না। বিবাহ প্রস্তাবে কৃষ্ণচন্দ্র যতই বাতুলতা প্রকাশ করুন না কেন, সঙ্গীত ও কার্য্য বিষয়ে তত বাতুল ছিলেন না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বারাণসী নগরী এস্থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে সেনাপতি কালাপাহাড়ের সৈন্যদল যুদ্ধ সম্ভার ও অশ্ব গজাদি আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এইস্থানে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশী-রাজের দূতগণ মনে করিয়াছেন, এই স্থানেই কালাপাহাড় সৈন্য সামন্তসহ ভাগীরথী পার হইবেন। কাশীর উত্তরদিকের প্রান্তরে কাশীরাজের সৈন্য-সামন্তের সহিত কালাপাহাড়ের যুদ্ধ হইবে—এই বিশ্বাসে কাশীরাজ সেই প্রান্তরে সেনাদল সহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন।

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ। দেব দিবাকর তাঁহার কিরণ-জাল সংযত করিয়া ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ-বায়ু সেবনের অনুমতি করিয়া অস্তাচল গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। বিহগকুল দৈনিক আহার সমাপন করিয়া চঞ্চু মুছিয়া পক্ষ ঝাড়িয়া কুলায়ে গমনের উদ্যোগ করিতেছে। বিগত-যৌবনা

বিলাসপ্রিয়া কুলকামিনী দলের ন্যায় শারদীয় ফুল-দল ম্লান ভাবে অর্দ্ধ-বিকসিত হইয়াছে। সেফালিকা দুই চারিটি আছে। স্থলপদ্ম এক আধ্‌টি অর্দ্ধবিকসিত অবস্থায় আছে। জলপদ্ম নির্ম্মূল প্রায়। অতসী কতক শুষ্ক হইয়াছে ও কতক অর্দ্ধ-বিকসিত অবস্থায় আছে। এই সময়ে সেনাপতি কালাপাহাড় প্রধান প্রধান সেনানায়ককে নিজের শিবিরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সকলেই সেনাপতির পটমণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সেনাপতি উপস্থিত সেনানায়কদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বারাণসী আক্রমণ বড় বিপদসঙ্কুল। কাশীরাজের সেনাবল কি আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। কাশী হিন্দুমাত্রেরই প্রিয় তীর্থ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। ন্যায়যুদ্ধে আমরা কৃতকার্য্য হব কি পরাভূত হব, সে বড় সন্দেহের বিষয়।"

হোসেন। ন্যায়যুদ্ধে যদি আমরা কাশী জয় না কর্‌তে পারি, তবে আমাদের কাশী আসাই অন্যায় হয়েছে। ন্যায় যুদ্ধই কর্‌তে হবে, অন্যায় যুদ্ধ ত কাপুরুষতা।

পীরবক্স কালাপাহাড়ের অপর সেনানায়ক। ইনি ছবিরণের স্বামী। শুনাযায় ইনিও একজন স্বধর্ম্মত্যাগী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। পীরবক্স বলিলেন—"হো হো হোসেন মিয়া এখনও বালক। যুদ্ধইত অন্যায় কার্য্য। জীবহত্যা, নরহত্যা, পরদেশ হরণ প্রভৃতি কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্য? পাপে ডুবিতে আসিয়াছি, যে ভাবে পারি, পাপ-সাগরের তলা স্পর্শ কর্‌তে হবে—জয়-মুক্তা তুল্‌তে হবে।

নজিরণের সহচরী জিজিরণের স্বামীর নাম মীরবন্দে আলি। মীর বন্দেআলি সবল শরীর দীর্ঘকায় যুবা পুরুষ। তিনি বলিলেন—"আমরা হজরত মহম্মদের নামে ধর্ম্ম যুদ্ধ কর্‌তে এসেছি। রসুল বলেন, কাফেরের

ধর্ম্মনাশ ও হজরতের ধর্ম্ম প্রচার পরম ধর্ম্ম। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী ধর্ম্মের জন্যই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধশাস্ত্রের নিয়মে, বীরগণের অনুমোদিত পদ্ধতি ক্রমে, আমরা যুদ্ধ কর্‌ব।

পীর। মেয়া সাহেবরা থামুন। লড়াই ফতে করাই—আমাদের কাম—তাই হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্য। আমার মতে কতক সৈন্য নদী পার হয়ে গঙ্গার বাঁ পার দিয়ে কাশীর দিকে যাউক। আমাদের কতক গুলি নৌকা মহাজনী নৌকা ব'লে, কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে যাউক। এই রাত্রিতেই দশ আনা রকম সৈন্য গঙ্গার বাম পার দিয়ে চলে যেয়ে ফজিরের ওক্তেই কাশীরাজের ফৌজের সঙ্গে লড়াই বাধাবে। আর ছয় আনা রকম সৈন্য খুব দ্রুতবেগে এই ডান পার দিয়ে কাশীর অশ্বমেধের ঘাটের সোজা যাবে। যে নৌকাগুলি মহাজনী নৌকা ব'লে পাঠিয়ে দেব, সেই গুলি অশ্বমেধের ঘাটের সোজা নৌকায় সেতু প্রস্তুত কর্‌বে। আমাদের ছয় আনা রকম ফৌজ রাত থাক্‌তে গঙ্গা পার হবে এবং আগে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মুর্ত্তি ও মন্দির ভেঙ্গে ফেলবে। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা গেলে আর হিন্দুদের বল সাহস কিছুই থাক্‌বে না।

সেনাপতি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেনানায়কগণ সেনাপতির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। পরে বহুক্ষণ চিন্তার পর সজলনয়নে বলিলেন—"কাশী ধ্বংস করা আমার একটা বড় কাজ। যেরূপেই হ'ক কাশী জয় কর্‌তেই হবে। দূরের লোকে যুদ্ধে জয় পরাজয় দেখে, ধর্ম্ম যুদ্ধ, অধর্ম্ম যুদ্ধ দেখে না। আমার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? হিন্দুর বিনাশ সাধন আর সকল হিন্দুকে মুসলমান করণ, এই আমার জীবনব্রত, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

অনন্তর হোসেন ও বন্দেয়ালী বলিলেন—"আমরা গঙ্গার বাম পার দিয়ে যেয়ে কাশীরাজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ কর্‌ব।"

পীর। আমরা গঙ্গার ডাইন পার দিয়ে যেয়ে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার সর্ব্বনাশ করব।

অতঃপর পীরবক্সের পরামর্শই গ্রহণ করা হইল। কতকগুলি নৌকা মহাজনী নৌকা বলিয়া নৌসেতু নির্ম্মাণার্থ প্রেরিত হইল। কল্য প্রত্যূষে দুই দিক দিয়া কাশী আক্রমণ করা স্থির হইল। কালাপাহাড় ছয় আনা রকম সৈন্য লইয়া সন্ধ্যা পরেই যাত্রা করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশী জয়।

আল্লা—আল্লা—আল্লা। অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! অন্নপূর্ণামায়িকী জয়! বাবা বিশ্বেশ্বরজি কি জয়! বাল-সূর্য্য উদয়াচলে রক্তাভ কিরণমালা বিক্ষেপ করিতে করিতে সমাগত হইয়াছেন। বিহঙ্গকুল কুলায় না ছাড়িয়াই প্রাতঃস্তোত্র পাঠ করিতেছে। অনিল অরুণের অভ্যর্থনা-সূচক চামর ব্যজন করিতেছেন। কুসুম-কুল হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া উঠিল। পত্রপুঞ্জ নড়িয়া নড়িয়া নাচিয়া উঠিল। তরুকুল দুলিয়া দুলিয়া দোল খাইতে লাগিল। ব্রততীকুল হেলিয়া হেলিয়া তরু শাখায় আলিঙ্গন করিয়া হেলিয়া পড়িল। পেচক, বাদুড়, চামচিকা অরুণকে গালি দিতে দিতে পলায়ন করিল। তস্করকুলও তাহাতে অনুমোদন করিল। তারকা-বেষ্টিত শশধর অরুণের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিপাতে পেচকাদি ও তস্করাদির কার্য্যে, বিনা বাক্য ব্যয়ে, অঙ্গভঙ্গিতে

সমর্থন করিলেন। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধরবে দিগন্ত কম্পিত হইল। কাশীরাজের সহিত হোসেন প্রমুখ কালাপাহাড়ের সেনাদলের ঘোর সংগ্রাম বাধিল। পদাতিক পদাতিকের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, তীরন্দাজ তীরন্দাজের সহিত, অসিযোদ্ধা অসিযোদ্ধার সহিত ঘোর আহবে প্রমত্ত হইলেন।—যেন দেবাসুরে ঘোর সমর বাধিল। কাশীরাজ অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হোসেনআলি ও রন্দেআলির যুদ্ধকৌশলও বিচিত্র।

অন্নপূর্ণা-মন্দিরে আরতি হইতেছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে মঙ্গল আরতির ঘোর ঘটা লাগিয়াছে। সঙ্কটার বাড়ী শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। কাল-ভৈরবের মন্দিরে আরতির বাদ্যের সহিত নবাগত সারমেয় দল ডাকিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় পশ্চাৎদিক্ হইতে রব উঠিল ;—

"পালারে পালারে কাফের! পালারে সত্বর।
পরাণে বাঁচিস যদি যা যা নিজ ঘর॥"

"ওমা! ওরে বাবা! এ কারা! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ঘোর বিপদ! মুসলমান-সৈন্য মন্দিরে আসিয়াছে। কালাপাহাড় পুরী প্রবেশ করেছে" —এই কথা যাত্রীর মুখ হইতে পাণ্ডার মুখে, পাণ্ডার মুখ হইতে সমগ্র বারাণসী সহরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কথা উঠিতে উঠিতে পলায়নের ঘোর রোল উঠিল। পাণ্ডাগণ বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি জ্ঞানবাপীতে ফেলিয়া দিলেন। অন্য পাণ্ডাদল অন্নপূর্ণার পীঠ চিহ্ন লইয়া পলায়ন করিলেন।

কালাপাহাড়ের সেনাদল চক্‌বাজারে আগুন লাগাইয়া দিল। অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও বিশ্বেশ্বরের কৃত্রিম মূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল। শঙ্কটাকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করা হইল। কালভৈরব দণ্ডাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইলেন। বৈশ্বানর লোল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক পবিত্র পুরী বারাণসী উদরসাৎ

করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিল। ধূমপুঞ্জ তদূর্দ্ধে উঠিল। বাল-বৃদ্ধ-বনিতার রোদন ধ্বনিতে প্রলয়কাল বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল।

ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণ, পরহিতব্রত সন্ন্যাসিদল, ভক্তিপূর্ণ ছাত্র-নিচয় ও কাশীর সাধারণ অধিবাসিসমূহ যিনি যাহা পাইলেন, তাহাই হস্তে লইয়া কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। কালাপাহাড়ের সহিত তাঁহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধিল। কালাপাহাড় এক তেজস্বী অশ্বের পৃষ্ঠে থাকিয়া সুকৌশলে সৈন্যচালনা করিতেছিলেন, তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন. একজন সন্ন্যাসী দূর হইতে চিম্‌টা ছুড়িয়া তাঁহার নিধন সাধনের উপক্রম করিতেছেন; কিন্তু একটি ছাত্র দণ্ডাঘাতে চিম্‌টা ভূতলে ফেলিয়া দিল। সেনাপতি ছাত্রটিকে চিনি চিনি করিয়া ব্যস্ততায় চিনিতে পারিলেন না। ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দুগণ প্রাণপণে ধর্ম্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছেন ও মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের জন্য বীর নিনাদে পৃথিবী কম্পিত করিতেছেন। এইরূপ যুদ্ধে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইল।

কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রেই সংবাদ পাইলেন. অন্য পথে কালাপাহাড আসিয়া দেব দেবীর মন্দির সকল আক্রমণ করিয়াছে। কাশীরাজ আর যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে নগরী রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সৈন্যও আসিল। দগ্ধ কাশীর পশ্চিম পার্শ্বে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানে ঘোর সংগ্রাম হইল। হিন্দুগণ অনাহারে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণ পর্য্যায় ক্রমে এক দলের পর অপর দল আহার সমাপন করিয়া আসিয়া নবোদ্যমে সমর-লালসার পরিতৃপ্তি করিতে লাগিলেন। ক্লান্তি বশতঃ হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে মুসলমান সৈন্য

বুভুক্ষু সিংহ দলের ন্যায় হিন্দু সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। দূর হইতে বিক্ষিপ্ত এক শর অশ্বারোহী কাশীরাজের কর্ণমূলে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অচৈতন্ত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব তাঁহার সাজ পোষাক দশন দ্বারা কঠিনরূপে ধারণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। হিন্দু দল একেই দেব দেবীর মূর্ত্তিনাশে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, কাশী-দাহের অগ্নিশিখায় তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল এবং অবশেষে যখন শুনিলেন, রাজা সমরাঙ্গণে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাদিগের উদ্যম উৎসাহ কিছুই থাকিল না। এরূপ অবস্থায়ও কাশীরাজের সেনাপতি শেষ চেষ্টা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কালাপাহাড়ের পক্ষ হইতে সুরাপানে প্রমত্ত, শত্রুদলনে সমর্থ, এক দল বৃহৎ হস্তী হিন্দু-নাশের জন্ত হিন্দুদিগের প্রতিকূলে পরিচালিত হইল। আর হিন্দুর উপায় থাকিল না। মৃত্যু ভিন্ন জয়ের আশা থাকিল না। সমর করিতে করিতে না মরিয়া, হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া, ও শুণ্ডাঘাতে মরিয়া স্বর্গে যাইবার পথ থাকিল না; তখন হিন্দু সেনাপতি, তূর্য্যধ্বনি করিয়া জানাইলেন "পালাও পালাও"। হিন্দুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলেন। কতকগুলি দুর্ভাগ্য হিন্দু কালাপাহাড়ের করে বন্দী হইলেন।

অতঃপর কাশীর যে দৃশ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সে দৃশ্য বর্ণনা করিলে লেখনী অপবিত্র হইবে। সে দৃশ্য মনে করিলে হৃদয় কলঙ্কিত হইবে। উপায়ও নাই। ঐতিহাসিক উপন্তাস লিখিতে বসিয়াছি; পাপীর পাপের অভিনয় দেখাইতে বসিয়াছি। মুসলমান অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগী স্বধর্ম্মদ্রোহীর কার্য্যের অপকারিতা দেখাইতে উদ্যোগী হইয়াছি —ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুফল দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছি—অপরিণাম-দর্শীর অনুষ্ঠানের কুফল দেখাইতে বসিয়াছি, এক্ষণে বিরত হওয়াও সঙ্গত

নহে। যিনি ধর্ম্ম ভীরু হইবেন, যাঁহার দেব দেবী ও ধর্ম্ম ক্ষেত্রের পাপময় দৃশ্যে মনে কষ্ট হইবে, অনুরোধ করি তিনি এ পরিচ্ছেদের এ অংশ পাঠে বিরত হইবেন। বারাণসীর অধিকাংশ স্থান ভস্মীভূত হইল। দেব-মন্দির ও দেব-মূর্ত্তি সকল চূর্ণবিচূর্ণ করা হইল। দগ্ধাবশিষ্ট দ্রব্যজাত সেনাপতির অনভিমতে লুণ্ঠন করা হইল, ভগ্ন দেব মন্দির সমূহে ও দেবালয়ে গোবধ করা হইল। গোরক্তে পুণ্য ভূমি স্নাত হইলেন। হিন্দু দেবালয়-সমূহ গোরক্তে স্নাত হইবার পর মুসলমানগণের নমাজ ও আল্লা আল্লা ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত হইল। পাপাশয় নীচপ্রকৃতি সৈনিক দল চূর্ণীকৃত দেবমূর্ত্তি-সমূহের উপর মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিল ও আহারাবশিষ্ট গবাদির অস্থি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিল। সেনাপতির অনভিমতে কত সতী স্ত্রীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইল। কত শিশুকে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করা হইল। কত রোরুদ্যমানা কামিনী জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে দগ্ধীভূতা হইলেন। বালবৃদ্ধবনিতার হত্যাকাণ্ডও গোপনে গোপনে যে কিছু না হইল এমত নহে। সাত দিন পৈশাচিক কাণ্ডের ভয়ঙ্কর অভিনয়ে পুণ্যধাম কম্পমান থাকিলেন। জয়ান্তে যত প্রকার পাপের অভিনয় হওয়া সম্ভব, সর্ব্বপ্রকার পাপ দৃশ্যেরই অভিনয় হইল। হাহারবে পুণ্যক্ষেত্র পূর্ণ থাকিল। মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি পিশাচপ্রবৃত্তি সৈনিক-দলের হাস্যোদ্দীপক বিষয় হইতে লাগিল। এই সাত দিন কাশীর দৃশ্য শ্মশান বা মশানের দৃশ্য অপেক্ষা সহস্র গুণ ভয়ঙ্কর হইল। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর যে দৃশ্য দেখাইবার বাসনা করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্যই কাশীবাসিগণকে দেখাইলেন। হিন্দুর স্বার্থপরতার, হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতার, হিন্দুর স্বজাতিদ্রোহিতার, হিন্দুর স্বজাতি স্বজন হিংসার সমুচিত দণ্ডবিধান হইল। ভক্তপালের বিশ্বাস ঘাতকতার, জয়চন্দ্রের স্বজন-হিংসার, পশুপতির রাজ্য-লিপ্সার

সমুচিত দণ্ডবিধান হইল। ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রাধান্য-প্রিয়তার, ভারতের একতা-শূন্যতার, ভারতবাসীর মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবার অনধিকারিতার, ভারতবাসীর একজনকে পাঁচ জনের অধীনে রাখিবার ও পাঁচ জনে একজনের অধীনে থাকিবার অপটুতার সমুচিত দণ্ড বিধান হইল। ভারতবাসীর সহানুভূতি-শূন্যতার, ভারতবাসীর নিশ্চেষ্টতার, ভারতবাসীর উদ্যম-শূন্যতার সমুচিত দণ্ড বিধান হইল। ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতির বুঝিয়া কার্য্য করিবার এক সুন্দর আদর্শ হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার দম্পতি মধ্যে।

তোমার কাশী ছারে খারে দিয়ে এসেছি। তোমার বিশ্বেশ্বরও নাই, অন্নপূর্ণাও নাই। অন্যান্য ছোট দেব দেবী ত নাইই নাই। গয়াক্ষেত্রের পাণ্ডাদিগের রোজগারের ফন্দি বিষ্ণু-পাদ-পদ্মের চিহ্নও এত দিন গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ফল্গুর বালিতে মিশেছে। হিন্দু তীর্থের পর হিন্দু তীর্থের ধ্বংস করব। হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তির পর হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করব, হিন্দু পল্লীর পর হিন্দু পল্লী পোড়াব, কেবল জোর ক'রে ধ'রে হিন্দুকে মুসলমান করব না। তুমি কদিন হিন্দু থাকবে? হিন্দু নাম আমি ভারত হ'তে লোপ করব। হিমালয় হ'তে কুমারিকা ও ব্রহ্মদেশ হ'তে আফগান দেশ মুসলমানগণে ও মুসলমানের দেবতা আল্লা নামে পূর্ণ করব। দেখ্‌ব তুমি কি ভাবে হিন্দু থাক? প্রত্যেক গ্রাম পোড়াব। কষ্টে, মনস্তাপে, শোকে ও দুঃখে সকল হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্র অঙ্কে স্থান লাভ করবে যখন হিন্দু বল্‌তে থাকবে না, তখন তোমাকে আপনিই মুসলমান হ'তে হবে। কালাপাহাড়ের নামে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা কাঁপ্‌বে। কালাপাহাড়কে হিন্দু ও হিন্দুর দেবগণ যমের মত ভয় করবে। তোমার জিদ্‌ তখন কোথায় থাকবে দেখ্‌ব। এই কথা গুলি কালাপাহাড় সদর্পে যোগমায়াকে বলিলেন।

কাশী জয় হইয়াছে। কালাপাহাড় তাণ্ডায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। পথিমধ্যে কত দেবমূর্ত্তি, কত দেবীমূর্ত্তি ও কত দেবালয়ের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। কত হিন্দুপল্লী ভস্মসাৎ করিয়াছেন। গয়াধাম জয় করা অতি সহজ বিবেচিত হওয়ায় পিরবক্স ও হোসেন আলিকে সৈন্য-সহ গয়ায় পাঠাইয়া ঘোর আড়ম্বরে উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে এই নিমিত্ত সেনাপতি তাণ্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নজিরণের অনুরোধে কালাপাহাড় আজ যোগমায়ার সহিত দেখা করিতে মাতামহালয়ে গমন করিয়াছেন। যোগমায়া সেই ভাবেই নিরঞ্জনের মাতামহালয়েই অবস্থিতি করিতেছেন। আমিরণ, ছবিরণ, ও জিজিরণ সেনাপতির মন পরীক্ষার জন্য আজ তাঁহাকে কাঁদাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এক একজনে এক এক ভাবে যোগমায়ার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সেনাপতির প্রেম-পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া, সমুদ্র তরঙ্গে তীরভূমি প্লাবনের ন্যায় তদীয় নয়নে প্লাবন আসিয়াছে। তাঁহারা যোগমায়ার অনেক গুণ বর্ণনার পর বলিয়াছেন, যোগমায়ার পতিভক্তি এত গভীর ও দৃঢ় যে, তিনি (নিরঞ্জন) বরেন্দ্র ভূমি জয় করিতে গেলে, যোগমায়া পাগলিনীর বেশে তাঁহার অনুগমন করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া মাতামহালয় হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। নিরঞ্জনের মাতামহালয়ের বধূগণের তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায়, যোগমায়া স্বীয় সংকল্প-সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই।

কালাপাহাড়ের ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করিয়া যোগমায়ার সহিত দেখা করিবেন। নজিরণ ও তাঁহার সহচরীগণের অনুরোধে কালাপাহাড় যোগমায়ার ভবনে আসিয়াছেন যোগমায়ার সেই পূর্ব্ব পরিচারিকাই আছে। সে কালাপাহাড়কে দেখিয়াই কত কি বলিতেছে। সে আপন মনে আপনি বলিতেছে—"এমন কঠিনও মানুষ থাকেগা! এমন নিঠুরও মানুষ থাকে গা? দয়া নাই,

মায়া নাই, ভদ্রতা নাই, চক্ষু লজ্জাও নাই। ঠাকুরকে ডাকিনীতে পেয়েছে—নিশ্চয় ডাকিনীতে পেয়েছে। তা না হ'লে বামুনের ছেলে, নিজে মস্ত পণ্ডিত লোক, এ সব কিছুই না ভেবে মুসলমান হলেন! এই সোনার চাঁদের মত বৌ, সাক্ষাৎ দেবী, সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা, এর দিকে ফিরেও চাওয়া নাই। যে আপন জাত ইজ্জত খেয়ে দুঃসাহসে ভরকরে কালীমন্দির হ'তে মাথা বাঁচিয়ে আন্‌লে, সে হ'লো পর—আর কোথাকার সেই মুসলমানের মেয়ে তাকে নিয়ে ঘর কন্না কচ্ছেন! শুনেছি সেও নাকি বলে ঠাকুরকে এখানে আস্‌তে—ঠাকুর নামেও এখন কালাপাহাড়, আসলেও কালাপাহাড়; পূর্ব্বের সে দয়া, মায়া, হাঁসিমাখা মুখ, মিষ্টিকথা অপূর্ব্ব রূপ দিব্বি ব্রাহ্মণের শ্রী এখন সে সব কোথায় গিয়েছে।"

পরিচারিকার এইরূপ কথায় যোগমায়া বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন, পরিচারিকাকে বকুনি হ'তে ক্ষান্ত হইতে বলিলে, তাহার বকুনি আরও বাড়িত। সে কত কি বকিতে বকিতে স্থানান্তরে চলিয়াগেল।

কালাপাহাড় আবার বলিতে লাগিলেন—"তোমার হিন্দুগ্রন্থমাত্রও রাখবনা; সমস্ত পোড়াব। হিন্দুর ধর্ম্মও যা, মুসলমানের ধর্ম্মও তাই। হিন্দুতে গরু খেতো, মুসলমানে এখনও গরু খায়। হিন্দুরা গরম দেশ ব'লে গরু খাওয়াটা ছেড়েছে। হিন্দুরা যেরূপ অত্যাচারে অনার্য্যদিগকে তাড়িয়েছে, মুসলমানেরা তত অত্যাচার এখনও কর্‌তে পারেনি। আর দেখ হিন্দুরা যে বড় জাতি হয়েছিল, অনার্য্যেরা তাদের সঙ্গে মিসেছিল বলে। বিজিত জাতি অর্থাৎ দাসের সংখ্যাই হিন্দুর মধ্যে অধিক। মুসলমানেরা ত হিন্দুকে দাস কর্‌তে চান না; ধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হলেই হলো। আমি যত হিন্দুকে মুসলমান করেছি, সকলকেই বড় বড় পদ দিয়েছি। আমা হ'তে তোমার জন্যই হিন্দুর বেশী ক্ষতি

হচ্ছে। তুমি মুসলমান হ'লে, আমি হিন্দুর এত ক্ষতি করতেম কিনা বলতে পারিনা। হিন্দুর আবার একটা ধর্ম্ম। যে জাতি উপনিষদ ছেড়ে, লিঙ্গচিহ্নের পূজা আরম্ভ করেছে, ধর্ম্মগ্রন্থ তন্ত্র করেছে, তাদের আবার একটা ধর্ম্ম। কাশী ছিল লম্পট—তান্ত্রিক গুরু আর তাদের ভ্রষ্টা সেবিকার একটা প্রধান আড্ডা।"

এই কথার পর যোগমায়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"আপনি স্বামী, পরম গুরু। আপনার সকল কথার উত্তর দিবার আমার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মণ হিন্দুর গুরু। সেই ব্রাহ্মণ যদি চণ্ডালাদির জল গ্রহণে পতিত হ'ন, তবে তিনি অস্পৃশ্য হয়েন ও তাঁহার জল গ্রহণ করা যায় না ; কিন্তু তাঁহার প্রণাম পাইবার অধিকার রহিত হয়না। আপনিও সেইরূপ আমার প্রণম্য, কিন্তু অস্পৃশ্য। আমি আপনাকে স্পর্শও করব না এবং আপনার সঙ্গে গিয়েও মুসলমানও হবনা। আমি দূর থেকে আপনার সেবাশুশ্রূষা করতে ও আপনার অনুমতি পালন করতে প্রস্তুত আছি। আমি ধর্ম্মের কিছু বুঝিনা ; কিন্তু আমার যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস আছে, তা আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করব না। স্বামীজি ও ফকির সাহেব বলেছিলেন যে, আপনি ও আমি হিন্দু মুসলমানের একতা সাধন করব। মুসলমানের অত্যাচার কমবে, আর হিন্দুরা মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ছাড়বে, তা হ'লেই হিন্দু মুসলমান এক হ'বে। আপনি সে পথে গেলেন কৈ ? আপনি সুন্দরী নবাব-কন্যা স্ত্রী পেয়েছেন ; আমি রূপ-হীনা, গুণহীনা গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে আমায় ভুলে যাউন। আমার মত কত স্ত্রী, কত বাঁদী এখন আপনার ভ্রূভঙ্গিতে আপনার হ'বে। আমার জাতি মারতে কেন এত চেষ্টা ? যদি আমার প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, তবে আমায় ভুলে যাউন।"

এই কথায় কালাপাহাড় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"মায়া ! তোমার

ভুল্‌ব! যে দিন পাটুলীর বাড়ী ঘর গিয়েছিল, যে দিন পাটুলীর সম্পত্তি গিয়েছিল, যে দিন নিরাশ্রয় হ'য়ে বনে পালিয়েছিলাম, কার মুখ দেখে সে দিন বেঁচেছিলেম মায়া? কার ম্লান মুখ দেখে তাণ্ডায় দরবার করতে এসেছিলাম? কার কথা ভেবে তাণ্ডায় এক বৎসর দরবার করেছি? কার সুখ সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছি? মায়া! তুমি কি কেবল আমার স্ত্রী? তুমি উপকার করিতে আমার বন্ধু, তুমি সহায়তা করিতে আমার ভ্রাতা, পরামর্শ দিতে তুমি আমার মন্ত্রী, আহার দানে তুমি মাতা, সেবা শুশ্রূষায় তুমি পত্নী, শান্তি দিতে তুমি দেবী, প্রফুল্লতা ও সুখ দিতে তুমি ভাঁড় ও কবি। রূপে ধিক্! রূপের মোহে ধিক্! ঘটনাচক্রে উপকারের কৃতজ্ঞতায়—ধর্ম্মের নৈরাশ্যে—আমি নজিরণকে বে করেছি। তোমার সহিত নিরঞ্জন দেবতা; তোমার বিহনে নিরঞ্জন মূর্ত্তিমান নরক। তোমায় আর নজিরণে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তুমি শান্তির নদী, আর নজিরণ শীতল শিশির বিন্দু। তুমি প্রফুল্লতার পুষ্পোদ্যান আর নজিরণ বোঁটাছেঁড়া একটা ফোটা গোলাপ। তুমি সেবা ভক্তির আকর আর সে সেবাভক্তির মরুভূমি। তোমায় ভুলব মায়া? তোমায় ভুলব?"

যোগমায়া আর কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। যোগমায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ঠাকুরদাদার গণনা ঠিক। আমার পোড়া কপাল তাই আমি এমন স্বামীর সংসর্গ হ'তে আমি বঞ্চিত।"

কালাপাহাড়ও আর কথা কহিতে পারিলেন না। জলে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনিও নয়ন জল মুছিতে মুছিতে যোগমায়ার ভবন হইতে বহির্গত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নজিরণের গৃহে।

সত্বর উড়িষ্যায় যাইতে হইবে। নূতন নবাব, নূতন রাজ্য; সম্রাট আকবরের যশ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্রাটের সহিত নবাবের সখ্য থাকিলেও তাঁহার বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় একেবারে দূরীভূত হইতেছে না। দুই দল সৈন্যের প্রয়োজন। একদল নব রাজ্য রক্ষার জন্য নিয়ত তাণ্ডায় অবস্থিতি করিবে ও অপর দল সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যা জয় করিতে যাইবে। বঙ্গেশ্বর সোলেমান প্রতিদিন নূতন নূতন সৈন্য নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করিতেছেন। সেনাপতি কালাপাহাড় নব নিয়োজিত সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যুদ্ধোপকরণও দিবারাত্র সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইতেছে। পিরবক্স ও হোসেন আলি গয়াক্ষেত্রের ধ্বংস করিতে পারেন নাই। বসন্তাদি নানাবিধ সংক্রামক রোগে সৈন্যদল আক্রান্ত হইতে থাকায়, তাঁহারা পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছেন। নানা কারণে সেনাপতির অবসর অতি অল্প। তিনি প্রতিদিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সৈন্যবারিকে অবস্থিতি করেন।

অদ্য সেনাপতি সৈন্যবারিকে যান নাই। তিনি আপন গৃহে আপনার বসিবার প্রকোষ্ঠে নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। আজ নজিরণের গৃহে আমিরণ, ছবিরণ ও জিজিরণ আসিয়াছেন। আমিরণ পুনঃ পুনঃ সেনাপতিকে অন্তঃপুরে যাইবার অনুরোধ জানাইয়া পরিচারিকা পাঠাইতেছেন। সেনাপতি অন্তঃপুরে যাইতেছেন না। তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। বহুক্ষণ পরে তিনি আপনমনে আপনি বলিতে লাগিলেন—"কি ছিলেম, কি হলেম! কি করিতে আশা করেছিলেম, কি কর্‌ছি। স্বদেশ স্বজাতির উপকার কর্‌ব আশা করেছিলেম, এখন স্বদেশ স্বজাতির লোপ কর্‌তে চল্লেম। আমি ভুল বুঝেছি, কি ঠিক বুঝেছি, বলিতে পারি না। যোগমায়া কোন সময়ে আমাকে বলেছিল কাশীর এক বিশ্বেশ্বর গেলে শত বিশ্বেশ্বর হবে, এক অন্নপূর্ণার স্থলে শত অন্নপূর্ণা হবে, হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ আবার জেগে উঠবে, আমার অত্যাচারে তাদের গোড়ামি আরও বাড়্‌বে, হিন্দু মুসলমানের মিলন দূরে থাকুক, উভয়ের মধ্যে আরও বিচ্ছেদের আগুন বড় হয়ে জ্বল্‌বে—অন্তঃপুর মহিলার এসিদ্ধান্ত কি ঠিক? যোগমায়ার এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। সে যা মনে ভাবে, তাই বলে। কতকাল হিন্দু মুসলমানের অত্যাচার সইবে? চাই দেশে শক্তি গঠন। হিন্দুনাম বিলুপ্ত হয়ে—সকল হিন্দু মুসলমান হয়ে—দেশে যদি একটা মহা শক্তি হয় তবে ক্ষতি কি? ধর্ম্ম আমি মানি না। কোন ধর্ম্মই ঠিক নয়। কোরাণ মহম্মদের কল্পনা; আর হিন্দু শাস্ত্র ব্রাহ্মণ মুনি ঋষিদের কল্পনা ও যুক্তি তর্ক। প্রাকৃতিক নিয়মাত্মক শক্তির নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর থাক্‌লেও নিষ্ক্রিয়। ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে তিনি পৌষ মাসকে বৈশাখ মাস করেন। আমি যা কর্‌ছি তা ভালই কর্‌ছি। এতেই

মায়াকে পাব, দেশেরও উপকার করব। পুরী গেলেই হিন্দুর বড় তীর্থ গেল। যা হউক এই নিকটের বদ্বীপটার দফা রফা করে আসতে হচ্ছে।” সেনাপতি অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

নূতন বঙ্গেশ্বর। বঙ্গেশ্বরের, নূতন সেনাপতি কালাপাহাড়। কি সাহসে আমরা কালাপাহাড়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব—কি সাহসে বঙ্গত্রাস সেনাপতির অন্দরে ললনাকুলের মধ্যে প্রবেশ করিব? পাঠক! আপনি চন্দ্রশেখরে মিরকাসিমের অন্তঃপুর দেখিয়াছেন। আপনি রাজসিংহ পাঠে কল্পনায় মোগল সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। এস্থানে কালাপাহাড়ের অন্তঃপুরের অবস্থা না লিখিয়া উল্লিখিত গ্রন্থ বরাত দিলে কি চলে না? বরাতে চলিলেই বড় ভাল হইত। পর-পদাঙ্কে পদ রাখিয়া গমন করা অপেক্ষা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা কি ভাল? পক্ষান্তরে রূপ ও ঐশ্বর্য্য বর্ণনে এবং নায়ক নায়িকার নামের গুণে বঙ্গে গ্রন্থের আদর। আসামিগণ যদি সকল বাঙ্গালা কথা রূপান্তরিত করিয়া পৃথক ভাষা করিতে পারেন এবং উড়িয়াগণও যদি ঐরূপ উড়িয়াকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারেন এবং তদ্দেশবাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ ভাষাস্বাতন্ত্র সমর্থন করেন, তবে আমি চন্দ্রশেখর ঠিক নকল করিলেও আমি কত পাঠক পাইব। তাঁহারা আমার কালাপাহাড়ের অন্তঃপুর বর্ণন এক পৃথক নূতন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের ভাব ও কথা বেমালুম চুরি করিতে পারিলেই হতভাগ্য বঙ্গের গ্রন্থকারগণের সমধিক আদর হইয়া থাকে। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর-পদাঙ্কে গমন না করিয়া নূতন ভাবে নূতন গ্রন্থ রচনা করায় তিনি জীবিত থাকিতে খ্যাতি বা অর্থ কিছুই পান নাই।

স্বধর্ম্মচ্যুত নব সেনাপতি কালাপাহাড়ের অন্তঃপুর অতি রমণীয়। বিলাসপ্রিয়া গর্ব্বপূর্ণা নজিরণের বাসভবন অতিবিচিত্র ও মূল্যবান।

চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত অট্টালিকা। হর্ম্ম্যাবলী আবার শ্বেত, পীত, নীল, কৃষ্ণ নানা বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরে অতি সুশোভিত। অট্টালিকা গুলির কোনটি দ্বিতল ও কোনটি ত্রিতল। হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যস্থলে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে নানাদেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবর্ণের পুষ্পতরু ও পুষ্পলতার উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে সুন্দর সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত বারি-বিধৌত বর্ত্ম ও মঞ্চ। নানা লতা কুঞ্জ; বহুসংখ্যক পুষ্পবাটিকা। প্রত্যেক লতাকুঞ্জে রজত বা সুবর্ণ নির্ম্মিত হীরকাদি খচিত সুশ্রী, সুস্বর সুন্দর বিহঙ্গ। অট্টালিকা গুলির গায়ে গায়ে সুন্দর সুন্দর লতা ও অট্টালিকার সোপানা-বলীর দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ স্ফটিক নির্ম্মিত পাত্রে সুন্দর সুন্দর পত্র পল্লব সমন্বিত পুষ্পতরু। প্রত্যেক গৃহের ছাদে কত কারুকার্য্য, কত শিল্প কার্য্য ও কত মহার্ঘ রত্ন। প্রত্যেক অট্টালিকার কোন স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি কোথাও কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি, কোথাও দারুময় ও মৃন্ময় পুত্ত-লিকা! কোন প্রতিমূর্ত্তির হাতে যষ্টি, কোন ছবির হাতে অসি, কোন নায়িকার হস্তে ফুটন্ত গোলাপ ও কোন প্রতিমূর্ত্তির করে রত্নাদি খচিত ঝালর যুক্ত সুবর্ণময় ঝাড়। সকল হর্ম্ম্যতলে সুকোমল মকমল বস্ত্র মনোজ্ঞ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে ও তদুপরি গৃহাদির উপযুক্ত উপকরণ। সমস্ত বঙ্গে যাহা জন্মে, সমস্ত ভারতের গুণী শিল্পী যাহা প্রস্তুত করিতে জানে, সমস্ত সভ্যদেশের বণিকগণ যাহা উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে বিক্রয়ার্থ লইয়া বেড়ায়, নজিরণের গৃহ তৎসমুদায়ের প্রদর্শন ক্ষেত্র। যাহা জগতে নাই, তাহাই নজিরণের গৃহে নাই, যাহা জগতে আছে, তাহাই নজিরণের গৃহে আছে। তাহার উপর সজ্জার পারিপাট্য, সংস্থাপনের সুরুচি, বিলাস প্রিয়তার শ্রেষ্ঠত্ব, সুরুচির গুরুত্ব, নূতনের নূতনত্ব এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, নজিরণের গৃহে তাহা সংসাধিত হইয়াছে।

এই ভবনের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে সেনাপতি কালাপাহাড় আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই গৃহের মধ্যস্থলে এক বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মঞ্চে রত্নাদি খচিত সুবর্ণ পাত্রে সৌন্দর্য্য-সুগন্ধ-পূর্ণ পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহে গোলাপ জল সিঞ্চিত হইয়াছে। গৃহ-মধ্যস্থিত দ্রব্য সকল হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে। কে বলে নুরজাঁহান গোপাল জল ও গোলাপী আতর নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন? নুরজাঁহান কেবল মাত্র ঐ সকল দ্রব্য প্রণয়নের নূতন পথ দেখাইয়াছেন মাত্র। কালাপাহাড় গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ নির্জ্জন দেখিলেন। তিনি একটু বড় করিয়া বলিলেন—"এত কড়া তলব, ঘরেত কাহাকেও দেখিনা?"

আমিরণ গম্ভীরভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সের ও নুর মরেছে।"

অন্যদিক দিয়া ছবিরণ ও জিজিরণ সেই গৃহে আসিয়া বলিলেন—"ছবিরণ ও জিজিরণও মরেছে।"

নজিরণও গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমিও মরিয়াছি।"

কালাপাহাড় তখন হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমি তবে ভূত। আজ এ কি অভিনয়? আজ কি তবে এখানে ভূত পেত্নীর খেলা হবে? সের আর নুর বরেন্দ্র যুদ্ধের খুরেও দুইটা লোককে প্রাণে মেরে ভূত করে রেখে তবে মরেছে।"

আমিরণ। আপনি ভূত বইকি। তা না হলে এ সব হবে কেন?

ছবিরণ। তা বোন ঠিক।

জিজিরণ। তা দিদি সত্যি সত্যি।

নজিরণ। তা ভাই তোরা যা বলিস তা বল। আমি মরারচেয়েও বাড়া হয়েছি। নিরত যুদ্ধ, গ্রামের পর গ্রাম পোড়ান, মন্দির ভাঙ্গা, দেবতা

ভাঙ্গা, হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা এতে কি আর ভয়ে মর্‌তে হয়না? যুদ্ধ কি কেহ সহজে করে গা?

আমিরণ। সেনাপতি সাহেব! আপনি হলেন কি? আপনি যে দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌লেন।

জিজিরণ। দিদি! আমি ত সেনাপতি সাহেবের কাজ শুনে আর ভয়ে বাঁচি না।

ছবিরণ। তা বোন সকল! এত বাজে কথায় কাজ কি? আমরা যা বলতে এসেছি সেনাপতি সাহেবের হাতে পায়ে ধরে তাই বলি।

নজিরণ। এরা যা বল্‌তে এসেছে তাত বুঝেছ? চাচার নূতন রাজ্য। তুমি নূতন সেনাপতি।

নজিরণের কথায় বাধা দিয়া সেনাপতি বলিতে লাগিলেন—"তা বুঝ্‌বনা কেন? সব বুঝেছি। বসন্ত কাল এসেছে। কোকিল পঞ্চমে ডাক্‌ছে। বসন্ত কুসুম সকল ফুটে উঠেছে। মলয়পবন গন্ধ ছড়াচ্ছে। এখন সেনানায়ক গুলিকে লয়ে যদি আমি উড়িষ্যায় যাই, তা হলে ঘর্‌ দ্বার বিছানা ত কাঁদ্‌বেই—তার সঙ্গে সঙ্গে—

আমিরণ। ও কথায় আজ ছাড়্‌বনা। আমাদের ত লজ্জা আপনার কাছে নাই— আজ আবদারেরও একশেষ কর্‌ব।

কাপা। কিসের আবদার?

আমি। আজ ঠাট্টাতামাসায় ছাড়্‌ব না। নজিরণ কেঁদে কেটে হাতে পায় ধরে কিছুই কর্‌তে পার্‌লে না। আজ আমাদের পালা। আপনি আগে হিন্দু ছিলেন। হিন্দু হয়ে হিন্দুর প্রতি কি এত অত্যাচার করা উচিত? গ্রামের পর গ্রাম পোড়াচ্ছেন। হিন্দুর ঠাকুর ত আর রাখ্‌লেন না। পুঁথি পাঁজিও রাশি রাশি পোড়াচ্ছেন। শুনেছি এদেশে ছয় সাত কোটি হিন্দুর বাস। মুসলমানের সংখ্যা ৩০ লক্ষও

হবে না। হিন্দুরা যদি যোট ক'রে বলে আমাদের কাট, তা হলেও ত আমরা পেরে উঠিনা। জ্ঞানানন্দস্বামী ও ফকিরসাহেব বলেছিলেন আপনাকে ও নজিরণকে দিয়ে হিন্দু মুসলমান এক করবেন। তাতো হলো ছাই। এখন আপনি যা কচ্ছেন তাতে ভয়ে কেঁপে ও কেঁদে মরছি।

জিজি। আপনি আর পোড়ান ঝোড়ান করবেন না। সেনাপতি সাহেব আপনার পায়ে পড়ি।

ছবি। দোহাই সেনাপতি সাহেব! আপনি আর ঠাকুর গুঁড়ো করবেন না ও পুঁথি পাঁজি পোড়াবেন না। বাঙ্গালা বেহারের লোক আপনার নামে এখন কাঁপে, কালাপাহাড় পূর্ব্বে ছিল আপনার উপাধি—গুণের কথা, আর এখন হয়েছে কালাপাহাড় গালি।

কাপা। সের আলি ও নুর আলি সেনাপতির শরীর-রক্ষক। তারা কত যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্ময়কর কার্য্য করেছে। তাদের ত ভয়ের কথাই নাই। ছবিরণ আর জিজিরণ ভয় কর কেন? তোমরা মেয়ে মানুষ, আমার এ কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝ্‌বে না। দেশে একটা বড় শক্তির প্রয়োজন। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম থাকতে তা হবে না। সব হিন্দু মুসলমান করে ফেল্‌তে হবে।

নজি। তাও কি কখন হয়? অত্যাচারে কি কখন হিন্দু মুসলমান হবে? প্রেমের বন্ধন, ভক্তির বন্ধন অতি দৃঢ়। অত্যাচারে কোন বন্ধনই হ'তে পারে না। যারা ক্ষুদ্রমতি নীচাশয় ধর্ম্মহীন লোক, তারা অত্যাচারে ভীত হয়ে মুসলমান হ'তে পারে, কিন্তু ভাল লোকে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেও মুসলমান হবে না। তাদের স্বদেশ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য জিদ্ বাড়বে বই কমবে না। চাচার নবাবীপদ হয় মোগলে, নয় হিন্দুতে কেড়ে নেবে, আর তোমাকে হিন্দুরা ধর্‌তে পার্‌লে হয়ত জিয়ন্ত অবস্থায় পুতে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

কাপা। হিন্দু আমার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

নফি। অন্যায় যুদ্ধে কাশী নষ্ট করেছ। ডাকাতের মত পড়ে গ্রাম, ঠাকুর, পুঁথি পোড়াচ্ছ। হিন্দু শিষ্ট শান্ত জাতি, তারা সহজে ক্ষেপেনা। তারা অপরিণামদর্শীর মত কাজ করেনা। সকল ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছেই আছে। তোমার অত্যাচার যখন সকল বাঙ্গালায় প্রসারিত হ'বে, যখন সকল হিন্দুর মনে ব্যথা লাগ্‌বে, তখন এই শিষ্ট শান্ত অস্ত্রহীন হিন্দুর মধ্য হ'তে এমন লোক জন হবে, এমন একটা শক্তির আবির্ভাব হ'বে যে, এই ক্ষুদ্র মুসলমান-শক্তি তাদের ফুৎকারে উড়ে যাবে। আমি দেখ্‌ছি, তুমি হিন্দুর প্রতি যত অত্যাচার কর্‌ছ, হিন্দুর উন্নতির পথ, হিন্দুর স্বাধীনতার পথ, হিন্দুর মিলনের পথ ততই পরিষ্কৃত হচ্ছে। বহুদিনের পরাধীনতায়, বহুদিনের অত্যাচার উৎপীড়নে হিন্দুর মিলনের শক্তি নষ্ট হয়েছে, তাইব'লে তারা মানব প্রকৃতি-সুলভ দোষ গুণ হারায় নাই। ক্রোধাদি রিপুর হাত হ'তে এড়ায় নাই। ঘোর অত্যাচারে যখন সকল হিন্দুর এক লক্ষ্য হবে, তখন ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়ে মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্য সকল হিন্দু মিল্‌বে। তখন অস্ত্র শস্ত্রের অভাব হবেনা এবং সেনাপতি ও সেনানায়কের অভাব থাক্‌বেনা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল আপনা আপনি এসে পড়্‌বে।

কাপা। আমি তোমার মত ন্যুনা গুল্মলতাপূর্ণ বন দেখে বাঘের ভয় করিনা কারণ বনে বাঘ নাই। আমি মেরে কেটে পুড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে হিন্দুকে মুস [illegible] সঙ্গে মিশিয়ে দিব।

এইরূপপ্রকার [illegible] ও বামাদলের মধ্যে অনেক কথা হইল। বামাদলের অনুনয়, অপে[illegible] শ্রুজল, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি কিছুতেই সেনাপতির কঠিন হৃদয়াছেন [illegible] হইল না। সেনাপতি তাঁহাদিগের বিশেষ পীড়া-

পীড়িতে অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি হিন্দুর প্রতি আর দুইটিমাত্র অত্যাচারের কার্য্য করিবেন। তিনি নবদ্বীপ দগ্ধ করিবেন ও উড়িষ্যা জয় করিবেন। এই দুই অত্যাচারের পরেও যদি তাঁহার হিন্দু স্ত্রী মুসলমান না হন, তবে তিনি সেনাপতিত্ব ছাড়িয়া সস্ত্রীক মক্কায় যাইবেন।

এই রমণীমণ্ডলে কালাপাহাড়ের শিশু পুত্রও বামাদলের পক্ষ সমর্থন করিল। এই স্থলে বলা উচিত যে এই সময়ে কালাপাহাড়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রটির বয়স পাঁচ বা ছয় বৎসর হইয়াছিল। যখন আমিরণ বলিলেন—"আর গ্রাম পোড়াইবেন না।" শিশু-পুত্রও আমিরণের সহিত মিশিয়া বলিল—"বাবা তুমি মাছির কথা ছোন আগুন—ও বাবা আগুন নিয়ে খেলা করা ভাল নয়।" ছবিরণ বলিলেন—"এত অত্যাচার ভাল নয়।" বালকপুত্র বলিল—"মাছি ভাল, অতি আচার করনা।" জিজিরণ বলিল—"সকলে যাতে ভাল বলে সেনাপতি সাহেব তাই করুন।" শিশু কহিল—"জিজি মাছি খুব ভাল। আমায় মেই দুধ খেতে দেয়। সে যা বলে তাই কর।"

নিষ্ঠুর কালাপাহাড়ের হৃদয়ও অপত্যস্নেহ-শূন্য নহে। তিনি নজিরণের গর্ভজাত শিশুপুত্রটির মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"এ জগতে আমার পক্ষ সমর্থন কর্‌তে কি কেহ নাই? বাবা মামুদ তুইও আমার বিপক্ষদলের মত সমর্থন করিস?"

শিশু, পিতার কাতরকণ্ঠের স্বর শুনিয়া সাদরে বলিল—"বাবা! আমি তোমায় খুব ভালবাছি। তুমি যা বল্‌বে তাই শুনব। রাক্ষা নয়।

স্ম

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-*-

নবদ্বীপে।

এই সে আম্রবাগান, এই সে চতুষ্পাঠী। ঐ সে অধ্যাপক মহাশয়ের বাটী। ঐ সে গঙ্গার ঘাট। ঐ সে বেড়াইবার ও খেলিবার মাঠ। কি মধুময় স্মৃতি! এই আম্রবাগানে কত খেলা খেলেছি। ঐ গঙ্গার ঘাটে কত আমোদ আহ্লাদে স্নান করেছি ও সাঁতার দিয়েছি। অধ্যাপক মহাশয়ের বাটী, দ্বিতীয় স্বর্গ। অধ্যাপক মহাশয়ের কি সরলতা! কি উদারতা! কি বাৎসল্য! কি ক্ষমা! কি উপদেশ দান! কি দৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস! কি চমৎকার শিক্ষাপ্রণালী! অধ্যাপক মহাশয় পিতার ন্যায় বাৎসল্য করেন। মুনি ঋষির ন্যায় শিক্ষা দিয়ে, বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়ে, আমাকে এই নবদ্বীপের গৌরব কর্‌বেন আশা করেছিলেন। আমার দ্বারা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম রক্ষা কর্‌বেন ইচ্ছা করেছিলেন। আর সে অধ্যাপক-পত্নী, যাঁহার বাৎসল্য অকূল অতলস্পর্শ। যিনি মাতা অপেক্ষাও স্নেহময়ী দেবীরূপে আহার দান করেছেন, পীড়ায় শুশ্রূষা করেছেন ও সহস্র আবদার পালন করেছেন। তাঁহার গুণের

এক কণাও জীবনে শোধ করা অসম্ভব। আর বেশী সময় ছদ্মবেশে এই প্রিয়তম স্থানে, এই অপূর্ব্ব স্বর্গে বেড়ান হচ্ছেনা। বেলা দুই প্রহর, বাতাসও বেশ বচ্ছে। সৈনিকদিগকে কড়া হুকুম দিলেই মানে না, তারপরে নিষেধ করে আসি নাই। এ রমণীয় স্বর্গ পোড়ান হবেনা। এই সময়ে পোড়ান ও লুট বিষয়ে বিশেষ সতর্ক কর্‌তে হবে। কালাপাহাড় এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে চীৎকার উঠিল— "আগুন, আগুন, সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ।"

কালাপাহাড় অদ্য প্রত্যুষে নবদ্বীপে আসিয়া নবদ্বীপের অদূরস্থ ময়দান মধ্যে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রকাশিত হওয়ায় অনেকে ধনসম্পত্তি ও গ্রন্থাদি লইয়া—পলায়ন করিয়াছেন। সৈনিকগণ কালাপাহাড়ের বিনা অনুমতিতেই নবদ্বীপে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। দেব হুতাশন লোল রসনা বিস্তারপূর্ব্বক নবদ্বীপ গ্রাস করিতে বসিয়াছেন—অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধ গগনে উঠিয়াছে ও ধূমপুঞ্জ নবদ্বীপ অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। কালাপাহাড় অনন্যোপায় হইয়া সেই আম্রকাননে উচ্চ বংশীধ্বনি করিলেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনিতে প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, প্রাণপণ যত্নে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। সৈনিকগণ অগ্নি নির্ব্বাণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কালাপাহাড়ের অধ্যাপক হরদেব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আগুন দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আম্র তরুমূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি উচ্চ রবে বলিতেছেন—"আমি কিছু বের কর্‌বনা, কিছু বের কর্‌ব না। যথাসর্ব্বস্ব যাউক, যথা সর্ব্বস্ব যাউক। পুঁথি পাঁজি আগে যাউক। মা জগদম্বাকে হারিয়েছি, চারি বৎসর। মেয়ের অনুসন্ধানে ন্যায়রত্নও নিরুদ্দেশ ছয় মাস। নিয়ে কি এমন ডাকাত

হ'লো। আমার বাড়ী পোড়াল। নবদ্বীপ পোড়াল! এমন লক্ষ্মী ছেলে, এমন চাঁদ ছেলে ডাকিনীটাকে বে ক'রে এমন বাঁদর হয়েছে। নচ্ছারকে পেতেম ত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে দিতেম। পোড়া-মুখোর জন্য এখনও কেঁদে মরি, এখনও তার কল্যাণ ও সুমতির জন্য একটা ক'রে শিব পূজা করি। আঁটকুড়ো নবদ্বীপে এসেও আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না?"

ন্যায়রত্নপত্নী এইরূপ কত কি বলিতেছেন, এমন সময়ে হরনাথ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের পত্নী পাগলিনীর প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিলেন —"মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আগুন, আগুন, সকল ঘরে আগুন। তা ঘর দরজা গোল্লাই যাউক, আমি বড় খোকা আর খুঁকীকে নিয়ে বেরিয়েছি। ছোট খোকা ঘুমিয়েছিল তাকে নিয়ে বেরুতে পারিনি। সে ঘুমিয়ে আছে। মা! তুমি এদের নেও। আমি ছোট খোকাকে বের কর্‌তে পারি ত বাঁচ্‌ব, না হয় আগুনে পুড়ে মর্‌ব।"

শেষোক্ত রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে কালাপাহাড় আম্র কাননের মধ্য হইতে একটি পুরু চর্ম্মের পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া লম্ফ প্রদানে যুবতীর নিকটে আসিলেন। কালাপাহাড় বলিলেন—"তোমার ছেলে কোন ঘরে? বল, আমি আনিতেছি।"

যুবতী। বড় ঘরে, উত্তরের ঘরে—বাড়ীর মধ্যের উত্তরের ঘরে।

এই কথা শ্রবণ মাত্র কালাপাহাড় নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন। জ্বলন্ত অগ্নি শিখার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সেই শিশু পুত্র-টিকে চর্ম্ম পরিচ্ছদে ঢাকিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তাহার মাতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। কালাপাহাড়ের চর্ম্ম পরিচ্ছদে, অগ্নি লাগিয়াছিল ও উষ্ণ হইয়াছিল। তিনি চর্ম্ম পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড়ের সৈনিকদল যেমন আগুন লাগাইতে পারিত, সেইরূপ আগুন নিবাইতেও

পারিত। তাহাদিগের সঙ্গে পটাগুপ সকল রক্ষা করিবার জন্য জল ছড়াইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণের যন্ত্রাদি ছিল। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে জল ছড়াইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। বিদ্যাভূষণের বাড়ীর অল্পাংশ পুড়িয়াই আগুন নিবিল। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আগুন আসিতেই পারিল না। নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননীর (পোড়া মা) বাড়ী ও মূর্ত্তি কিছু পুড়িতে পুড়িতে আগুন নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্নী কালাপাহাড়কে গালি দেওয়া হইতে বিরত হন নাই। তিনি বলিতেছিলেন—"নিরে, পোড়ামুখো নিরে এমন নিষ্ঠুর? এমন নির্ম্মম। এই সোনার নবদ্বীপ কি ক'রে পোড়ালে? যে পুঁথি দেখ্‌লে প্রণাম কর্‌ত, নবদ্বীপকে স্বর্গ বল্‌ত, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে মুনি ঋষি বল্‌ত, সেই আজ নবদ্বীপ পোড়ালে! যে আমাকে মা'র চেয়ে অধিক ভক্তি কর্‌ত, আমায় কত আশাভরসা দিত, সেই দেব দ্বিজে ভক্তিমস্ত শুদ্ধ শান্ত দেবতা আজ ডাকিনীর মায়ায় কি হয়েছে!"

কালাপাহাড়ের শ্মশ্রু ছিল না। তিনি পরচুলার দাড়ী লাগাইয়া মুসলমান সাজিতেন। অগ্নিমধ্যেযাওয়ায় তাঁহার সেই পরচুলার দাড়ীও অর্দ্ধদগ্ধ হওয়ায় তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি গুরুপত্নীর আক্ষেপ ও তিরস্কার-বাক্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

গুরুপত্নী অস্থির ভাবে এই সকল কথা বলিতেছিলেন। তিনি স্থির-ভাবে প্রণত ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"য়্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ তুই নিরু? বাবা নিরু! তুই এমন হয়েছিস! দেবতাও রাক্ষস হ'তে পারে রে বাবা! আমি জগ-দম্বাকে চারি বৎসর হারিয়েছি। ন্যায়রত্নও ছয়মাস হলো কোথায়

চলে গিয়েছেন।” এই বলিয়া অধ্যাপক-দয়িতা দরবিগলিতধারে অশ্রু-বর্ষণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন।

সিংহ কি আজ যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে! কালাপাহাড়ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া মাতৃচরণ ধারণ-পূর্ব্বক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার কথা কহিবার সাধ্য নাই। তাঁহার দরবিগলিতধারে প্রবাহিত অশ্রুধারার বিরাম নাই। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী ধীরে ধীরে নিকটে আসিলেন। তিনি অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“তুমি আমাদের সেই নিরু ঠাকুরপো? ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র ও আমার স্বামীর সতীর্থ? এখন বুঝি তুমি কালাপাহাড়? বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি? তুমি কাশী জয় করেছ, গ্রামের পর গ্রাম পোড়াচ্ছ, রাশি রাশি শাস্ত্র পোড়াচ্ছ ও নবাবের ভাইঝীকে বে করেছ। বলি, আমাদের কথা কি মনে আছে? তোমার মত দানব, তোমার মত রাক্ষস এদেশে আর জন্মায় নি। তোমার ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, সব সেই ডাকিনী মাগীর শ্রীপাদ-পদ্মে দিয়ে সোণার বাঙ্গালা রসাতলে দিতে বসেছ। তুমি যদি আমার খোকাকে না বাঁচাতে, তবে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না। আজ ঝাঁটা দিয়ে বেশ করে ঝেড়ে দিতেম। তোমরা না বার জন ছাত্রে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে? আমার স্বামী, কাশীর যুদ্ধে সন্ন্যাসীর চিমটা হতে তোমায় বাঁচালেন। তাঁকে তুমি তাণ্ডায় লয়ে বন্দী করে রেখেছ। তাঁকে বন্দী করে রেখেছ, কিন্তু তোমার ঠাকুর সেবা, অতিথি সেবা, আদায় পত্র সমান ভাবেই হচ্ছে। শুনেছি তিনি তোমাকে কত সংবাদ দিয়েছেন, তুমি একবার দেখাও কর না। সেই কালনাগিনী নাগমন্ত্রে বেঁধে তোমায় জর জর করেছে। সেই বজ্জাত চখে মুখে কথা বলে। সে নাকি কথার বলে সভার পরীক্ষায় উতরে গেল। তার চাচাকে কত কটু কাটব্য বল্লে। শুনেছি তার

কথায় আর হাব ভাবে সকল লোকে ধন্য ধন্যি কর্তে লাগিল। তুমি তার হাতে পড়েছ। নৈলে তেমন দেবতা কি এমন রাক্ষস হয়? বামণের ছেলে কি দস্যু হ'য়ে উঠে। ডাকিনী একেবারে খেয়েছে—ঠাকুর পোকে একেবারে খেয়েছে।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন—"বৌ ঠাকুরাণ! খুব গালি দাও—গালিতে এ রাক্ষসের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

ন্যায়রত্নের পত্নী বলিলেন—"বৌমা! আর গালি দিওনা, নিরু ছেলে-মানুষ, বুঝতে পারে নি, তাই এসব করেছে।"

এই বলিয়া অধ্যাপক গৃহিণী কালাপাহাড়ের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

কালাপাহাড় তাঁহার গুরুপত্নী ও হরনাথের স্ত্রীর সহিত অনেক কথা কহিলেন। অনেক দিনের পর—মাতাপুত্রে ও প্রবীনা ভ্রাতৃবধূ ও দেবরে যেরূপ কথা হয় সেই রূপ কথা হইল। কালাপাহাড় কথায় সকল সময়েই কাঁদিলেন ও নিজে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন, এরূপ ভাব জানাইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কালাপাহাড় সেদিনের মত বিদায় লইয়া আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। নবদ্বীপ দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে জনশ্রুতি উঠিল, কালাপাহাড় যাহার যে অপচয় করিয়াছেন তাহা পূরণ করিবেন। সত্য সত্যই সেই দিন সন্ধ্যাকালে, বসন শয্যা, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, আহারীয় দ্রব্যাদি নবদ্বীপে বিতরিত হইতে লাগিল। তাণ্ডায় ঘোড়ার ডাকে পত্র প্রেরিত হইল যে, তাণ্ডার বন্দি-গৃহে কাশী হইতে আনীত যত বন্দী আছে, তাহাদিগকে নবদ্বীপে প্রেরণ করা আবশ্যক ও তৎসঙ্গে কয়েক লক্ষ মুদ্রারও প্রয়োজন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী-তীরে।

যে দিন মধ্যাহ্নকালে নবদ্বীপ দগ্ধ করা হয়, সেই দিন সন্ধ্যা অতীত হইবার পর,—ধরণী তিমিরবসনাবগুণ্ঠিতা হইবার পর—ঝর ঝর শব্দে বসন্তানিল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইবার পর বসন্ত-সান্ধ্য-কুসুম-নিচয় বিকসিত হইয়া দুলিতে ও গন্ধ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিবার পর, দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা মৃদঙ্গাদির বাদ্যের সহিত ধূপ গুগ্‌গুলের সুরভি গন্ধ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আরতি হইবার পর, বিহঙ্গগণের কূজন করিতে করিতে কুলায়ে যাইবার পর, গোপালগণের গোদল লইয়া গৃহস্থের গোগৃহে সযত্নে রাখিবার পর, যুবতীর নৈশ বেশবিন্যাস ও অপরাহ্নিক জলাবগাহন ও গাত্র মার্জ্জনাদির আড়ম্বর পূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডা সমন্বিত বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইবার পর, সেনাপতি কালাপাহাড় একাকী ভাগীরথীতীরে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও আপনমনে আপনি বলিতেছেন :—"আমি কাজ কিছুতেই ভাল করিতেছি না। নবদ্বীপের উপর আমার

যে মায়া, অপর সাধারণ লোকের স্ব স্ব জন্মভূমির উপর তদপেক্ষা অধিক মমতা। এই দৈত্যের মত বাঙ্গালা পুড়িয়ে, শাস্ত্র পুড়িয়ে দেবদেবী ভেঙ্গে যদি উদ্দেশ্য সফল হ'তো, তা হ'লে ক্ষতি ছিলনা। বিষে-বিষে নির্ব্বিষ হ'ত। একপোয়া দুধে একছটাক জল খাওয়ান যায়, এক বেগবতী নদীতে পাঁচ কলসী দুধ ঢেলে ফেল্লেও দুধের চিহ্ন থাকেনা। হিন্দু জনসংখ্যা বেগবতী নদী, আর মুসলমানের সংখ্যা কয়েক কলসী দুধ মাত্র। এত হিন্দু মুসলমানে কি করে মিশ খাওয়াব? যা হউক আমার ত দুইরকম উদ্দেশ্যই আছে। হয় ঘোর অত্যাচারে হিন্দু উত্তেজিত হয়ে মুসলমানকে গ্রাস ক'রে ফেলুক অথবা সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যাক। আমার ইচ্ছা নয় যে দেশে উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, অত্যাচারী ও অত্যা-চরিত দুই সম্প্রদায়ের লোক থাকে। যে কোন রকমে দেশে এক সম্প্রদায়ের লোক ও এক প্রবলা শক্তি সংস্থাপন করা আবশ্যক। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু বুঝিনা। মরা বাঁচা সুখ দুঃখ আমি কিছু বুঝিনা। কোন ক্রমে এই পৃথিবীর খেলাটা খেলে যেতে পারলেই হয়। ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, দয়া, মমতা, নম্রতা, বিনয় এ গুলি সমাজ ও পরিবার বন্ধনের শক্ত দড়ি, আসল এ গুলিতে কিছু নাই। আমরা অভ্যাস বশতঃ ঐ সব গুণের পরিচালনা করে থাকি। অভ্যাসই বল, আর যাই বলি, এ গুলি যে মানবহৃদয় কোমল রাখবার অমোঘ উপায়, তার আর সন্দেহ নাই। যখন মা ঠাকুরাণি ও হরনাথ দাদার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হলেম, তখন মনপ্রাণ কি আনন্দরসে পূর্ণ হ'ল। মা গালাগালি দিলেন, বৌ গালা-গালি দিলেন, তবু সে গুলি যেন আমার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। এই জড়াত্মক সংসারে প্রকৃত স্নেহ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সহিত মিলনেই স্বর্গ। জানিনা, এই নবদ্বীপটা পোড়ায় আমার কেন অভূতপূর্ব্ব কষ্ট হচ্ছে। যা হ'ক সকল খেলাই খেলে দেখতে হয়। যার যে ক্ষতি করেছি, সব পূরণ

করব। আমি এখন মুসলমান, আমার হাতে কেহ দান না লন, হরনাথ দাদার হাতে দিয়ে ক্ষতিপূরণ করব। আজ ফকির সাহেব বা স্বামীজির সঙ্গে দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত। ফকিরসাহেব ও স্বামীজি যে সব কথা বলেন, তাতে মনের বড় শান্তি হয়। তাঁরা আমার দ্বারা যে কাজ কর্‌বেন আশা করেছিলেন, আমি তার বিপরীত কাজ কর্‌ছি। তাঁরা আশা করে ছিলেন, আমি হিন্দু মুসলমানের একতা সাধন করব; কিন্তু আমি তৎ-পরিবর্ত্তে সেই ভগ্ন স্থান প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর করছি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল; মুসলমান শক্তিতরণীর কর্ণধার একজন হিন্দু হ'লে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার কম্‌বে, ক্রমে ক্রমে হিন্দু-বল সমর বিভাগে প্রবেশ করবে, আমি তা অসাধ্য মনে করলেম। এখন আমি ভ্রান্ত কি তাঁরা ভ্রান্ত তাও, একবার বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে বুঝা আবশ্যক।"

কালাপাহাড় আপন মনে আপনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে এক গৈরিক বসনধারী অক্ষমালাধারী শ্বেতশ্মশ্রুল দীর্ঘকায় পুরুষকে দেখিলেন। কালাপাহাড় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

সেই পুরুষ উত্তর করিলেন—"আমি জ্ঞানানন্দ।"

কালাপাহাড় গলার স্বর জানিয়া ও নাম শুনিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন—"প্রভো! অনেক কথা আছে।"

জ্ঞানানন্দ স্বামী উত্তর করিলেন—"এখানে নহে, তোমার শিবিরে চল। নবদ্বীপের দফা রফা করেছ বোধ হয়।"

কালাপাহাড়। নবদ্বীপের আংশিক ক্ষতি হয়েছে সত্য। আপনি এখনি কি নবদ্বীপে আস্‌ছেন?

জ্ঞান। এই আমি নবদ্বীপে আস্‌ছি। এখনও পল্লীমধ্যে প্রবেশ করি নাই।

অনন্তর উভয়ে শিবিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উভয়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিলেন। পরে জ্ঞানানন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"নিরঞ্জন! তোমা হ'তে বড় আশা করেছিলাম। সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে হ'ল। বঙ্গমাতার দুঃখ আর গেল না। হিন্দুর ঘরে ঘরে রোদন আর থাম্‌ল না। এক প্রতাপ! তাঁর সাধ্য কি? তোমায় ঠাকুর গড়্‌ব ব'লে বড় আশা করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে কথা কহিতেও ভয় হয়।"

নিরঞ্জন জ্ঞানানন্দ স্বামীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। কালাপাহাড় তাঁহাকে বিশ্রাম ও পান ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন হিন্দু ভৃত্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে। কিন্তু স্বামী নবদ্বীপ গ্রামের মধ্যে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর কালাপাহাড় ও জ্ঞানানন্দ উভয়ে নবদ্বীপ গ্রামে প্রবেশ করিলেন। কালাপাহাড় সৈনিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোকদিগের দ্বারা অগ্নিনির্ব্বাণের পর অনেক গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হরনাথের দগ্ধ গৃহাদির পরিবর্ত্তে আবার নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। জ্ঞানানন্দ অন্য ব্রাহ্মণ ভবনে আশ্রয় লইলেন। কালাপাহাড় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিলেন। তথায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্নী ও হরনাথের সীমন্তিনীর সহিত অনেক কথা হইল। তিনি হরনাথের পত্নীকে বুঝাইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে পঞ্চম দিনে হরনাথপত্নী তাঁহার স্বামীকে গৃহে পাইবেন। কালাপাহাড়ের কঠিনহৃদয় এই দুই দয়াবতী রমণীর সহিত কথোপকথনে কিছু কোমল ভাব ধারণ করিল। সিংহ যাদুমন্ত্রবলে এই স্থানে যেন মেষের ন্যায় ব্যবহার করিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

বন্দিগণের মুক্তি ।

"কি ঝকমারিই করেছি ভাই, তা আর বল্‌তে পারি না। দিল্লীর সম্রাট-সরকারের কাজ ছেড়ে সেনাপতি হিন্দু ব'লে বাঙ্গালায় এলেম। সেনাপতি মুসলমান হলেন। হিন্দুর গ্রাম পোড়ান, ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়ান আর হিন্দুর দেবদেবী ভাঙ্গা এ আর দেখ্‌তে পারিনে"—সৈনিক রাম সিং এই কথা বলিল। তদুত্তরে বিহারী সিং বলিল—"সেনাপতি শুদ্‌রেছে ভাই শুদ্‌রেছে। নবদ্বীপ সেনাপতির হুকুমে পোড়ে নাই। আজ সব কাশীর বন্দীদের মুক্তি হবে চল দেখ্‌তে যাই। সে দিন সেই বুড়ো মাঠাকুরাণী আর সেই বৌটির সঙ্গে কথা কবার পর সেনাপতি যেন মেষ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানানন্দ স্বামীও অনেক উপদেশ দিচ্ছেন।"

বসন্তকালের প্রাতঃকাল। বালসূর্য্যের রজত-ধবল কিরণ মালায় হাস্যময়ী ধরিত্রী অধিকতর হাস্য করিতেছেন। ফুল হাসিতেছে, পাতা হাসিতেছে, বৃক্ষলতিকা নাচিয়া নাচিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কোকিল শুভ সময়ের অবসর পাইয়া পঞ্চমে গান ধরিয়াছে। অপরাপর

পতত্রিকুলও সঙ্গীত আলাপনের ত্রুটি করিতেছে না। গম্ভীরা শ্যামাঙ্গিনী দূর্ব্বাসুন্দরীর শিশির-নোলক মুক্তা হাঁসির চোটে খুলিয়া পড়িয়াছে—সুন্দরী ঈষৎ অবনতাঙ্গী হইয়া সেই উজ্জল মুক্তার অনুসন্ধান করিতেছেন। বায়স সঙ্গীত-জ্ঞান-বর্জ্জিত ঈর্ষান্বিত অরসিক পুরুষের ন্যায় চেঁচামেচি ও ছুটা ছুটি করিতেছে। পবন প্রভুর মন ভুলানে অকর্ম্মা অথচ কর্ম্মের ভানকারী ভৃত্যের ন্যায়. ফুলে ধাক্কা মারিয়া, বৃক্ষে লাথি দিয়া লতিকার গলা ধরিয়া ধূলা ছড়াইয়া যুবতীর অঞ্চল টানিয়া ও যুবকের কোঁচা উড়াইয়া দিয়া কত কার্য্য দেখাইতেছেন। এই সময়ে সেনাপতি কালাপাহাড় বিশাল পঠমণ্ডপে দরবারে বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ স্বামী। সম্মুখে এক একটি করিয়া কাশীযুদ্ধে যে সকল হিন্দু বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আনীত হইতেছেন।

সেনাপতি তাঁহাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। জ্ঞানানন্দ প্রত্যেককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার দান গ্রহণে পাপ নাই বুঝাইয়া দিয়া, একে একে সকলকে কিছু অর্থ ও বস্ত্র দিয়া বিদায় করিতেছেন। যাঁহারা পীড়িত ও রুগ্ন তাঁহাদিগের গৃহে বা আত্মীয় স্থানে গমনের নিমিত্ত যথাসম্ভব যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন।

পরিশেষে হরনাথ বিদ্যাভূষণ আনীত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র কালাপাহাড় স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার আগমনে দরবার ভঙ্গ হইল। সেনাপতি, জ্ঞানানন্দ ও বিদ্যাভূষণ পটমণ্ডপের এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে যাইবামাত্র সেনাপতি হরনাথের পদতলে পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"দাদা! আমি ক্ষমার পাত্র নহি। আমায় পদাঘাতে খুন কর।

হরনাথ বিদ্যাভূষণ সাদরে তাঁহার বাহুযুগল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে

আলিঙ্গন করিয়া অতি মধুর ভাষায় বলিলেন—"ভাই! তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অতুলনীয় যোদ্ধা ও বলী। তুমি ধর্ম্মবিশ্বাসে যা ভাল বুঝেছ, তাই কর্‌ছ। আমার নিকট তুমি সকল সময়ে ক্ষমার পাত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অপরাধ থাকিলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে তাহা ক্ষমা করা উচিত। আমি তোমার প্রকৃতি জানি, তোমার মন জানি। তোমার যখন যে বিশ্বাস হয়, তুমি তখন তাই কর। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধা বিপত্তি থাক্‌তে পারে না এবং তুমিও তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর না। ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস। যাহাকে এক জনে ধর্ম্ম বল্‌ছে, তাহাই অন্যের নিকটে অধর্ম্ম। ধর্ম্মের পথ বড় পিচ্ছিল, তাহাতে পদস্খলন হওয়াও বিচিত্র নহে।"

কাপা। দাদা! আমার পাপের পরিসীমা নাই। তুমি কাশীর যুদ্ধে আমার জীবনদাতা। তোমাকে আমি কতকাল বন্দী ক'রে রেখেছি। তুমি নাকি বন্দী হওয়ার পরে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলে, তা আমি পাই নাই।

হরনাথ। তুমি আমাকে চিন্‌বে কি করে? আমরা দুইজনে দুই-পক্ষে। আমার মাথায় ও মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। তখন আমার কাশীতে থাকাও সম্ভব নহে। আমার বন্দিদশায় প্রহরিগণ যে আমার কথা তোমায় জানায় নাই, তা আমি বেশ বুঝেছি। তুমি সেনাপতি, আমি সামান্য বন্দী। সামান্য প্রহরীরও তোমার নিকট যাইবার অধিকার ছিল না।

উভয়ে অনেক কথা হইল। যে সকল কথায় কালাপাহাড়ের অনু-তাপের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, সেই সকল কথায় জ্ঞানানন্দও কালা-পাহাড়কে বিশেষ অনুতপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জ্ঞানানন্দের চেষ্টায় বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। অনন্তর হরনাথ

বলিলেন—"ভাই! তুমি মুসলমান হওয়ায় বিস্মিত হই নাই। তুমি মুসলমান-কন্যা বিবাহ করাতেও আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ নহি। একটি কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তুমি তোমার ধর্ম্ম নিয়ে থাক, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্ম নিয়ে থাকুক। হিন্দু ও হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি এত অত্যাচার কেন?"

কাপা। আমি কোন ধর্ম্মই মানিনা। ঈশ্বরের অস্তিত্বেও আমার বিশ্বাস নাই। মানব জাতির সর্ব্বতোমুখ কল্যাণসাধন আমার ইচ্ছা। ভারতবাসী একটি বিশেষ পরাক্রমশালী জাতি হয়, কোন বৈদেশিক জাতি ভারতবাসীর প্রতি কোন অত্যাচার করিতে না পারে, চির শান্তিতে ভারতের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সমরনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির চরম উন্নতি হয়, এই আমার ইচ্ছা। দলাদলি, ধর্ম্ম বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, জেতা বিজেতার ভাব প্রভৃতির অনৈক্যের অবরোধ দেশ হ'তে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হউক। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হ'লে হয় হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করুক, না হয় মুসলমান হিন্দুকে গ্রাস করুক। আমি হিন্দুকে গ্রাস করিতে চাহিতেছি; আমার চেষ্টা ফলবতী হয় হউক। আমার চেষ্টা ফবলতী না হয়, আমার ঘোর অত্যাচারে, আমার দানব প্রকৃতির কার্য্যে, আমার পৈশাচিক ব্যাপারে, হিন্দুর শীতল শোণিত উষ্ণ হউক; হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করুক। আমি ইতিহাসের পত্রে বঙ্গবাসীর স্মৃতিপটে, ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ে যুগযুগান্ত কলঙ্কী পাষণ্ড পিশাচ ব'লে অঙ্কিত হই তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, এখন হিন্দু জাগিলেই আমার আশা সফল হয়। আমি দুইয়ের একচাই——হয় হিন্দু মরুক, না হয় মুসলমান মরুক; একের রক্ত অপরে পান ক'রে এমন এক ভয়ঙ্করী শক্তি এদেশে সংস্থাপিত হউক, যাহার চরণতলে সমগ্র শিক্ষিত ও সভ্য জগৎ প্রণত হয়। অত্যাচার মন্দ কিসে? গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে কার্য্যে

নিয়োগ কর'তে হ'লে তাহাকে বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা অনেক দিতে হয়। দাদা! এই আমার মনের কথা। একথা তোমার নিকটে ভিন্ন কাহার নিকট এরূপ সরল ভাবে আর কখন প্রকাশ করি নাই।

হরনাথ। আচ্ছা ভাই! তোমার এসব কথার উত্তর এখন আমি দিব না। আমি চিন্তা ক'রে দেখি, এখন অনুমতি কর বাড়ী যাই। জানত তোমার বৌ ঠাকুরুণ, সেই উগ্রচণ্ডাদেবী—

কাপা। বৌঠাকুরুণকে কাল সন্ধ্যাকালে ব'লে এসেছি, দাদা কাল প্রাতে বাড়ী আস্‌বেন। বৌ ঠাকুরুণ কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। মুসলমেনে খানা আর ভাল লাগেনা। বৌঠাকুরুণকে ব'লো আজ তোমার বাটীতে আমি খাব। দাদা অনুমতি কিসের? তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাও। এখন তুমি দাদা আমি ভাই—। তোমার অনুমতি আমি পালন কর্‌ব। বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিভাবে যে কাজ করি সে পৃথক।

কালাপাহাড় ও জ্ঞানদানন্দ যখন বুঝিলেন, হরনাথ বাড়ী যাইবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত তখন তাঁহারা তাঁহাকে সত্বর বিদায় দিলেন। যাইবার সময় হরনাথ কালাপাহাড়কে তাঁহার বাটীতে আহারের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং সেনাপতিও তাহাতে সম্মত হইলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথের বাড়ী।

অনেক বাঙ্গালীরই একটি একটি স্ত্রী থাকে—কাহারও একাধিক যে নাই একথা বলিতেছিনা। কাহারও স্ত্রী তাহার ভাগ্যবলে ঈশ্বর দত্ত কি এক অতি দুর্লভ সুখকর বস্তু, অতুলনীয় বস্তু, অদ্বিতীয় বস্তু। কাহারও ভাগ্যে এই স্ত্রী এক জলন্ত অগ্নিকুণ্ড অথবা নিরন্তর দহনশীল তুষানল। হরনাথের স্ত্রীকে এই দুই শ্রেণীর এক শ্রেণী ভুক্ত করিতে হইবে। আর একরূপ মধ্যমশ্রেণীর স্ত্রী আছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ দোষ গুণ কিছুই নাই। হরনাথের স্ত্রী প্রথম দুই শ্রেণীর শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি জীবনে স্বামীকে একটি মিষ্ট কথা বলেন নাই। হরনাথ-সীমন্তিনীর বিশ্বাস স্বামীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিরস্কার ও কটূক্তি বর্ষণ করিলেই বোধ হয় পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। আমি বেশ বলিতে পারি, তিনি জগতের সমস্ত গালি স্বামীর প্রতি বর্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। স্বামীর দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন প্রভৃতি কিছুই তাঁহার বুঝিবার অধিকার নাই। সকল স্ত্রী মুক্ত

কণ্ঠে যখন স্ব স্ব স্বামীর প্রশংসা করিত, তিনি তখন স্বামীর সর্ব্বপ্রকার নিন্দা করিয়াও সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। হরনাথ সর্ব্বদা তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। হরনাথের স্ত্রী লোক ও সমাজ কিছুরই ভয় না করিয়া হরনাথকে মুক্তকণ্ঠে গালি দিতে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কাজ জানিলেও অলসের চূড়ামণি ছিলেন, সন্তানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ থাকিলেও তাঁহার সন্তানগুলি পরে কোলে করিয়া নিয়া বেড়ায়, ইহাই তাঁহার নিয়ত ইচ্ছা। তাঁহার মতে তাঁহার পিতৃকুলের সকলেই দেবতা, তাঁহার স্বামিকুলের সকলেই পিশাচ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—তাঁহার পিতৃদত্তা একটি গাভী ছিল, তাহা তাঁহার স্বামিগৃহে স্থাপিত দশভূজা অপেক্ষাও আদরণীয় ছিল। তাহাকে কেহ রজ্জু বদ্ধ করিতে পারিবেনা। সে স্বাধীন ভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইবে এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। স্বামীর আয় ব্যয়ের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, স্বামীকে সর্ব্বদা বিশেষ অভাবে রাখিতে পারিলে, তিনি আর কখনও কপর্দ্দক দিয়া স্বজনকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। কলহেও তাঁহার বিশেষ একটু দক্ষতা জন্মিয়াছিল। সকল সময়েই তাঁহার কলহ করিবার একটি পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন হইত। নিতান্ত কাহাকেও না পাইলে তিনি তাঁহার সন্তানগণের সহিত কলহ-সমরে প্রবৃত্ত হইতেন! স্বামীর পীড়ার দিনে ও দুঃখের দিনে স্বামীকে বিশেষরূপে জ্বালাতন করিতে পারিতেন। দাস দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার একটা গৌরবের কথা ছিল। দ্বেষ, হিংসা, অভিমানও তাঁহার কম ছিলনা। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জগতের সকল বালকবালিকা মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট; তাঁহার সন্তান গুলি সকল দোষহীন। একেবারেই গুণশূন্য লোক হয় না। হরনাথ-পত্নী তাঁহার অনুগত স্তাবকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নশীলা ছিলেন। তিনি

কাহাকেও আহার দানে কষ্ট দিতেন না। তাঁহার আলস্যে বাধা না দিলে তাঁহার স্বামীর আহারের প্রতিও তাঁহার কখন কখন একটু দৃষ্টি দেখা যাইত। তাঁহার স্বামীটা—তাঁহার ক্রোধের জ্বালা মিটাইবার পাত্রটা—বিদেশে বন্দী অবস্থায় পচিয়া গলিয়া না মরে, এটিও তাঁহার একটি ইচ্ছা ছিল বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বোপরি তাঁহার এক দুর্ব্বলতা ছিল এই যে, তাঁহার কোন গুণের প্রশংসা করিলে, তিনি সেই গুণ দেখাইতে যত্নবতী হইবেন।

হরনাথ বিদ্যাভূষণ যুদ্ধের ক্লেশ ও বন্দি দশার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বহুদিন পরে আজ গৃহে আসিয়াছেন। কন্যাটি বসিবার আসন দিয়াছে, পুত্র ও কন্যা নিকটে আসিয়া বসিয়াছে, এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন ও বলিলেন—"কেমন কাশী যাবে? ভারি যোদ্ধা, বড় বীর! আমিত সেই সময়েই মানা করে ছিলেম, আমার কথা শুনে কে? আমার পরামর্শ লয় কে? আমার পরামর্শ শুন্‌লে এত দুর্গতি কি কপালে হতো? এই যে খালাস হ'লে এ কার অনুগ্রহে জান? আর তোমার যত জন আছে, আর—আমার যত শত্রুকে খেতে পর্‌তে দিচ্ছ, তাহাদের কেহ তোমার কথা একবার মনেও করে নাই। নিরুঠাকুরপোকে আচ্ছা দুইটা কড়া কথা শুনিয়ে দিলেম, সে ভয়ে ভয়ে তোমাকে তাণ্ডা হ'তে এনে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। দেখ আমি বুদ্ধিমতী কি না?"

হরনাথ বড় সঙ্কটে পড়িলেন। কি ভাবে কথা বলিলে গৃহিণী তুষ্ট হইবেন, হরনাথ তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। গৃহিণীর ভাল মন্দ কথা বিচারের বড় সামর্থ্য ছিলনা—তিনি ভাল কথায়ও কখন কখন ক্রোধ করিতেন। নিরঞ্জনকে চারিটা খাওয়াইতে হইবে। গৃহিণীকে তুষ্ট না রাখিলে সে বিষয়ে বিপদ ঘটিবে। স্বজনকে নিন্দা করিলেই

গৃহিণী বড় সন্তুষ্ট হন, তাহাও জানিতেন। গৃহিণী তাঁহার উপর যেরূপ বিরূপ, কলহের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আর সকলের প্রতি সেরূপ বিরূপ হইতেন না। হরনাথ ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন। ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃকন্যা ব'লে ব'লে যে মরি, আজ বুঝ্‌লেম তারা কেহই আমার নয়। তুমি ছাড়া যে আমার কেহ নাই, তা আজ বেশ বুঝ্‌লেম। নিরঞ্জন তোমার কত প্রশংসা কল্লে—সে আরও বল্লে মুসলমানের খানা আর তার ভাল লাগেনা। তার বিশ্বাস তোমার মত পাক কর্‌তে হিন্দুর ঘরে আর কেহ পারে না।

হর-স্ত্রী। আজ যা বুঝ্‌লে কাল আর তা মনে থাক্‌বে না। নিরু ঠাকুরপোকে কি খেতে বলেছ ?

হর। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাকে এখনও খেতে বলা যেতে পারে।

অনন্তর সেই দিনই নিরঞ্জনকে আহার করিতে বলা হইল। নিরঞ্জন হরনাথের পত্নীকে রাঙ্গা বৌ বলিতেন। হরনাথের পত্নী বেশ লম্বা, ক্ষীণাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। রাঙ্গাবৌ বলিলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইতেন। নিরঞ্জন যথাসময়ে হরনাথের বাটীতে আহার করিতে আসিলেন। নিরঞ্জনের সহিত একজন মুসলমান ভৃত্যও আসিয়াছিল। আহার করিতে বসিয়া কত কথাই হইল। হরনাথের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর পো! তোমার নূতন বৌ রাঁধেন কেমন ?"

কালাপাহাড় উত্তর করিলেন—"সে যে বিবি। তারা বাবরচির পাক খায়। তারা কি রাঁধ্‌তে জানে ? রাঙ্গা বৌ! তুমি স্বয়ং অন্নপূর্ণা। চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করি, দাদার সঙ্গে কয় পালা ঝগড়া হলো ?"

হর-স্ত্রী। ঝগড়া এখন হয় নি, সে পোড়ামুখোর সঙ্গে ঝগড়া কল্লে এতক্ষণ দশ পালা ঝগড়া করা যেতো। তা আজ খুব সচ্ছি। অমন

একটি লোক দুনিয়ায় আর নাই। মানুষ কি গরু কিছুই বুঝিনা। আপনার বুঝ্ পাগলেও বুঝে। বাঁদরের আপন পর জ্ঞান নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালাপাহাড় আহার করিতে লাগিলেন ও রাঙ্গা বধূর এইরূপ পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মধুর বাক্যবিন্যাসে মনে মনে হাসিতে হাসিতে শুনিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় আবার মজা করিবার জন্য বলিলেন—"দাদা বুঝি ছেলে মেয়ে গুলিকেও ভালবাসেন না?"

হর-স্ত্রী। বড়? একটুও না। অমন পোড়াকপালে লোক কি হয় গা? আমি ম'লেও বাছাদের ছোঁয় না। গয়না কাপড় কিছুই দেয় না। খাওয়া পরা বুঝেই না; পাপিষ্ঠ, অতি পাপিষ্ঠ। সংসারের কোন খোজ রাখে না, কেবল ভাই, বোন, এ, সে, ক'রে মরে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ কথোপকথনে আহার শেষ হইল। আহারান্তে হরনাথ ও কালাপাহাড়ে কত কি পরামর্শ হইল, তাহা আমাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই। পরিশেষে কালাপাহাড় যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তাহা প্রকাশ করায় বাধা নাই। কালাপাহাড় বলিলেন—"অঙ্গীকার কচ্ছি, ও সব রক্ষা কর্‌ব। উড়িষ্যায় আমায় যেতেই হ'বে। উড়িষ্যায় না গেলে এবং উড়িষ্যা জয় না করলে লোকে আমাকে ভীরু ও কাপুরুষ বল্‌বে। যা আমি নিজমুখে স্বীকার করেছি, তা আমার কত্তেই হ'বে।"

অতঃপর সেনাপতি কালাপাহাড়, হরনাথ ও হরনাথের সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সেনাপতি হরনাথের পুত্র কন্যাদের প্রত্যেকের হাতে কএকটি করিয়া মোহর দান করিলেন। পরদিন প্রত্যূষেই নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাণ্ডায় যাত্রা করিলেন। শুনা যায় নবদ্বীপের যে লোক কালাপাহাড়ের অগ্নিকাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষতির কথা বলিয়াছিল, জ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার তৎপরিমাণে ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়ার গৃহ।

ছি, ছি, ছি! আমি তোমাকে বার বার মানা করি, তবু তুমি কেঁদে কেঁদে শরীরটা মাটী করবে। কার জন্যে কাঁদ? সে তোমার কে? সে এমন চাঁদ ফেলে জাত খোয়ায়ে, ধর্ম্ম খোয়ায়ে এক মুসলমানীকে নিয়ে ঘর কন্না কচ্ছে। তুমি বল, এখনও সে তোমার জন্য মরে। কৈ নবদ্বীপ পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে কাল সন্ধ্যার তাণ্ডায় এসেছে। তোমার সঙ্গেত একবার দেখাও করলে না। অমন পোড়ামুখোর ছায়াও মাড়াতে নাই; তুমি শিব শিব কর, সেই শিবের চিন্তায় মন দেও। এইরূপ কত কথা যোগমায়ার পরিচারিকা যোগমায়াকে বলিল।

পরিচারিকে? তুমি প্রেমিকা নহ। তুমি যোগমায়ার এক ফোঁটা চক্ষের জলের মূল্য কি করিয়া বুঝিবে। সেই সতী পতিব্রতার চক্ষের জলে বালুকাময় মরুভূমি ফলপুষ্পসমন্বিত উদ্যানে পরিণত হয়। তাঁহার পবিত্র চরণস্পর্শে নরক স্বর্গ হয়। তাঁহার করস্পর্শে বিষলতিকা স্বর্ণলতিকা

হইয়া উঠে। পরিচারিকে! তুমি ক্ষান্ত হও। যোগমায়ার মহাযোগের অনুষ্ঠান ভঙ্গ করিও না।

যোগমায়া পরিচারিকার কথায় ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"তুমি কখন্ আমায় কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে? আমি কাঁদি নাই। আমি একটু ভাবতে চিন্তিতে বস্‌লেই তুমি বল আমি কাঁদ্‌ছি। ভাবনার ত বিষয়ই হয়েছে। মা গঙ্গাও আমাদের প্রতিকূলে লেগেছেন। গঙ্গার ভাঙ্গন দেখ, পাছ দুয়ার পর্য্যন্ত এলো। বৈঠকখানার দালানটা ত পড়ে গিয়েছে। কোন্ দিন পূজার দালানও যাবে। মামাশ্বশুর ঠাকুরেরা বাড়ীটি বেচে গেলেও কিছু পেতেন।"

এই সময়ে প্রতিবেশিনী নলিনী যোগমায়ার নিকটে আসিলেন। দাসী স্থানান্তরে চলিয়া গেল, নলিনী রমণীরত্ন। নলিনীর পতিভক্তি ও পতিসেবার কথা যোগমায়া পরমানন্দে শ্রবণ করিতেন। নলিনীর সহিত বিদ্যাও যোগমায়ার নিকটে আসিতেন। বিদ্যা কে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যা আমাদিগের পরিচিত কালু—ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্নী। সেনাপতি কালাপাহাড় অবকাশ সময়ে কালুকে লইয়া আমোদ করিতেন। তিনি কালুকে কিছু অর্থ দিয়া তাহার বাড়ী ঘর করিয়া দিয়াছেন ও বিদ্যার সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। বিদ্যা পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। বিদ্যা তত বুদ্ধিমতী নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালু পরিশ্রমী। কালু লাঙ্গল গরু করিয়া একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিদ্যা নলিনীর পতিভক্তি ও পতিসেবার কথা শুনিত এবং সে কালুকে সেইরূপ সেবা ভক্তি করিত। কালু ও বিদ্যার মধ্যে বেশ প্রণয় ছিল। বিদ্যার সরলতাময় ও নলিনীর বুদ্ধিমত্তার সহিত রসিকতাময় পতিভক্তির কথা শুনিয়া, যোগমায়া আন্তরিক সুখ অনুভব করিতেন। নলিনী আসিবার অল্পক্ষণ পরেই বিদ্যাও

আসিল। সময় অপরাহ্ন, যুবতীদলের বেশ-বিন্যাসের কাল। যোগমায়া নলিনীর ও নলিনা বিদ্যার কেশ বন্ধনে বসিলেন। বিদ্যার এক দিন কার রাত্রির গার্হস্থ্য কার্য্যের ও গৃহদেবতা পতির অর্চ্চনার কথা কেবল আরম্ভ হইয়াছে। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্যে! কা'ল রাত্রিতে কি রেঁধেছিলি? ঘোষ মহাশয় ত বিনা মসলার পান খেতে পারেন না। কেওয়া খয়ের কি করেছিস?"

বিদ্যা। দিদি! সে খয়ের করেছি। কি বল্‌ব, কা'ল সেই খয়েরের পান খেয়ে, ঠোঁট টুক টুকে লাল করে, কত সোহাগ করে আমার মুখে—

এই সময়ে সেনাপতি কালাপাহাড় সেই গৃহে আসিলেন। তিন রমণীই অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। বিদ্যা সেনাপতির সহিত কথা কহিত। সে আসন দিয়া বলিল—"সেনাপতি মহাশয়! বসুন।"

কালাপাহাড় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্যে! তারপর?"

বিদ্যা লজ্জায় অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দিল।

"সেনাপতি বলিলেন—"বিদ্যার দেখি এখন বেশ লজ্জা হয়েছে। বিদ্যা আর কৃষ্ণচন্দ্র সুখে থাকে এ আমার বড় ইচ্ছা! বিদ্যে! কৃষ্ণ ত তোকে ভাল বাসে?"

বিদ্যা মস্তক অবনত করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিল। পরে সেনাপতি নলিনীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"দীনবন্ধু ত ভাল আছেন?"

নলিনীও মস্তক অবনত করিয়া সেনাপতির কথার উত্তর দিলেন।

তখন সেনাপতি যোগমায়াকে বলিলেন—"কেমন মায়া! হয়েছে তো? তোমার কাশী গেল, নবদ্বীপ গেল, হিন্দুর গ্রামের পর গ্রাম যাচ্ছে। নগরের পর নগর যাচ্ছে। পুস্তকের স্তূপের পর পুস্তকের স্তূপ পুড়ছে। দেবালয় সকলে গোহত্যা হচ্ছে। রাশি রাশি দেবমূর্ত্তি, নারায়ণশিলা ও শিবলিঙ্গ ভস্মীভূত করা হচ্ছে। হিন্দুর আর কত ক্ষতি করাবে?"

ক'রেই ত আমি গিয়েছি—বাঙ্গালা বেহার গিয়েছে—উড়িষ্যা যায় যায় হয়েছে। চুলের মুঠা ধরেই নিয়ে যাব।"

অনন্তর কালাপাহাড় বেগে যোগমায়াকে ধরিতে গেলেন। যোগমায়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। কালাপাহাড় নলিনী ও বিদ্যা—পরে কৃষ্ণ চন্দ্র ও দীনবন্ধু—সকলেই কালাপাহাড়ের মাতুলালয়, সে গ্রাম, বন, উপবন, উদ্যান সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও যোগমায়ার অনুসন্ধান হইল না। সে বাড়ী ভগ্ন করিয়া দেখিলেন। কোথাও যোগমায়া নাই। পরিশেষে উন্মত্তের ন্যায় আক্ষেপ করিতে করিতে কালাপাহাড় নিজগৃহে গমন করিলেন।

কালাপাহাড় বলিলেন—"হায়! হায়! হায়! আমি কি সর্ব্বনাশ করলেম। আমার হৃদয়-শ্মশানের আগুন সহস্র গুণ বৃদ্ধি করে জাল্লেম। সেই প্রেমপ্রতিমা আজ হারালেম। সেই শান্তির ছায়া আজ নষ্ট কল্লেম। আমার জীবন-মরুর সেই মারব দ্বীপ আজ প্রচণ্ড মরুভূমিতেই বিলীন করিয়া ফেলিলাম। সেই পতিভক্তির দেবী আজ বিসর্জ্জন দিলেম। সেই মূর্ত্তিমতী পতিহিত ব্রতাকে আজ ধ্বংস করলেম। সেই শুশ্রূষার,—সেই দয়ার দশভূজাদেবী আজ হারালেম। আজ পাষণ্ডের চরম দুর্দ্দশার দিন এলো। দিনান্তে হউক, পক্ষান্তে হউক, মাসান্তে হউক, বৎসরান্তে হউক, একবার আসিয়া শান্তিদায়িনী জীবনশ্রমের ক্লান্তিহারিণী বটচ্ছায়ায় বসিয়া মন প্রাণ জুড়াইবার চেষ্টা করিতাম। তা আজ কঠোর কুঠারাঘাতে ছেদন করিলাম। দেবীমন্দিরের পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেম, তা আজ বিনষ্ট করলেম। আমার হৃদয় মরুতে আজ দাবানল জ্বলিল। দগ্ধ জীবনের তাপ শত গুণ হ'তে সহস্র গুণে বাড়িল, জীবন আজ উদ্দেশ্যশূন্য অকর্ম্মণ্য। আশালতিকা আজ ছিন্ন, উন্মূলিত। দেবি! এই তোমার মনে ছিল? ভক্তি! তুমি আজ

আমায় ছাড়িলে? সুধা! তুমি এ নরপিশাচের ভোগ্যা নহ! আজ জীবন আশাশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য, অকর্ম্মণ্য—কেবল পাপময়, জ্বালাময়, নৈরাশ্যময়, হাহাকারময়, বিষাদময় হয়ে উঠ্‌লো। আজ অনুতাপের দিন, আজ আক্ষেপের দিন। আজ বঙ্গের পাপ, বঙ্গের ত্রাস, বঙ্গের কলঙ্ক কালা-পাহাড়ের পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্ত-দিনের সুপ্রভাত। আর এই পাপ ভারাবনত দেহ, এই কলঙ্কিত দেহ, ভূপৃষ্ঠে রাখিয়া ভূভার বৃদ্ধি করার ফল কি?”
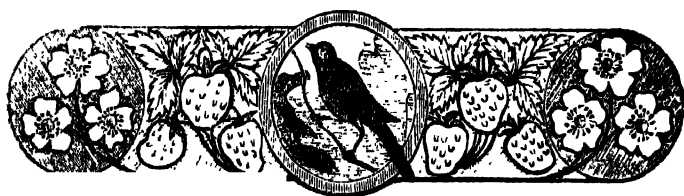
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুরে।

সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিতে যাইতেছেন। অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে বিশাল বাহিনী, বহুল-পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী, প্রচুরপরিমাণে যুদ্ধ সম্ভার ও বহু সংখ্যক যানবাহন। এক এক পটমণ্ডপে এক এক দল করিয়া সৈনিক অবস্থিতি করিতেছেন। কোন দল গান করিতেছে, কোন দল নৃত্য করিতেছে, কোন দল নৃত্য, বাদ্য ও গানে প্রমত্ত হইয়াছে, কোন দল বসিয়া গল্প করিতেছে, কোন দল বসিয়া উড়িষ্যা-জয়ের অভিসন্ধি আঁটিতেছে, কোন দল বসিয়া পরনিন্দার সুখে কালাতিপাত করিতেছে, কোন দল বসিয়া সেনানায়ক ও সেনাপতিদিগের প্রশংসা করিতেছে, কোন দল অর্জ্জুন ও ভীষ্মের মধ্যে বড় কে বলিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, কোন দল বসিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সুকীর্ত্তি বর্ণন করিতেছে, কোন দল পুত্রকলত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া অপর দলের সহিত

মিশিয়া স্বস্ব গৃহিণীগণের গুণপনা ও পুত্রকন্যাদিগের খেলা ধূলার কথা আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের অন্য সৈনিকের বা সেনানায়কের কথায় প্রয়োজন নাই, এস আমরা একেবারে প্রধান সেনাপতি কালাপাহাড়ের পটমণ্ডপে প্রবেশ করি।

এক বিশাল পটমণ্ডপের মধ্যস্থলে এক দ্বিরদ-রদনির্ম্মিত রত্নাদি খচিত মহার্ঘ আসনে সেনাপতি চিন্তাকুল ও বিষণ্ণভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। তিনি প্রতিক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। বহুক্ষণ এই ভাবে অবস্থিতির পর তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"একটি স্ত্রীলোককে—আমার বাধ্য অনুগত সেবা-রত স্ত্রীলোককে,—একটি প্রেমময়ী পত্নীকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে পার্‌লেম না। এতে সমগ্র হিন্দুজাতিকে স্বধর্ম্ম ছাড়াইয়া মুসলমানের সহিত মিশাইব? আমার ধর্ম্মবিশ্বাস চঞ্চল তাই হিন্দু দেবদেবীকে ডাকিয়া কোন শুভ ফল পাই নাই। যোগমায়া—সেই প্রেমময়ী যোগমায়ার ধর্ম্মবিশ্বাস অচল, অটল। সেই হাস্যময়ী, প্রফুল্লতাময়ী, প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী দেবী, কার্য্যে বিদ্যুদ্দামের ন্যায় চঞ্চলা, রহস্যে ভাঁড়ের ন্যায় রহস্যবতী, পরে কি আর তেমন ছিল? জ্ঞানানন্দ স্বামী, বোধ হয়, তাহাকে যোগধর্ম্মে শিক্ষাদান করিয়াছেন। সে যোগবলেই বোধ হয় আমার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। শুনিয়াছি যোগবলে লোকে মরিতেও পারে। যোগমায়া মরিলে তাহার মৃত দেহত পাইতাম। সেই প্রেমের পুতুল কি হ'ল কে জানে? সেই নিঃসহায়া স্ত্রীলোক বাঙ্গালা বেহারের কোন স্থানে কেহ দেখিলে আমার সন্তোষার্থ আমাকে আসিয়া বলিত। হায়! হায়! যোগমায়া আমা হ'তে কোন সুখে সুখী হলো না। তাকে আমি তুষানলে দগ্ধ

কর্‌ছিলেম। সে যদি বেঁচে থাকে, আমারই কর্ম্মদোষে সে আশ্রয়হীন হয়েছে। আমি কি মূর্খ! কি জ্ঞানহীন! আমি বঙ্গমাতার কুসন্তান। বঙ্গের ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি। স্ববংশের অরি। স্বজনের পরম বৈরী। আমার জীবন বিষম মরুভূমি। বঙ্গের ধ্বংস সাধন কর্‌তে এসেছিলেম, ধ্বংস সাধন ক'রে গেলেম। আমার সেই ধ্বংসসাধনে পটু হস্ত এখন হাস্যময়ী উড়িষ্যা দেশে প্রসারিত হ'লো। উড়িষ্যার সরলতা, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মভাব এই পাষণ্ড হতেই বিলুপ্ত হ'বে। যা একবার প্রকাশ করেছি, তা না কর্‌লেও নয়। নবাবকে যে উচ্চ আশার সোপানে অধিরোহণ করিয়েছি, তা হ'তে ত আর অবরোহণ করাতে পারি না। আমার অভি-সন্ধির একবার শেষ চেষ্টাও দেখি। যোগমায়া আর নজিরণ—দুইই আমাকে ভাল বাসে, দুয়েরই প্রেম অপার অগাধ, তবে আমি একের প্রেমে কেন তৃপ্ত হইতে পারি না? এ কি আমার মনের দোষ, না নজি-রণের প্রতি আমার আসক্তির অভাব? দুইটিই আলোক, একটিকে পূর্ণিমার চন্দ্র, অন্যটিকে স্তিমিত দীপ বলিয়া বোধ হয় কেন? বুঝেছি ইহার অর্থ আছে। নজিরণ ভাল বাসে বটে, সে ভালবাসা দেখাইতে জানে, সে হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় লইতে জানে, কিন্তু সে স্বামীর অসন, বসন, শয়ন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, মনোবৃত্তি, গতি, স্থিতি, কার্য্য প্রভৃতি সব আপন হাতে তুলিয়া লইয়া সকল বিষয়ে হিন্দুর কথিত অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'তে পারে না।

এই সময়ে এক দৌবারিক আসিয়া বলিল—"নবদ্বীপের একটি ব্রাহ্মণ খুব বড় একটা নাম, ন্যায় পঞ্চানন কি নায়, নায়—"

কালাপাহাড়। বুঝেছি ব্রাহ্মণ বলেন কি?

প্রহরী। তিনি দেখা কর্‌তে চান।

কালাপাহাড়। তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।

অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রহরী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতির পটমণ্ডপের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। কালাপাহাড় প্রহরীকে বিদায় করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। চতুর্থবারে দৃষ্টি করিয়া চিনিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণ তাঁহার অধ্যাপক নবদ্বীপনিবাসী হরদেব ন্যায়রত্ন। সেনাপতি কাঁদিয়া অধ্যাপকের পদতলে পড়িলেন। অধ্যাপক অনেক আশ্বাস বাক্য বলিয়া সেনাপতিকে আশ্বস্ত করিয়া বসাইলেন। কালাপাহাড় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পাটুলীর সম্পত্তি নষ্ট হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যোগমায়ার পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কত অনুতাপ করিলেন ও কাঁদিলেন।

অনন্তর অধ্যাপক মহাশয়ের কথা আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন— "প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, একমাত্র প্রিয় কন্যা জগদম্বাকে হারিয়েছি। পূরীতে কন্যার অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে শুনিলাম একদল যাত্রীর সহিত একটি কন্যা গিয়াছে। সেই তীর্থ-যাত্রীর অনুসন্ধানে গিয়া, কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিলাম; কোথাও কন্যা পাইলাম না। হরিদ্বারে সেই তীর্থযাত্রীর লোকের সহিত দেখা হইল, দেখিলাম সে দলের সহিত যে কন্যাটি আছে সে আমার নয়। হরিদ্বারে জ্ঞানানন্দের সহিত দেখা হইল, তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম একদল ফকির ও বহুদল সন্ন্যাসী হিন্দুমুসলমানের মহামিলনের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তুমি তাওয়ায় সহকারী সেনাপতি হইয়াছ। পরে যখন কুরুক্ষেত্রে আসিলাম, তখন জানিলাম সম্রাট আকবরও হিন্দুমুসলমানের মিলনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। তিনি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া জিজিয়া প্রভৃতি কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দুমুসলমানকে এক করিবার জন্য এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ভাবিলাম এ ধর্ম্মগঠন মন্দ নহে। আমরা যখন শক, হুন, গ্রীক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিকে হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত

করিয়াছি, আমরা যখন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্রমত কোথাও স্বতন্ত্র রাখিয়া, কোথাও বা সকল ধর্ম্মের কোন কোন উপাদান এক কটাহে দ্রবীভূত করিয়া, তাহাতে অস্থি কঙ্কাল সংযোগ করতঃ আর্য্য অনার্য্যের গ্রাহ্য হিন্দু নামধেয় এক নূতন ধর্ম্ম প্রণয়ন পূর্ব্বক ভারতে প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছি, তখন ভাবিলাম হিন্দুমুসলমানের মিলনও কঠিন নহে। দেখিয়া আসিলাম দিল্লীর সম্রাট এই মতাবলম্বী হওয়ায় এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহার সাম্রাজ্য গঠন করা হইতেছে। প্রয়াগে ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম, তুমি মুসলমান হইয়াছ। কাশীতে আসিয়া দেখিলাম তুমি কাশীর সর্ব্বনাশ করেছ। বেহারের সর্ব্বত্র তোমার নামে আতঙ্ক। বাঙ্গালায় তোমার নামে হিন্দু সিহরিয়া উঠিতেছে। আজ কয়েক দিন অনুসন্ধান করিয়া তোমার সৈনিকগণের ভাগ্যফল জ্যোতিষমতে গণাপড়া করিয়া বহুকষ্টে তোমার দেখা পাইয়াছি। আবার পুরীতে মাতার অনুসন্ধানে যাইতেছি।"

কালাপাহাড় বলিলেন—"প্রভো! আপনাকে পরম যত্নে, পরম হিন্দু ভাবে উড়িষ্যায় লয়ে যাব। ভগিনী জগদম্বা উড়িষ্যায় থাকিলে নিশ্চয় তাহার অনুসন্ধান হইবে। আমার চেষ্টা অনুসন্ধানের কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। আমি ভেবেছিলেম আমি হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করলে, হয় সকল হিন্দুমুসলমান হবে, না হয় আমার অত্যাচারে হিন্দুগণ উত্তেজিত হ'য়ে মুসলমানকে পরাজিত ক'রে মুসলমানগণকে তাঁহাদের অধীন ক'রে ফেল্‌বে। প্রথমে আমি আপনার কথিত সন্ন্যাসী ও ফকিরের মতাবলম্বী ছিলেম, পরে পত্নী যোগমায়ার ব্যবহারে আমার মতান্তর ঘটে। এখন দেখ্‌ছি আমার মত ভ্রান্ত। উড়িষ্যা জয় না করলে আমার ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

হরদেব। বাঃ! তোমার অত্যাচার হিন্দুগণ মুসলমানের অত্যাচার

ভাব্‌ছে না। স্বধর্ম্মত্যাগী বিধর্ম্মী হ'লে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করে, তোমার অত্যাচারকে লোকে সেই অত্যাচার ভাব্‌ছে। তোমার অত্যাচার অল্প স্থানে হচ্ছে। হিন্দু অনেক দিন পরাধীন। একরূপ অত্যাচারে, হিন্দুর শীতল শোণিত উষ্ণ হবে না। বিচারে অত্যাচার, শাসনে অত্যাচার, পালনে অত্যাচার, হিন্দুর শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যনাশ ইত্যাদি সকল বিষয়ে সকল হিন্দুর উপর অত্যাচার হ'লে হিন্দু উত্তেজিত হ'বে। তখন দেশে যে কি শক্তির আবির্ভাব হ'বে তা বলা যায় না। তখন এই অস্ত্রহীন হিন্দুর অস্ত্রের অভাব হবে না। তখন এই যুদ্ধের উপকরণ-বিহীন হিন্দুর সহস্র যুদ্ধোপকরণ উদ্ভাবিত হ'বে। তখন হিন্দুর শক্তির পদতলে জগতের সকল প্রধান শক্তি লুণ্ঠিত হ'বে। তোমার এ অত্যাচারে হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষ বাড়্‌ছে, আর হিন্দুধর্ম্মের গোড়াম রক্ষার জন্য নানা যুক্তিহীন উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। মুসলমানগণও হাস্‌ছে। তারা হিন্দু দিয়া হিন্দুর ঘাড় ভাঙ্গছে। দেশে প্রায় বিশ বাইশ কোটি হিন্দু, আর দুই কি আড়াই কোটি মুসলমান। হিন্দুগণ যদি বলে যে, মুসলমানের সেবা কর্‌ব না, মুসলমানের সহিত বেচা কেনা কর্‌ব না, মুসলমানগণ আমাদিগকে কাটিয়া রাজত্ব করুক, তা হলেও মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কাটিতে কাটিতে অবসন্ন হইয়া মরিবে। হিন্দুর একতা ও উত্তেজনা নাই বলিয়া হিন্দুর এ দুর্দ্দশা। তুমি বাবা! দেশের হিত করিতে পার নাই, অহিত করেছ। তুমি উড়িষ্যার স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ নষ্ট ক'রো না।

কাপা। প্রভো! আপনার সব কথা শুন্‌ব, আপনার এই কথা শুন্‌তে পার্‌ব না। আমি ভ্রান্ত কি নির্ভুল তাহা উড়িষ্যাজয়ে বুঝিব। আমি ভাবিতেছি, পুরীর জগন্নাথকে আর কামরূপের কামাখ্যা দেবীকে নষ্ট কর্‌লেই সকল হিন্দু মুসলমান হ'বে।

উভয়ে অনেক কথা হইল। হরদেব কিছুতেই কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা বিজয় হ'তে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। হরদেব কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, অনেক বুঝাইয়া যদি কিছু শুভফল ফলাইতে পারি। কালাপাহাড় তাণ্ডা হইতে পুরীর দিকে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্তও সেইরূপ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সেরসার সময় হইতে যুদ্ধবাহিনীর এইরূপ ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কালাপাহাড়ও রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে ও ঘোড়ার ডাক প্রবর্ত্তন করিতে করিতে উড়িষ্যাভিমুখে' চলিলেন। প্রতিদিন অবকাশ সময়ে হরদেবের সহিত নানা কথা হইতে লাগিল। কালাপাহাড় নানা বিষয়ে কথা পাড়লেও হরদেব ধর্ম্মবিষয়ে কালাপাহাড়ের সহিত কথা বলিতে ভালবাসিতেন। ধর্ম্মহীন মরুভূমির স্বরূপ কালাপাহাড়ের হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মোপদেশরূপ, জলাশয় স্থাপন, ধর্ম্মভীরু হরদেবের উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার অবস্থা।

কালাপাহাড় মেদিনীপুরেই থাকুন, আর উড়িষ্যার দিকেই অগ্রসর হউন, আমরা এক্ষণে কালাপাহাড়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উড়িষ্যার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। অনেকে মনে করেন, পুরী (শ্রীক্ষেত্র) বৌদ্ধ তীর্থ। তথায় অন্নের স্পর্শ দোষ নাই বলিয়া অনেকে এই ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। উড়িষ্যার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোভাবের পর, শঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মযুগান্তরের প্রাদুর্ভাব কালে, পুরীতে কোন রাজা জগন্নাথ মন্দির ও তন্মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রা—এই ত্রিমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্থাপনের পরে ভুবনেশ্বরের ও সাক্ষী গোপালের মূর্ত্তি এবং মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। জগন্নাথের প্রসাদ, তিন শত বৎসর হইল, স্পর্শদোষ বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। তাঁহার বৈষ্ণব মত উড়িয়াগণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবার পর, জগন্নাথের প্রসাদ অন্নের স্পর্শদোষ তিরোহিত

হইয়াছে। এক দল ব্রাহ্মণ জগন্নাথের পূজার পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহারা আহারার্থ জগন্নাথের প্রসাদ অন্ন পাইতেন। উপর্য্যুপরি কয়েক-দিন সেই প্রসাদ অন্ন ছোঁয়া পড়ে। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন সেই ব্রাহ্মণ পরিদর্শকগণ এইরূপে ছোঁয়া অন্নই আহার করেন। প্রথমে পুরীর মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে প্রসাদ অন্নের স্পর্শ দোষ রহিত হয়। অনন্তর পুরীতে যাত্রিগণের অবস্থিতি ও আহারের অসুবিধা হওয়ায় প্রসাদ-অন্নের স্পর্শদোষ পুরীসহর হইতে তিরোহিত হয়। এখন জগন্নাথদেবরে শুষ্ক প্রসাদান্ন দূর দূরান্তরে যাইতেছে ও হিন্দুগণ তাহা অতি পবিত্র বোধে মস্তকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আহার ও ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। বাস্তবিক জগন্নাথদেবের প্রসাদান্নের স্পর্শদোষ গ্রাহ্য না করা শাস্ত্রসম্মত নহে।

অনেক সময়ে জগন্নাথের পচা প্রসাদ অন্ন আহার করিয়া পুরীতে যাত্রিগণের মধ্যে ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর ধর্ম্ম. হিন্দুর শাস্ত্রসীমায় আবদ্ধ নাই; সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া শাস্ত্র সীমার অনেক বাহিরে অগ্রসর হইয়াছে। হতভাগ্য দেশে বিচার নাই! চিন্তা নাই! কেহ উন্নতিকল্পে বিদেশ যাত্রা করিলে, বালবিধবার বৈধব্য দশার দূরীকরণে কৃতসংকল্প হইলে, শাস্ত্রের নামে অমূলক শাস্ত্র আসিয়া বিশেষ বিঘ্ন জন্মায়। এক রাজার অশাস্ত্রীয় খেয়াল কৌলীন্য-প্রথা-লতিকা বিষ-বল্লরীর ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়া বাঙ্গালার বহু-দূর ব্যাপৃত হইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিতেছে। বাঙ্গালায় রামমোহন, রামগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি অধিক জন্মেনা। সূত্রধর বাঙ্গালায় অধিক নাই—নাই বলিলেও চলে। যদি ভাল সূত্রধর থাকিত, তবে বাঙ্গালার সমাজ-উদ্যানে কালসহকারে যে সকল বিষতরু ও বিষবল্লরী জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় দৃঢ় করে কুঠার ধরিয়া—সংস্কারের কুঠার ধরিয়া—কাটিয়া ছিন্ন-

ভিন্ন করিয়া নির্ম্মূল করিয়া দিত। বঙ্গের মৃত মালঞ্চে আর সৌরভ সম্ভারপূর্ণ সুবর্ণ চম্পক বিকশিত হইবে কি?

লেখনি! তুমি স্বাধীন বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিতে অবসর পাও নাই। মুসলমান অত্যাচারে উৎপীড়িত বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়া, স্বীয় মসীকলঙ্কিত অঙ্গ আরও কলঙ্কিত করিয়াছ। তুমি স্বাধীন উড়িষ্যার অবস্থা বর্ণনে অবসর পাইলে—এখন স্বাধীনতার চিত্রপট অঙ্কনে স্বীয় শক্তির পরিচয় দেও। যদি উড়িষ্যার স্বাধীনাবস্থা সম্যক্ রূপে বর্ণন করিতে অক্ষম হও, যদি তুমি পরাধীনকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ায় তোমার দৈবী শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, তবে তুমি আর উড়িষ্যার স্বাধীনাবস্থা বর্ণন করিও না। একদিকে নরকসদৃশ পরাধীন বঙ্গ, অন্যদিকে স্বর্গ-সদৃশ স্বাধীন উড়িষ্যা! তুমি উভয় দেশের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছ। তুমি নরক ও স্বর্গের সমান্তরাল দুই চিত্র পট অঙ্কন করিয়া পরাধীন বঙ্গ-বাসীকে স্বর্গ সুখ দেখাইয়া দেও। তোমার নিজ শক্তিতে দৈবী শক্তি আবির্ভাব করিয়া লও। কল্পনা ও বাণী আসিয়া তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তুমি বৃক্ষলতা-সমাকুল শৈলমালা-সুশোভিত, শ্যামল শস্যপূর্ণ, শ্যামল-ক্ষেত্র পরিশোভিত, মহানদী বৈতরণী প্রভৃতি স্বচ্ছসলিলা বেগপূর্ণা নদীবিধৌতা উড়িষ্যার মানচিত্র অঙ্কন কর। দেশের স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে নগ্নবেশ অনার্য্য জাতি আছে, যাহারা প্রাচীন কালের রীতি নীতি সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বন জঙ্গলে বাস করাও শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছে, তাহাদের কথা তুমি এখন ছাড়িয়া দেও। উড়িষ্যা এখনও স্বাধীন—পুরুষ স্বাধীন—বালক স্বাধীন—বালিকা স্বাধীন! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা স্বাধীনভাবে চলাচল করিতেছে! কৃষি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, শিল্পাগারে শিল্পকর্ম্ম করিতেছে, বন জঙ্গলে ফল আহরণ করিতেছে, বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, স্নান ঘাটে স্নান পূজা

করিতেছে ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে নানা খেলায় সুখে কালাতিপাত করিতেছে। অবরোধ প্রথার আঁটাআঁটি এখনও উড়িষ্যায় হয় নাই, বৈধব্যের কঠোর নিগড় উৎকল বালাগণ এখনও পরে নাই, বৈদেশিক কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও বিদ্যা উৎকলে প্রবেশ করে নাই। উৎকলদেশ ধনী না হইলেও পরমুখাপেক্ষী নহে। উৎকলবাসী পণ্ডিত না হইলেও কালোচিত শিক্ষায় অনভিজ্ঞ নহে। উৎকলবাসী কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে। তাহারা সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পী না হইলেও অনেক শিল্প বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। উৎকলবাসিগণ অতি বিলাস-প্রিয় না হইলেও মোটামুটি বিলাসের দ্রব্য তাহারা প্রস্তুত করিতে জানে।

ঐযে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সমূহে শিখাধারী ছাত্রগণ উচ্চরবে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছে। ঐযে ভাস্কর পল্লীতে ভাস্করগণ প্রস্তরের কত মূর্ত্তি ও প্রস্তরের দ্রব্যজাত প্রণয়ন করিতেছে। ঐযে সূত্রধর পল্লীতে সূত্রধরগণ নানা কাষ্ঠ মূর্ত্তি ও কাষ্ঠ দ্রব্য গঠন করিতেছেন। ঐযে লবণের কারখানায় উৎকলবাসিগণ স্তূপ স্তূপ লবণ প্রস্তুত করিতেছে। ঐযে কাঁসারীপল্লীতে কাঁসারিগণ টং টং ঢং ঢং শব্দ করিয়া পিতল কাঁসা পিটিয়া খোদায়ের কার্য্যে অলঙ্কৃত করিয়া নানাবিধ জলপাত্র, ভোজনপাত্র, রন্ধনপাত্র ও আধারপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। ঐযে স্বর্ণকার পল্লীতে স্বর্ণকারগণ টুক্ টুক্ ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কৃত করিয়া ফুল পাতা পাখীতে সমলঙ্কৃত কত স্বর্ণ রৌপ্য ভূষণ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐযে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদল স্বাধীনপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে প্রবহমাণ বায়ুতে সঙ্গীত স্বর মিলাইয়া দিয়া হলকর্ষণ ও বীজ বপন করিতেছে ঐযে বালেশ্বরের নিকটে বুড়ী বালাং নদীতে, ঐযে কটকের নিম্নে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীতে, ঐযে পুরীর নিকটে সমুদ্র তীরে কতবড় বড় মহাজনি তরি

বাঁধা রহিয়াছে—তাহারা লবণ, চাউল, ডাইল ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য লইতে আসিয়াছে। টাকায় চারি পাঁচ মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে। টাকায় দুই তিন মণ ডাইল বিক্রীত হইতেছে। টাকায় ছয় মণ লবণ পাওয়া যাইতেছে। টাকায় ঘৃত আটসের বিক্রীত হইতেছে। সাধিয়াও বিক্রেতৃগণ টাকায় ষোল সের তৈল বিক্রয় করিতে পারিতেছে না—। স্বাধীনতার রঙ্গভূমি, শিল্পের বাজার, শস্যের গোলাবাড়ী উৎকলের অধিবাসিগণ যাহা জীবনে প্রয়োজন মনে করিত, তাহাই তাহাদের দেশে পাইত। যেমন অভাব ছিল, সেইরূপ দ্রব্য তাহাদের দেশে প্রস্তুত হইত। তাহাদের কার্পাস, রেশমী ও পশমী বসন, লজ্জা ও শীতাতপ নিবারিণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে উৎকলবাসিগণ তাহা জানিত না। পেটের জ্বালায় উৎকলবাসিগণ অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিত না। উৎকলের শৈলমালা, আম্র, জাম, পনস প্রভৃতি ফলের আগার। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র খাদ্যের ভাণ্ডার, তাহাদের দেশ-প্রবাহিত নদী তাহাদিগের দেশের শিল্প লইয়া যাইবার ও বিদেশী দ্রব্যজাত আনিয়া চালিয়া দিবার পথ—অর্থ আনিয়া দিবার প্রস্রবণ। উৎকলে শান্তি, সুখ ও প্রফুল্লতা প্রতিঘরে বিরাজ করিতেছে। সরলতা ও সদাশয়তা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিগৃহে বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থপরতা, ন্যায়পরতা, সদাচার ও সদনুষ্ঠান উৎকল ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই।

বৈশাখ মাস, বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। খরকর বিভাকর কিরণমালা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছেন। পবন ভয়ে স্তম্ভিত, পক্ষিকুল নীরব, তরু-ব্রততী নিস্পন্দগণ। কেবল মানবের বড় পেট, তাই যেন তারা পেটের জ্বালায় দুই চারি জন চলাচল করিতেছে। উড়িষ্যার পুণ্যভূমি পুরী সহর। পুরীর অন্তর্গত শ্রীমন্দিরের অদূরে এক

দীর্ঘ জলাশয়। সেই জলাশয়ে নানাজাতীয় নরনারী স্নান করিতেছেন। মুণ্ডিত-কপাল ও শিখাবান্ দ্বিজদল কেহ স্নান করিয়া আচমন করিতেছেন, কেহ তর্পণ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, কেহ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন ও কেহ তন্ত্র ও পুরাণোক্ত স্তোত্রে সকাম প্রার্থনা জানাইয়া সর্ব্ব-ফলপ্রদ স্তোত্র গান করিতেছেন। বাপীতটে যেন বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র ব্রাহ্মণমুখে উদ্গীর্ণ হইয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে। নারীদল স্নানান্তে কলসকক্ষে জল লইয়া গৃহে ধাবিত হইতেছে। এই সরোবরের নিকটে দুই ব্রাহ্মণ যুবক ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আসিয়া এক নিম্বতরু তলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুরই স্থিরতা নাই; যুবকদ্বয় বিদেশী। উৎকল ভাষায় ভাল কথা বলিতে জানেন না।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরে একটি মধ্যমবয়স্কা স্ত্রীলোককে দুইটি বালিকার সহিত জল লইয়া যাইতে দেখিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা। পাণ্ডাপাড়া কোন দিকে?"

রমণী উত্তর করিলেন—"এই যে পাণ্ডাপাড়া নিকটেই। কাহার বাটীতে যাবে? তোমরা কোন্ পাণ্ডার যজমান?"

প্রথম যুবক উত্তর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপর যুবক বলিলেন—"আমরা মিশ্র বাড়ী যাইব।"

রমণী। মিশ্র ত অনেক, আমরাও মিশ্র। কাহার বাড়ী যাবে?

২য়যুবক। কি নামটা মনে হচ্ছেনা—সুদর্শন, গদাধর, হলধর, দামোদর—না, নামটা মনে হলো না।'

রমণী। তোমরা কি তবে চক্রধর মিশ্রের বাটীতে যাবে?

যুবকদ্বয় সমস্বরে উত্তর করিলেন—"হাঁ—হাঁ—হাঁ, ঐ নাম।"

রমণী তখন তাহার সমভিব্যাহারিণী বালিকাদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা বালিকাকে বলিলেন—"যা খুকী যা, তোর মামার বাড়ী দেখায়ে দিয়ে আয়।"

খুকী কলসী রাখিয়া, যুবকদ্বয়ের নিকটে আসিল। খুকীর বয়স ১১ কি ১২ বৎসর! খুকী সরলা চঞ্চলা—উড়িয়াদিগের দৃষ্টিতে রূপবতীও বটে।

খুকী বলিল—"আসুন বেলা ঢের হয়েছে। আপনাদের পাণ্ডার বাড়ী দেখিয়ে দিব।"

খুকীর সহিত যুবকদ্বয় রওনা হইলেন। পথিমধ্যে প্রথম যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুকী! তুমি কি জাত? তুমি বাঙ্গালা শিখ্‌লে কিরূপে? আমরা বাঙ্গালীই বা কিসে বুঝলে?"

খুকী বলিতে লাগিল—"আমরা পাণ্ডা বামনের মেয়ে, আমরা সকল দেশের লোক চিনি; কাপড় চোপড়ে ও চেহারায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী ব'লে চিন্‌লেম। আমরা সকল ভাষাই একটু একটু জানি, সকল ভাষার চেয়ে বাঙ্গালা একটু ভাল জানার তাৎপর্য্য এই যে, আমার মার সঙ্গে যে আর একটি সুন্দরী মেয়ে দেখলেন, ওটি বাঙ্গালী। ও আর আমি এক সঙ্গে থাকি, বাঙ্গালায় কথা বলি।"

প্রথম যুবা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাঙ্গালীর মেয়ে তোমাদের ঘরে কি ক'রে এলো?"

খুকী। ওর বাপ মা এই পুরুষোত্তমে এসেছিলেন, পথে ওদের উপর ডাকাইত পড়ে। ওর বাপ মাকে কোথায় নিয়ে কেটে ফেলে, ঐ মেয়েটি পথেপথে কেঁদে বেড়ায়, বাবা ওকে এনে বাড়ীতে রেখেছেন ও খুব ভাল মেয়ে, ও আমার মত বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে।

এইরূপ খুকীর সহিত যুবকদ্বয়ের অনেক কথা হইল। খুকী দূর হইতে চক্রধর মিশ্রের ভবন দেখাইয়া দিয়া আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎকলে সমরায়োজন।

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন উৎকল পাঠানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তখন মুকুন্দদেব উৎকলের স্বাধীন রাজা ছিলেন। মুকুন্দদেব নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজাধীন উৎকলে যেমন ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজ্য আছে, সেইরূপ মুকুন্দদেবের সময়েও তাঁহার অধীন অনেক গুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। পাঠানবাহিনী মুকুন্দদেবের রাজধানী যাজপুর ও পুরীর শ্রীমন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে জানিয়া, মুকুন্দদেব উৎকলের সর্ব্বত্র পাণ্ডাদিগকে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, উৎকলের সীমায় মুসলমান চমূ পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। ভাগ্যের ফল কে খণ্ডাইতে পারে? উদ্যমহীন উদ্যোগবিহীন শান্তিপ্রিয় মানবজাতিকে সহসা কে সমর-সাগরের দিকে প্রধাবিত করিতে পারে? উৎকলে বহুকাল শান্তি সুখ বিরাজ করায় উৎকলবাসিগণ

সমরবিদ্যা ভুলিয়া আলস্যে ও তৎকালোচিত বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাণ্ডাদিগের উৎসাহবাক্যে ও রাজার অনুজ্ঞায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না। সামন্তরাজগণ স্ব স্ব ধনসম্পত্তি, পুত্রকলত্র এবং প্রিয়জন লইয়া বন, জঙ্গল ও শৈলমালায় আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

ধনী সওদাগরগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। কার্য্যকুশল শিল্পিগণও পলায়নে পশ্চাৎপদ হইলেন না। শ্রমজীবী লোকেরাও জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। সকলেই স্ব স্ব ধন প্রাণ লইয়া পলায়নপর; কেহই জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না,—স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না,—হীরক চিনিল না,—কাচ লইয়া পলায়ন করিল। উৎকলবাসিগণ দেশের প্রকৃত গৌরব কি তাহা বুঝিল না; প্রকৃত মান সম্ভ্রম কি তাহা বুঝিল না; সুখের কেন্দ্রস্থানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল না। বিষম অপরিণামদর্শীর ন্যায়—নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায়—উৎকলবাসিগণ স্বাধীনতা-কহিনুর রত্ন মুসলমান হস্তে অর্পণ করিয়া অস্থায়ী ধনরত্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। উড়িয়াগণ! বুঝিলে না তোমারা শান্তি, সুখ, প্রফুল্লতা, উন্নতির আশা, জাতীয় মান সম্ভ্রম—সমুদায় নষ্ট করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল পরিতে চলিলে।

তোমাদের স্বাধীন সিংহাসন চলিল। তোমাদের রাজার ছত্র চামর চলিল। তোমাদের রাজার আশাসোটা চলিল। তোমরা এ পর্য্যন্ত স্বাধীন জাতি বলিয়া গণ্য ছিলে, ভাবী কালে তোমরা ছাগ মেষের ন্যায় ঘৃণিত হইবে—বর্ব্বর বলিয়া নিন্দিত হইবে। বঙ্গ বহুদিন মুসলমান শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। উড়িষ্যাও মুসলমান-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে চলিল, উড়িষ্যার রাজলক্ষ্মী সোলেমানের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে চলিলেন।

রাজা মুকুন্দদেব কি করিবেন। বালেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে কালাপাহাড়কে বাধা দেওয়া হইল না। কটকেও যথেষ্ট সৈন্য মিলিল না। ধর্ম্মভীরু

ও রাজভক্ত বলিয়া যাহারা রাজার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে পারিল না, ফেলে তাহারাই মুকুন্দদেবের সৈন্য হইল। রাজা মুকুন্দদেবের ও পাণ্ডাদিগের যত্নে চতুর্দ্দশ সহস্র মাত্র সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই চৌদ্দহাজার সৈন্যের মধ্যে আটসহস্র সৈন্যও রণ কুশল ছিল না। মুকুন্দদেব ছদ্মবেশী দূতের দ্বারা কালাপাহাড়ের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আটসহস্র সৈন্য রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ রক্ষার জন্য যাজপুরে থাকিল। ছয়সহস্র সৈন্য শ্রীমন্দির রক্ষার জন্য পুরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

পাঠক! সেই নিম্বতরুমূলে দুইটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত আপনকার পরিচয় হইয়াছে। ঐ যুবকদ্বয়ের মধ্যে একের নাম সুধীরঞ্জন ও অন্যের নাম সত্যব্রত। উভয়ে মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে ন্যায় ও বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে তাঁহারা পুরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। সত্যব্রত তীর্থকার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সুধীরঞ্জন উড়িষ্যাতেই রহিয়াছেন। তাঁহার উড়িষ্যায় থাকিবার বিশেষ কারণও উপস্থিত হইয়াছে। উড়িষ্যার স্বাধীনতা, উড়িষ্যার দেবদেবী ও হিন্দুধর্ম্ম কালাপাহাড়ের আক্রমণে যায় যায় হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুমাত্রেরই সযত্নে রক্ষণীয়। সুধীরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রাণপণে—অকাতরে উড়িষ্যার জন্য পরিশ্রম করিবেন।

পাণ্ডাদলের মধ্যে সুধীরঞ্জনের অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে। যাজপুরে তাঁহার যশ প্রচারিত হইয়াছে। রাজপুরীতে ও রাজদুর্গে তাঁহার রণকৌশলের পরীক্ষা হইয়াছে। তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও নির্ভীকতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার চরিত্র ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষিত হইয়াছে। তিনি মুকুন্দদেবের সেনাপতিত্ব পদ পাইয়াছেন।

সুধীরঞ্জন পুরীধাম এবং রাজা মুকুন্দদেব রাজপ্রাসাদ ও রাজদুর্গ রক্ষা করিতেছেন।

সুধীরঞ্জনের যশ উড়িষ্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। পাণ্ডাগণ হাটে, বাজারে ও মেলাক্ষেত্রে, যেখানে যে ভাবে জন সমাগম হইতেছে, উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া দেশীয় লোকদিগকে স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছেন। তাঁহারা সকল স্থানেই সুধীরঞ্জনের বীরত্ব, শূরত্ব, বিশ্বস্ততা ও রণকুশলতার প্রশংসা করিয়া স্বধর্ম্মানুরাগের কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে-ছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—ধর্ম্মই লোকের প্রাণ,—ধর্ম্মই লোক-সমাজের বন্ধন রজ্জু। উৎকলের যে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উন্নতি হইয়াছে, শ্রীমন্দির ও ত্রিমূর্ত্তির উপাসনাই তাহার কারণ। স্বাধীনতা মানব জাতির প্রাণ। স্বাধীনতা বিনা মানবের জীবনও মরণ তুল্য। মণিহারা ফণী যেমন, রূপগুণহীন মানব যেমন, স্বাদহীন খাদ্য যেমন, ভক্তিহীন পূজা যেমন, বিশ্বাসহীন ধর্ম্ম যেমন, স্বাধীনতা বিহীন মানবও তাদৃশ। স্বাধী-নতা না থাকিলে, ধর্ম্ম না থাকিলে আমরা কেন মাংস পিণ্ডের ভার বহন করিয়া মরিব? শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সচ্চরিত্র গঠন, স্বধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি স্বাধীনতা-স্বর্গলতিকার ফলপুষ্প। আমরা স্বাধীনতা হারাইয়া কি মুসলমানের দাস হইয়া থাকিব? স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষা যাবে, শিল্প যাবে ও ধর্ম্ম যাবে, আমাদের কিছুই থাকিবে না। আমরা উদরান্নের জন্য মুসলমান পদলেহী কুকুর হইব। আমরা কি মানবীয় মনোবৃত্তি লইয়া এখন ইতর শৃগাল কুকুরাদি জীব বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্যই সমরে নিরস্ত থাকিব? বাজাও, বাজাও, সমরবীণা বঙ্গোপ-সাগর হইতে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, উড়িষ্যার শৈলে শৈলে, উড়িষ্যার বনে বনে এই বীণা শব্দিত হউক। উড়িষ্যা জাগুক। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উড়িষ্যা জাগুক। এ ধন একবার

হারাইলে আর পাইব না—রমণী চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিলে তা আর প্রক্ষালিত হইবে না। আজ আমরা প্রধান ভাস্কর, প্রধান কাংস্যবণিক, প্রধান স্বর্ণবণিক, প্রধান সূত্রধর, প্রধান লবণ প্রস্তুতকারক, আমাদিগের কাল-রাত্রির পরদিন, আমাদিগের স্বাধীনতা সূর্য্যের অস্তগমনের পরদিন, যখন মুসলমানগণ আমাদিগের কার্য্য ও ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তখন রাজার দ্রব্য ফেলিয়া অধম বিজিত কুক্কুরের দ্রব্য কে কিনিবে? তাই বলি জাগ গো, উৎকলবাসিগণ জাগ। শান্তির দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলে, আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই। তোমার দ্বারে বৈরী, তোমার বুকের উপর অরাতি। রে কাপুরুষদল! মাকে মুসলমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, জন্মভূমি মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতে দিয়া, তুচ্ছ পুত্র কলত্র ও সামান্য সঞ্চিত অর্থ লইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইও না। সিংহ হইয়া শৃগাল বৃত্তি অবলম্বন করিও না। তোমাদের সমবেত চেষ্টায় কি না হইবে? একদিকে আমরা দেশের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ, আর অপর দিকে মুসলমানের একদল সৈন্য মাত্র। একটা দেশ এক দল সৈন্যে দলন করিবে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার আর কি আছে? কুঞ্জর-কাননে কতিপয় মাত্র ব্যাঘ্র আসিয়া কি করিতে পারে? তাই বলি, সকলেই মত্ত মাতঙ্গ হও। নিজে জাগ, স্বদেশবাসীকে জাগাও। অসি ধর, অসি ধরাও। আর ক্ষণ বিলম্বের সময় নাই।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের কথা।

কেশ পক্ক হইলে কি হইবে, চর্ম্ম লোল হইলে কি হইবে, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া আসিলে কি হইবে, উপন্যাস উপহার লইয়া পাঠকের নিকট উপনীত হইতে হইলে, প্রেমের কথা কিছু পাড়িতেই হইবে। কঠিনে কোমলে হওয়া চাই। ফুলে যেমন মধু, মালায় যেমন সূত্র, সৌরজগতে যেমন মহাকর্ষণ, সংসারে সেইরূপ প্রেম। প্রেম সংসার-কুসুমের বৃন্ত, পল্লব, রূপ ও মধু। প্রেমে সংসার বাঁধা, সংসারে প্রেম বাঁধা; শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রেম, শিল্পে বাণিজ্যে প্রেম, শিক্ষায় কৃষিকার্য্যে প্রেম, প্রেমেই সর্ব্ব বিষয়ের উৎপত্তি, প্রেমাভাবেই সকল বিষয়ের লয়। সুধীরঞ্জন চক্রধর মিশ্রের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন। আপনারা চক্রধরের ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর সহিত পরিচিত আছেন। আপনারা যে খুকীকে দেখিয়াছেন, তাহার ভাল নাম সুভদ্রা; চক্রধরের ভগিনীপতির নাম হলায়ুধ। সুভদ্রা বাঙ্গালী যুবকদ্বয়ের পরিচয় পাইল। সে গৃহে যাইয়াই সেই বাঙ্গালী বালিকাকে বলিল—"দিদি! যে দুইটি যাত্রী এসেছে, সে তোদের দেশের।"

দেশের কথা শুনিয়া বাঙ্গালী বালিকার প্রাণ কাঁদিল। বাঙ্গালী

বালিকার নাম জগদম্বা। জগদম্বার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, জগদম্বা ফুট-নোন্মুখ গোলাপ বা মল্লিকা। আমরা একে একে এই উপন্যাসে অনেক রমণীকে দেখাইয়াছি,তন্মধ্যে কাহারও রূপ অঙ্কন করিতে চেষ্টা করি নাই। নজিরণ রূপসী, আমিরণ সুন্দরী, যোগমায়া রূপবতী, একথা সত্য। ইহাঁরা সকলেই যৌবন বন্যার ভাদ্র মাস, ইহাঁদের রূপ ভাদ্রের নদীর জলের ন্যায় শরীর ছাপিয়া চারিদিকে নদীর জল ছুটার ন্যায় ছুটিয়া পড়িতেছে। জগদম্বা সেরূপ রূপবতী নহেন। তিনি যৌবন বন্যার প্রথম শ্রাবণ। তাঁহার রূপ-নদীর জল বাড়িতেছে—স্রোতে বহিতেছে, তীরের আবর্জ্জনা রাশি বেগে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। জগদম্বা দীনের বাড়ীর সরস্বতী মূর্ত্তি। সাজ নাই, সজ্জা নাই, পূজার আড়ম্বর নাই। এক কোণে একটি ফুলে দীনের গৃহে পূজিত হইয়া আছেন, তথাপি যেন সেই গৃহ আলো করিয়া আছেন। ইনি তাড়িতালোক নহেন—ইহাঁর রূপ স্নিগ্ধ বর্ত্তিকালোক। ইহার মুখ লম্বা নহে, গোল নহে অথচ লম্বায় গোলে মিশান একরূপ অপূর্ব্ব মুখ। ইহাঁর চক্ষু উত্তম; নাসিকা উত্তম; ওষ্ঠাধর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতুলনীয়। পাঠক! যাহার রূপ বড় ভাল দেখিয়াছেন, যাহার রূপে যত মুগ্ধ হইয়াছেন, জগোকে সেইরূপ রূপবতী মনে করিয়া লউন। জগো সুভোর নিকট স্বদেশীয় লোকের কথা শুনিয়া তাঁহাদের পরিচয় জানিতে অভিলাষী হইল।

চক্রধরের সহিত সুধীরঞ্জনের অনেক কথা হইল। প্রথমে রাজার কথা, তার পর পাণ্ডাদিগের ঘরের কথা, তার পর পুরীর প্রত্যেক গৃহস্থের কথা ও পরে উড়িষ্যা দেশের কথা। একথা প্রসঙ্গেও বাঙ্গালী মেয়ে জগোর কথা সুধীরঞ্জন শুনিয়াছেন। সুভোর মুখেও বাঙ্গালী বালিকার পরিচয় সুধীরঞ্জন পাইয়াছিলেন।

একদিন ঘটনা চক্রে সুভো ও জগোর সহিত সুধীরঞ্জনের দেখা হইল।

সুধীরঞ্জন সুভোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভো! এই বুঝি সেই বাঙ্গালী বালিকা জগদম্বা?"

সুভো—আজ্ঞে হাঁ।

সুধীরঞ্জন তৎপরে সরলভাবে জগোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কত দিন এদেশে? তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

জগো বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিল—"আমি পাঁচ বৎসর এদেশে। বাড়ী নবদ্বীপে।"

এইরূপ একদিন, দুদিন করিয়া জগদম্বার সহিত সুধীরঞ্জনের দেখা হইল। একটু একটু করিয়া কত কথা হইল। উভয়ের পরিচয় হইল। উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইতে লাগিল, দেশে যাইবার জল্পনা কল্পনা কতরূপই চলিতে লাগিল। সুধীরঞ্জন ধর্ম্মব্রতে ব্রতী—পুরী-রক্ষার ধর্ম্মব্রত উদ্‌যাপিত হইলেই গৃহে যাইবেন। জগোর সহিত সুভো আসিত এবং চক্রধর সুধীর নিকটে থাকিতেন। সুধী চক্রধরের দিকে চাহিয়া এবং জগো সুভোর দিকে চাহিয়া পরস্পর কথা কহিতেন। সুধীরঞ্জনের যশশ্চকিরণেন্দ্রমার বিমল উৎকল উদ্ভাসিত হইল। জগদম্বার লজ্জাশীলতা, শিল্পনিপুণতা, শিক্ষা ও দেবভক্তির কথা সুধীরঞ্জন জানিলেন ও শুনিলেন। উভয়ের হৃদয়ে কি কাল কীট প্রবেশ করিল। আর সুধী ও জগো পরস্পর এরূপ ভাবে কথা কহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। জগোর ইচ্ছা সুভোকে চুরি করিয়া সুধীকে দুই একবার দেখিয়া লইবেন। সুধীর ইচ্ছাও চক্রধরকে ভাঁড়াইয়া জগোর দেবীমূর্ত্তি একবার মনের সহিত দেখিয়া লইবেন। এখন জগোর ইচ্ছা সুধীকে দেখেন ও সুধীর ইচ্ছা জগোকে দেখেন, কিন্তু এদেখাদেখির পথে লজ্জা বিষম অন্তরায় হইল। এখন শয়নে স্বপনে জগো সুধীরঞ্জনকে দেখিতে লাগিলেন; সুধীরঞ্জনেরও ঠিক ঐ দশা। আর একটি কথাও বলিব? এখন উভয়েরই ইচ্ছা

সমস্ত জগতের অগোচরে উভয়ে পরস্পর দর্শন ও আলাপ করিয়া তৃপ্তি-লাভ করেন। ইহারা কি এক দেশীয় লোক বলিয়া ইহাদের মনের ভাব এইরূপ? না গৃহে যাইবার ব্যাকুলতায় পরস্পর এইরূপ করে?

অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, কালাপাহাড় গোপনে এক দল সৈন্য যাজপুরের অভিমুখে পাঠাইয়াছেন। রাজা মুকুন্দদেব জানিতেন, কালাপাহাড়ের পুরীতে আসিতে দুই দিন বিলম্ব হইবে, কিন্তু অদ্য রজনী-যোগেই যাজপুরের প্রাসাদ ও দুর্গ আক্রান্ত হইবে। এই সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে পুরীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সুধীরঞ্জন দুই সহস্র সৈন্য পুরীর রক্ষার নিমিত্ত রাখিয়া চারি সহস্র সৈন্য লইয়া যাজপুরে যাইবেন স্থির হইল। সুধীর ইচ্ছা জগোকে একবার দেখিয়া যান; আর জগোরও ইচ্ছা সুধীকে এই সময়ে একবার দেখেন। ছি জগো! ছি সুধী! এ শুভকার্য্যের সময়ে দেখাদেখির আশা কেন?

সুধী চারি সহস্র সৈন্য লইয়া অশ্বারোহণে যাজপুরে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডাগণ আশীর্ব্বাদী পুষ্পমালা তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন! রমণীদল মঙ্গলসূচক উলু ও শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া সমগ্র বীরগণের উপর চন্দন চর্চ্চিত শ্বেত পুষ্প বর্ষণ করিলেন। যাত্রাকালে হলায়ুধ মিশ্রের বাতায়ন-পথে সুধীরঞ্জন একখানি অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিলেন। সুধীর মুখও সে মুখ দর্শনে অশ্রুপ্লাবিত হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইলে বাতায়নস্থ মুখ খানি নত হইল ও সুধীর মুখ আকাশের দিকে স্থাপিত হইল। অশ্বারোহী সেনাপতি বাতায়নের রমণীকে আশ্বাসদানার্থ ও সহ যাত্রি গণের উৎসাবর্দ্ধ-নার্থ বলিলেন—"আমাদের জয় হ'বে। বল, জয় জগন্নাথ জি কি জয়।"

অশ্বারোহিগণ নক্ষত্র বেগে ছুটিল। বাতায়নের বালিকার অশ্রুধারা খরবেগে প্রবাহিত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরীর যুদ্ধ।

"আল্লা, আল্লা, আল্লা-য়া-য়া-য়া।" শ্রীমন্দিরের মধ্যে ও সম্মুখে পাণ্ডাগণ যুক্তকরে, ঊষা-সময়ে, যখন জগন্নাথের স্তব করিতেছিলেন, তখন সমুদ্রতীরে ঐ লোমহর্ষণ ধ্বনি উঠিল। অবিলম্বে দূত আসিয়া জানাইল, কালাপাহাড় অদ্য রজনীতে অমানুষিক ক্ষিপ্রতার সহিত পুরীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সমুদ্রতীর সৈন্যে আকীর্ণ। পাঠানের রক্তবর্ণের পতাকা সকল প্রভাত-বায়ুতে পত্ পত্ শব্দে উড্ডীন হইতেছে। সেনাপতি কালাপাহাড় সমর-সজ্জা করিতেছেন। হলায়ুধ মিশ্র চক্রধরকে ডাকিয়া বলিলেন—"চক্রধর আর উপায় নাই। সেনাপতি অনুপস্থিত। যুদ্ধবাদ্য বাজাইতে দেও। পুরীবাসী যাহার যে অস্ত্র থাকে, লইয়া যুদ্ধে বাহির হউক।"

ফেনায়মান অশ্বপৃষ্ঠে রক্তাক্তশরীরে সেনাপতি সুধীরঞ্জন হতাবশিষ্ট দেড় সহস্র সৈন্য লইয়া পুরীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হলায়ুধ

বিস্মিত অথচ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন——"সেনাপতি! রাজপুরের সংবাদ কি?"

সুধীরঞ্জন বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আমি রাজপুর দুর্গে পৌঁছিবামাত্র—সকলে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই মুসলমান সেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। রাজা স্বয়ং রাজপ্রাসাদ ও আমি দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করি। বহুক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হয়। অবশেষে মৃত্যু নির্দ্ধারিত জানিয়া আমি হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়াছি। রাজা প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইয়াছেন। অশুভের মধ্যে শুভ সংবাদ এই যে, কুল-ললনাগণ নিরাপদে আছেন। আর কালবিলম্বের সময় নাই। মুসলমান সৈনিক শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-দ্বারে।"

পুরীবাসী সকলেই যে যে অস্ত্র পাইল, সে তাহা লইয়াই শ্রীমন্দিরের প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বীরগণ আশীর্ব্বাদী মাল্য ও পুষ্প সকল ধারণ করিলেন। পক্ককেশ লোলচর্ম্ম হলায়ুধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন। চক্রধরও অস্ত্র লইলেন। সে দিন পুরীতে এমন লোক থাকিল না যে, অস্ত্র লইয়া শ্রীমন্দিরের দিকে ধাবিত না হইল। হিন্দু বীরগণ জগন্নাথের চরণে প্রণত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া উদীয়মান দিবাকরকে প্রণাম পূর্ব্বক সমস্বরে বলিল—"জয়! জগন্নাথ জি কি জয়! জয় বলরাম জি কি জয়! জয় সুভদ্রামায়ী কি জয়!"

এই জয়নাদের প্রত্যুত্তরে পুরী মন্দিরের বাহিরে আল্লা, আল্লা রবের সহিত সমুদ্রের জল কম্পিত করিয়া,—পুরীমন্দির কম্পিত করিয়া—মুসলমানের কামানের ধ্বনি হইল। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল।

পুরীর প্রাচীর দ্বার এক তোপ সহ্য করিল। দ্বিতীয় তোপ প্রাচীর দ্বার ফাটাইল, তৃতীয় তোপে দ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। দ্বারে ঘোর সংগ্রাম বাধিল। দ্বারভঙ্গচ্ছলে মৃত্যু যেন মুখ ব্যাদান করিয়া

দাঁড়াইল। দ্বারের সম্মুখে রাশি রাশি শ্মশ্রুল মুসলমান ও [illegible]
ধারী হিন্দুর শব স্তূপীকৃত হইল। এক বার, দুইবার করিয়া ব[illegible]
হিন্দুগণ মুসলমানের আক্রমণ সহ্য করিল। শেষবারে মুসলমান
তীরবেগে প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বীরে বীরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিল
দলে দলে গোলমালে যুদ্ধ বাধিল। কালাপাহাড় ও সুধীরঞ্জন ঘোর
আহবে প্রমত্ত হইলেন। উভয়ের অসির সুন্দর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। উভয়ের
উজ্জ্বল অসি সূর্য্যালোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইল।
পরস্পরের অসির আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। পরস্পরের
অসিচালনার কৌশলে বোধ হইতে লাগিল, প্রত্যেক আঘাতেই প্রত্যে-
কের বিনাশ নিশ্চিত, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুধীরঞ্জনের অসি ভগ্ন হইয়া
গেল। অন্য বীর সুধীরঞ্জনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ অসি আনিয়া দিল। এই
অবকাশে কালাপাহাড় সুধীরঞ্জনের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিলেন।
হঠাৎ কি ভাবিলেন! তিনি সুধীরঞ্জনের নব অসির বেগ নিবারণ করিয়া
বলিলেন—"থাম, তোমার সহিত আমি আর যুদ্ধ করিব না।"

সুধীরঞ্জন বলিলেন—"তোমার এ দুর্দ্দমনীয় অসিবেগ কে সহ্য
করিবে?"

কাপা। আমি আর যুদ্ধ করিবনা। [illegible]ার

ইত্যবসরে মুসলমান সৈন্যগণ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল। মুসল[illegible]াহাড়
রক্ত পতাকা শ্রীমন্দিরের উপরি উড়াইয়া দিল। জগন্নাথমূর্ত্তি হস্ত[illegible] লুণ্ঠন
করিল। বিজয় কার্য্য শেষ হইয়া গেল। 'আল্লাহো আকবর' [illegible]ত না
দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। কাহার অজ্ঞাত বল্লমাঘাতে যুদ্ধা[illegible]চার ও
কালাপাহাড়ের বাম বাহুমূল বিদ্ধ হইল। যুদ্ধে অনেক পাণ্ডা হ[illegible]ও উপর
আহত হইল। তন্মধ্যে হলায়ুধ মিশ্রের নিধন উল্লেখযোগ্য।

[illegible]নের সঙ্গে সঙ্গে সমর-বিজয়ী মুসলমান অনীকিনী হইলেন।

মত্ত হইয়া জয়ের চিহ্ন স্বরূপ জগন্নাথমূর্ত্তি মস্তকে গ্রহণ করিয়া আল্লা রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলিত-সৈকত-পুলিন-বিরা-চিল্কা হ্রদের দিকে প্রধাবিত হইল। পুরীতে ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল। আজ উড়িষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য্য, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অস্তগমন করিল। আজ হিন্দু স্বাধীন রাজবংশের নাম উড়িষ্যা হইতে বিলুপ্ত হইল। দেব দেব জগন্নাথ—উড়িষ্যার দেবতা—হিন্দুর দেবতা—অপহৃত হইলেন। পুরীবাসিনী অবলাকুলের ক্রন্দনে আজ পুরীগগন কম্পিত হইতে লাগিল। এই ঘোর আহবে কাহার পিতা মরিয়াছে, কাহার স্বামী মরিয়াছে, কাহার পুত্র মরিয়াছে, কাহার ভ্রাতা মরিয়াছে, কাহার পৌত্র মরিয়াছে, কাহার দৌহিত্র মরিয়াছে, কাহার বিভিন্ন সম্পর্কের দুইজন মরিয়াছে, কাহারও বা নানা সম্পর্কের কতজন মরিয়াছে, উড়িয়া ললনাগণ কেন কাঁদিবে না? স্বজনের শোক, স্বাধীনতার শোক, দেবনাশের শোক ও সর্ব্বোপরি জাতি, ধর্ম্ম, কুল ও মাননাশের আশঙ্কা। নিরীহ উড়িয়া অবলাগণ কাঁদ, উচ্চরবে কাঁদ। বাঙ্গালী ললনাগণ তোমাদের সহিত স্বর মিলাইয়া কাঁদুক।

দিন! তুমি শেষ হইওনা—রজনি! তুমি আসিও না। দিন তুমি শেষ হইলে উড়িষ্যার স্বাধীনতার দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। উড়িষ্যার শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য যাইবে। অন্নাভাবে উড়িয়াবাসী হাহাকার করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাত্যভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন ক্ষয় করিবে! দরিদ্রতা উৎকলবাসীর অলঙ্কার হইবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ক্রমেই পড়িবে।

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চিল্কাতটে।

নবদ্বীপের অগ্নিকাণ্ডের পর হইতে সেনাপতি কালাপাহাড় তাঁহার সৈনিকদলের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহার বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন স্থান দগ্ধ করা হইবে না, বা স্ত্রীলোক, বালক বা বালিকার উপর কোন অত্যাচার করা হইবে না এবং কোন গ্রাম বা নগর লুণ্ঠন করা হইবে না। যাহারা এই স্থায়ী-নিষেধ-আজ্ঞা সত্বে আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে শূলে দেওয়া হইবে। কালাপাহাড় কখনও স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকার প্রতি অত্যাচার এবং নগর লুণ্ঠন করিতে অনুমতি দেন নাই। পূর্ব্বে বিশেষ কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত না থাকায় পাঠান সৈনিকেরা গোপনে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ও গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন করিত। যাজপুর ও পুরীর যুদ্ধের পর কাহারও উপর অত্যাচার ও নগর লুণ্ঠনাদি ক্রিয়া হইল না।

পুরীর যুদ্ধে সুধীরঞ্জন, চক্রধর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি বন্দী হইলেন।

যুদ্ধান্তে বন্দী লইয়া যখন মুসলমান সৈনিকগণ চিল্কা হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন একটি হাবিলদার সহস্র সৈন্যের সহিত পুরীর সমুদ্র তীরস্থিত পটমণ্ডপাদি লইবার জন্য কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করিল।

যুদ্ধান্তে মুসলমান বাহিনী শ্রীমন্দিরের প্রাচীরের মধ্য হইতে চলিয়া গেলে পুরীর কুল-ললনাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হত ও আহত স্বজনের অনুসন্ধান ও সৎকারের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরের নিকট আসিলেন। হলায়ুধের-সহধর্ম্মিণী ও কন্যার সহিত জগদম্বাও সেই প্রাচীরের মধ্যে আসিয়াছিল। অন্য অবলাগণ রোরুদ্যমানাবস্থায় হত ও আহত স্বজন লইয়া শোকবিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জগদম্বা প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। সে নির্নিমেষ-নয়নে হতাশ-প্রাণে অসীম সাহসে কি যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার মূর্ত্তি স্থিরা, গম্ভীরা চক্ষুও পলকশূন্য। যে সকল যবন-সৈন্য সমুদ্রের তীরে ছিল, তাহারা চিল্কা হ্রদাভিমুখে গমনকালে মনে করিল, হিন্দুদিগের দেবমন্দিরে বহু অর্থ প্রোথিত থাকে। তাহারা শ্রীমন্দির খনন করিয়া যাইবার মানস করিল।

আকাশ পরিষ্কৃত। সপ্তমীর অর্দ্ধ বৃত্তাকার চন্দ্রমার রজত ধবল কিরণ-মালায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত হইয়াছে! প্রবল বায়ু প্রবহমাণ হওয়ায় সমুদ্রের জল-কল্লোল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সৈনিকগণ শ্রীমন্দির খনন করিয়া কিছুই পাইল না। সমরক্ষেত্রে মৃত শবের মধ্যে এক অনিন্দনীয়া রূপসী দেববালার ন্যায় এক বালিকাকে পাইল। তাহারা ভাবিল; সেনাপতি সাহেব এক হিন্দু রমণীর বিয়োগে অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন, যদি এই রমণী রত্নের সহিত সেনাপতির পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে, হয়ত সেনাপতি সাহেব আবার স্থিরচিত্ত ও সুখী হইতে পারেন। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সেই দেববালিকাকে মাতঙ্গের পৃষ্ঠোপরি এক সুন্দর হাওদায় বসাইয়া দিয়া চিল্কাভিমুখে যাত্রা করিল।

হরদেব ন্যায়রত্ন এক বস্ত্রাবাসে হিন্দুভাবে অবস্থান করিতেছেন। সেনাপতির বৃহৎ পটমণ্ডপ ছাউনির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং তাহার উপরে সর্ব্বাপেক্ষা রক্তবর্ণ পাঠান পতাকা সর্ব্বপতাকার উপরে বায়ুভরে পত্ পত্ করিতেছে। শত শত বস্ত্রাবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। পদানুসারে সৈনিক, সেনানায়ক, আহারদাতা, পাচক, বাহক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পটমণ্ডপ পাইয়াছে। বন্দিগণের জন্যও কতকগুলি বস্ত্রাবাস নির্দ্দিষ্ট আছে। এক পটমণ্ডপে সেনাপতির বিশেষ বন্দোবস্তে সুধীরঞ্জন সুন্দর শয্যা, ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হিন্দু খাদ্য, সুশীতল পানীয় পাইয়াছেন। বন্দীর কি আহার নিদ্রা আছে? তাঁহার সম্মুখে চিন্তার পারাবার। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে যুগপৎ জল্লাদের অসি ও জগদম্বার অশ্রুপূর্ণ মুখখানি দেখিতেছেন।

হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র তীর আসিয়া সুধীরঞ্জনের বস্ত্রাবাসের আলোক নিবাইল। অনতিবিলম্বেই, কি জানি কি একটি বস্তু কেহ আনিয়া চপ্ করিয়া তাঁহার গৃহে ফেলিয়া গেল। তিনি বন্দী হইলেও তাঁহার হাতে পায়ে বেড়ী ছিল না। তিনি শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, তাঁহার গৃহে এক অচৈতন্য রমণী মূর্ত্তি। কিয়ৎক্ষণপরে এক-জন সৈনিক প্রহরী আসিয়া সেনাপতির আদেশানুসারে তাঁহার সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

তিনি তাহার নিকট একটি আলোক প্রার্থনা করিলেন। সে চকমকি পাথর ঠুকিয়া দেশীয় দেশলাইয়ের যোগে দীপ জ্বালিয়া দিল। সুধীরঞ্জন প্রহরীর সাহায্যে সেই অচৈতন্য বালিকাকে শয্যার উপর উঠাইলেন। প্রহরী কোন কথা বলিলনা। সুধীরঞ্জন তাহাকে শীতল জল আনিতে বলিলেন।

সুধীরঞ্জন বালিকাকে দেখিবামাত্র সিহরিয়া উঠিলেন। এই বালিকা জগদম্বা, হিন্দু প্রহরী জল আনিয়া দিল। সুধীরঞ্জন বালিকার চখে মুখে

জল সেচন করিলেন ও সদয় হিন্দু প্রহরী তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল। বিজ্ঞতম হিন্দু প্রহরী বুঝিল, অচৈতন্যা বালিকার আহারের প্রয়োজন।

প্রহরী সত্বর গতিতে দুগ্ধ লইয়া আসিল। দুগ্ধ দিয়া প্রহরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। সুধীরঞ্জন তাহাকে ধীরে ধীরে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। বালিকা একটু একটু জল ও দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিতে করিতে অচৈতন্যাবস্থায় বলিল—"যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তাঁহার অনুসন্ধান পাইলাম না, তখন নিশ্চয় তিনি বন্দী। আমি মুসলমান সৈনিকের সহিত যাব, সেখানে আর এক বার তাঁহার দেখা পেলেও পেতে পারি।

রজনী শেষে বালিকার চৈতন্য আসিল, সে বার বার সুধীরঞ্জনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে বলিল—"আমি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত অবস্থায় এখানে আছি?"

সুধীরঞ্জন উত্তর করিলেন—"তুমি সারা রাত অচৈতন্য ছিলে। তোমাকে অচৈতন্য অবস্থায় কে আমার ঘরে ফেলিয়া যায়। আমি এক প্রহরীর সাহায্যে শুশ্রূষা করায় তুমি শেষ রাত্রিতে একটু নড়িতে চড়িতে ছিলে। একথা তুমি সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছিনা।"

এই সময়ে সেই উপকারী হিন্দু প্রহরী আসিল। সে বালিকার অবস্থা ভাল দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। সে বলিল—"আমি সৈন্য দলে জানিয়া আসিয়াছি, এই বালিকা একাকিনী নির্ভীকচিত্তে শ্রীমন্দিরের প্রাচীর মধ্যে মড়া শব অনুসন্ধান করিতেছিল; ইহার রূপ দেখিয়া সৈনিকেরা সেনাপতির সহিত ইহার বিবাহ দিবার জন্য আনে। হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর উঠাইয়া দিবামাত্র বালিকা অজ্ঞান হয়। এস্থানে আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সৈনিকগণ ভীত হয়। সৈনিকগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল, সেনাপতির বিনা অনুমতিতে হিন্দু

বালিকা আনা ভাল হয় নাই এবং তাহার অজ্ঞান অবস্থা হইতে আরও অমঙ্গল হইতে পারে। হিন্দু বন্দীর গৃহে হিন্দু বালিকা রক্ষা করাই ভাল, এই বিবেচনা করিয়া তাহারা আপনার ঘর অন্ধকার করিয়া এই সংজ্ঞাশূন্য বালিকাকে ফেলিয়া গিয়াছে।”

সুধীরঞ্জন সৈনিকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বালিকা সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও সুধীরঞ্জনের নিকট হইতে একটু সরিয়া গেলেন।

অন্য বস্ত্রাবাসে হরদেব ন্যায়রত্ন ও বিষার মহন্তী নানা কথায় রজনী যাপন করিয়াছেন। মহন্তী জগন্নাথ মূর্ত্তি লাভের মানসে মুসলমান সৈন্যের অনুগমন করেন। নিম্বকাষ্ঠের জগন্নাথ যখন জ্বলিয়া উঠেন, কালাপাহাড়ের আদেশে জগন্নাথে যখন অগ্নি সংযোগ করা হয়, মহন্তী তখন কাঁদিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া অগ্নিতে ঝাঁপদিতে প্রস্তুত হন। হরদেব মহন্তীর প্রমুখাৎ জগন্নাথ দগ্ধ হইতেছেন জানিয়া সেনাপতির নিকট জগন্নাথ ভিক্ষা চাহেন এবং জলসেচনে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথ রক্ষা করেন। মহন্তীর মুখে হরদেব কন্যার অনুসন্ধান পাইয়াছেন। সেনাপতির অনুমত্যানুসারে প্রত্যূষে হরদেব, মহন্তী ও কয়েকজন সৈন্য লইয়া তনয়া জগদম্বার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন স্থির করিয়াছেন। সমস্ত রজনী হরদেব মহন্তীর নিকটে তনয়ার অনুসন্ধান লইয়াছেন ও কাঁদিয়া যামিনী শেষ করিয়াছেন।

প্রভাতে হরদেব ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া মহন্তী ও কতিপয় সৈনিকের সহিত পুরীর অভিমুখে তনয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অকস্মাৎ রোদন ধ্বনিতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সে রোদনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে রোদনস্বরও যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ন্যায়রত্ন রোদনের কারণ জানিয়া,—কে কেন কাঁদিতেছে জানিয়া—পুরী যাইতে অভিলাষী হইলেন।

সুধী। স্বদেশবৈরী মুসলমানকে অন্তরের সহিত ঘৃণাকরি।

কালাপাহাড় সেইরূপ কম্পিত স্বরে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"যদি তোমার পরমাত্মীয়, এমন কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুসলমান হন?"

এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সুধীরঞ্জন সেনাপতির মুখের দিকে চাহিলেন। স্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া বস্ত্র সরাইয়া পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"দাদা! দাদা!! তুমিই আমার দাদা! যে দাদার চরণ দশবৎসর বন্দনা করিনাই, সেই দাদা—আমার পরমপূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! যে দিন দুই ভাই কাজির অত্যাচারে নিশীথে ঘর দ্বার ছাড়িয়া বন্যপথে বাহির হই, সেদিন আমার কষ্টে দুঃখিত হইয়া যিনি নিয়ত কাঁন্দিয়াছিলেন, সেই দাদা! যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেছি, যিনি আমায় পাঠ দিয়া পরম প্রীতি লাভ করেছেন, সেই দাদা! যিনি কোন খাদ্যদ্রব্য মুখে ভাল লাগিলে নিজে না খাইয়া আমার মুখে তুলিয়া দিয়া, সুখী হইয়াছেন, সেই দাদা! যিনি দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, দেশহিতে অনুরক্ত, দেশের কল্যাণসাধন যাঁর জীবনব্রত, সেই দাদা! মুসলমান-বিদ্বেষে যাঁহার হৃদয়পূর্ণ, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত, সেই দাদা! যে দাদা আমার দুঃখে দুঃখী, আমার সুখে সুখী, আমার আশায় আশান্বিত আমার উন্নতিতে পরিতুষ্ট, সেই দাদা! পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় আমি যাঁহাতে পিতামাতার বাৎসল্য স্নেহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদর সোহাগ, অধ্যাপক গুরুর শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়াছি সেই দাদা! দাদা! আমি আর মুসলমানকে ঘৃণা করি না। তুমি আমি দুই নহি। তোমার ধর্ম্মও যাহা, আমার ধর্ম্মও তাহাই। তুমি যাহা ভাল মনে করেছ, আমার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ। তুমি অবশ্যই

হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্টত্ব ও মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝেছ, তাই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। আমার ততদূর বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি তোমার প্রসাদ খাইব, তোমার চরণ বন্দনা করিব।"

কালাপাহাড় উৎসাহের সহিত উঠিয়া বসিলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাই সুধী ক্ষান্ত হও। আমার কাল নিকটে। সমগ্র জগৎ আমায় ঘৃণাকরে করুক, আমি মনের কথা তোমায় বলিয়া যাইব। তুমি আমায় ঘৃণা করিও না। আমি রূপের মোহে—ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বে মুসলমান হই নাই। আমি হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার দেখিয়া, হিন্দুর এরূপ হীন—জীবন-হীন—শৃঙ্খলা হীন অসাড় অবস্থা দেখিয়া হিন্দুকে জাগাইবার জন্য, হিন্দু সমাজে নূতন জীবন আনিবার জন্য, হিন্দু পীড়নকারী মুসলমান হইয়াছি। মুসলমানের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য, মুসলমান কামিনীর পাণি-পীড়ন করিয়াছি। প্রেমময়ী যোগমায়াকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে তাহাকে হারাইয়াছি। ভাই! অনুতাপ, অনুতাপ, অনুতাপ তুষানলে—"

সুধীরঞ্জন দেখিলেন, নিরঞ্জনের বাম বাহুমূল হইতে খরবেগে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন এই কারণেই নিরঞ্জন কাতর এবং এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন আমার কাল নিকটে। তিনি দাদাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিকটস্থ বনে প্রবেশ করিলেন ও অবিলম্বে কতকগুলি পত্র লইয়া আসিলেন। কিছু পত্রের-রস ক্ষত স্থানে দিলেন, কিছু পত্রের রস নিরঞ্জনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাওয়াইলেন। রুধিরপাত বন্ধ হইল। দুই ভ্রাতায় কত কথা হইল। জ্যেষ্ঠের অনুতাপ ও কনিষ্ঠের আক্ষেপে পটমণ্ডপ পূর্ণ হইল।

অনতিবিলম্বে হরদেব,, জগদম্বা, বিযায় মহান্তী, চক্রধর, প্রভৃতি সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। পুরীর বন্দিগণ মুক্তি পাইলেন। জগদম্বার সহিত সুধীরঞ্জনের বিবাহ স্থির করিয়া দিয়া হরদেবের সত্বর

গৃহে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। সেই দিনই হরদেব, সুধীরঞ্জন, জগদম্বা প্রভৃতি পুরী যাত্রা করিলেন। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহারা দেশে যাইবেন। পরে হোসেনের সহিত নির্জ্জনে অনেক পরামর্শ হইল। উৎকল মুসলমান পদে বিদলিত হইল। উৎকলের স্বাধীনতা-রবি মুসলমানের অধীনতারূপ চির রাহু গ্রাসে পতিত হইল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধান্তে পুরী।

পুরী বিষাদ-কালিমায় কলঙ্কিত। পুরীর প্রত্যেক গৃহে রোদন ও আর্ত্তনাদ, শোকে সকল পরিবার সন্তপ্ত! যুদ্ধে হলায়ুধ মিশ্র মরিয়াছেন। যুদ্ধান্তে জগদম্বার কি হইল, কোন অনুসন্ধান নাই। হলায়ুধের পত্নী স্বামী ও কন্যা হারাইয়াছেন। সুভদ্রা পিতা ও সখী হারাইয়াছে। মাতা ও কন্যা উভয়ে নিজ গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছেন। ইহাঁদিগের প্রথম শোকে চীৎকার বা আর্ত্তনাদ নাই। মাতা কন্যা নীরব। উভয়ের চক্ষু দিয়া ফোটায় ফোটায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

চক্রধরের গৃহেও হাহাকার। চক্রধরের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন চক্রধর বন্দী হইয়াছেন। বন্দীর পরিণাম যুদ্ধে হত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। চক্রধরের গৃহেও সকলে সমবেত

হইয়া ঐরূপে রোদন করিতেছেন। প্রতিগৃহে এইরূপ শোক ও মর্ম্ম-পীড়া।

যখন পুরী সহরের প্রতিগৃহ এইরূপ শোক ও তাপপূর্ণ, তখন হঠাৎ সহরের বাহিরে বহু কণ্ঠবিনিঃসৃত শব্দ উঠিল—"জয়, জগন্নাথ জি কি জয়!" প্রথমে কি শব্দ হইতেছে কেহ বুঝিতে পারিলেন না—পুরীর উপকণ্ঠে কেবল গোল শ্রুত হইতে লাগিল। কেহ ভাবিলেন, আবার বুঝি মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বাধিল। কেহ ভাবিলেন, মায়াযুদ্ধকারী কূটযোদ্ধা কালাপাহাড়ের এই বা কোন কূটযুদ্ধ হইবে। ক্রমে জগন্নাথদেবের জয় শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। পুরীর প্রায় সাতশত বন্দী শ্রীমন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইল। আবার অর্দ্ধ দগ্ধ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরে স্থাপিত হইল। মুসলমানের শব সমবেত করিয়া সমাধিস্থ করা হইল। হিন্দুর শব পূর্ব্বেই সৎকার করা হইয়াছিল। মৃত অশ্বাদি পশুও ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। মৃতা পুরীর আবার যেন সামান্য সংজ্ঞালাভ হইল।

হলায়ুধ মিশ্রের দ্বারে একখানা শিবিকা আসিল। উড়িয়া বাহকেরা হুঁ হুঁ শব্দ হইতে বিরত হইয়া বাড়ীর বহির্দ্বারে শিবিকা রাখিল। হলায়ুধের পত্নী ও কন্যা ধীরে ধীরে শিবিকার নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শিবিকায় জগদম্বা ও তাঁহার সহিত একজন পকেশ দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জগদম্বাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী উচ্চরবে কাঁদিয়া বলিলেন—"মা! তুই কোথায় ছিলি? তোরে পাব আর আশা করি নাই। কর্ত্তা আর ইহ সংসারে নাই। তাঁহার শব যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে। আমি নিজেই তাঁহার সৎকার করিয়াছি। হায় হায়! আমাদের কি উপায় হবে। কর্ত্তা থাকিতে কেন আমি মরিলাম না! সুভদ্রার বে' [illegible] দেবে? কর্ত্তার বড় সাধ ছিল ভাল করে সুভদ্রার বে' দিবেন। ও কর্ত্তা! তোমার সুভদ্রাকে ফেলে কোথায় গেলে

যে সুভদ্রাকে পলকে হারাইতে, যে সুভদ্রার ম্লানমুখ দেখিলে অস্থির হ'তে, সেই সুভদ্রা আজ কদিন কেঁদে কেঁদে সারা হ'লো। কর্ত্তা! তুমি জগোকেও বড় ভালবাসিতে। জগো এসেছে। কর্ত্তা! এস গো এসো, জগোকে দেখে যাও।

সুভদ্রাও জগোর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"দিদি! এসেছিস্ আয়, তুই কোথায় ছিলি? বাবা নাই। বাবা যুদ্ধে মরেছেন। তাঁকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। বাবা আর আস্‌বেন না। বাবার কথা আর শুনব না। বাবার আদর সোহাগে আর ভুলব না। দিদি! কে তোকে বাঙ্গালায় নে বে দিবেন? দিদি! তোরও আর দেশে যাওয়া হলো না। এখন আমাদিগকে কে খেতে দিবে, পরতে দিবে, জিজ্ঞাসা কর্‌বে?"

জগদম্বাও খুব কাঁদিলেন। বৃদ্ধ হরদেব ধীর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অয়িত নয়ন হইতে খরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে হরদেব মধুর প্রবোধ বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।

চক্রধরের গৃহেও ঘোর রোদনধ্বনি। চক্রধর ও তাঁহার দুই পুত্র গৃহে আসিলেন। সুধীরঞ্জনও সেই গৃহে গমন করিলেন। চক্রধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দামোদর যুদ্ধে হত হইয়াছেন। চক্রধরের গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আয় দামোদর! বাড়ী আয়। দেখ্ তোর সুধী দাদা এসেছেন। কর্ত্তা এসেছেন। তোর সুধী দাদার নিকটে বেদ শিক্ষা কর। দামোদর! তুই আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলিরে, ? কোথায় গেলি? তুই আমার সংসারের সুখ, গৃহের আলো তোকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া বাঁচিব?

হত দামোদরের যুবতী ভার্য্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"এস গো,

বাড়ী এস। তোমার সেনাপতি দাদা এসেছেন। তুমি যাকে বড় ভাল বাসিতে, বড় সোহাগ করিতে, যাকে ফুল সাজে সাজাতে, আজ তার বিধবা বেশ দেখ।”

এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে যুবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চক্রধর ধীর স্থির ভাবে বলিলেন—“মা, বৌমা কেঁদোনা। গৃহিণি কাঁদ কেন? তোমার পুত্র, পীড়ায় মরে নাই, দুষ্কর্ম্ম করিতে গিয়ে মরে নাই। স্বদেশ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—সম্মুখ সংগ্রামে তাহার মৃত্যু হয়েছে। দামোদর সেনাপতির বামপার্শ্ব থেকে যেরূপ কৌশলে, —যেরূপ বীরত্বে যুদ্ধ করেছে, তাতে উড়িষ্যার গৌরব ও আমার গৌরব প্রকাশ পেয়েছে। এই নশ্বর জগতে মৃত্যু নিশ্চিত। জরা বার্দ্ধক্যে ক্লেশ পাইয়া ও রোগতাপে ভুগিয়া মৃত্যু অপেক্ষা যুদ্ধে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়স্কর। যদি কোন সুখের মৃত্যু থাকে, তবে সে যুদ্ধে মৃত্যু। যদি কোন গৌরবের মৃত্যু থাকে, তবে সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু। যদি কোন উৎসাহের মৃত্যু থাকে, তবে এইরূপ দেশবৈরীর মস্তক ছিন্ন করিতে করিতে মৃত্যু। যদি উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষা হ’ত, তবে আমি ও আমার সকল পুত্র রণে মরিলেও আক্ষেপ ছিল না। আমার মহাগৌরবের বিষয় এই যে, আমি একটি বীর পুত্রকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বলি দিয়াছি। বৌমা, তুমি বীরপত্নী বলিয়া উড়িষ্যায় আদৃত হইবে। গৃহিণি, তুমি বীরপ্রসবিনী বলিয়া সম্মান পাইবে।

সুধীরঞ্জন বলিলেন—“মা! আপনারা কাঁদিবেন না। আমি আমার জীবন এক্ষণে এক বিষম ভার মনে করি ও আমাকে আমি পতিত মনে করি। উৎকলের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলেম না, প্রভু জগন্নাথ আমায় সে গৌরব দিলেন না; আমার মৃত্যু কি সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর

ছিলনা ? আমার ঘৃণিত জীবনে কলঙ্কের ভার বহনের জন্য মুসলমানেরা আমাকে মারিল না, বন্দী করিল। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার অস্ত্র শিক্ষায় ! প্রভু জগন্নাথ ! এই কি তোমার মনে ছিল ? প্রভো ! এ তোমার কোন্ লীলা ? এ উৎকলের বা সমগ্র ভারতের কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ?" এই বলিতে বলিতে সুধীরঞ্জন কাঁদিতে লাগিলেন।

শোকদৃশ্য আর কত দেখাইব ? উৎকলের প্রতিগৃহে এইদশা, হলায়ুধের শ্রাদ্ধ শেষ হইল। হরদেবের ব্যয়ে ও যত্নে প্রাণবল্লভ নামক এক পণ্ডিত যুবকের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইল। এখন জগদম্বা ও সুধীরঞ্জনের দেশে যাইবার দিন আসিল। সে বিদায়ের দিন, কি ক্লেশের দিন ! উৎকলের সর্ব্বজনপ্রিয় মিষ্টভাষী ও উদারচরিত সুধীরঞ্জনের বিদায় ! কন্যা,—মধুরভাষিণী গুণবতী কন্যার বিদায় ! পতি-বিয়োগবিধুরা রমণীর তনয়ার বিদায়। পাঠক ! এই দৃশ্য একবার দেখ ; এই শোকদুঃখ-বিজড়িত, এই শ্বেতকৃষ্ণে মিশ্রিত, এই হরিহর ভাবের দৃশ্য একবার দেখ। আজ হলায়ুধ মিশ্রের গৃহ জনাকীর্ণ—স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা অগণিত।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি সমবেত হইয়া ছল ছল নয়নে সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিল—"সেনাপতি মশায়, তুমি যাবেনা ; তুমি গেলে নাঙ্গা নাঙ্গা ফুল ও সন্দেশ কে দেবে ?"

একটু বড় বালকেরা বলিল—"আপনি যাবেন না। আপনি গেলে কে আমাদের যুদ্ধ খেলা শিখাবে ? কে আমাদের খেলার কাছে বসে থাকবে ? কে আমাদের ঝগড়া গোলমাল মিটাবে ? কে আমাদিগকে সন্দেশ কিনে খাওয়াবে ?"

উড়িষ্যাবাসী নরনারীগণ সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"যাও বাবা, বাড়ী যাও। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাও, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, জগন্নাথ তোমায় চিরসুখী করুন। তুমি

বঙ্গের সুপুত্র, উড়িষ্যার পরমবন্ধু। মানুষে যাহা করিতে পারে, তুমি তাহা করেছ। অল্প সৈন্য, অল্প যুদ্ধোপকরণ লয়ে তুমি যা করেছ, তা যে সে মানুষে পারেনা। তুমি যুদ্ধে মরিতে প্রস্তুত ছিলে, উৎকলের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার জন্য তুমি জীবন উৎসর্গ করেছিলে। মুসলমান সেনাপতি তোমার বীরত্বে ও যুদ্ধকৌশলে তুষ্ট হ'য়ে তোমায় মারেন নাই। আমরা শুনেছি, তোমার সঙ্গে যুক্তি তর্কে প'রে জগন্নাথ ফিরিয়ে দিয়েছে,—আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। এও জগন্নাথের লীলা খেলা, জগন্নাথ অর্দ্ধ পোড়া হ'য়ে পুরীতে থাক্‌লেন, আমরাও স্বাধীনতা হারিয়ে মুসলমানের দাস হ'য়ে থাক্‌লেম—জীবন্মৃত হ'য়ে থাক্‌লেম। যাও, বাবা যাও, বেলা হ'লো।

সুধীরঞ্জন কাঁদিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ও দিকে জগদম্বার প্রতি দৃষ্টি কর। কাঁদিতে কাঁদিতে জগদম্বার আয়ত নয়ন রক্তবর্ণ হইয়াছে, সুন্দর গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, হলায়ুধের বিধবা পত্নী তাহাকে একবার কোলে করিতেছেন, একবার মুখ চুম্বন করিতেছেন, একবার মস্তকের ঘ্রাণ লইতেছেন। বিধবার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা শতধারে পড়িতেছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! যাও, বাড়ী যাও। পতিপুত্র লয়ে সুখী হও, আমার শূন্য ঘরের লক্ষ্মী আজ বিদায় দেই, কর্ত্তার সঙ্গে আমার ঘর ভেঙ্গেছে। এ লক্ষ্মী আর আমি কত দিন ঘরে রাখিব? রাজলক্ষ্মী রাজগৃহে যাও, রাজার ঘর উজ্জ্বল কর।"

সুভদ্রার নয়নযুগলও রক্তবর্ণ ও অশ্রুময়। সে জগদম্বার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক বলিল,—"দিদি! যাও, বাড়ী যাও। সেনাপতি তোমার পতি হবেন, তুমি সুখী হ'বে। দিদি এ অভাগিনীর কথা মনে ক'রো। এ অভাগিনী তোমায় দিদি বলিয়াই জানিত। তুমি তার খেলায় সাথী, তুমি তার শিক্ষাগুরু। দিদি! আর জীবনে দেখা হবে না। তুমি সোনার

কমল, যেখানে যাবে, আলো কর্‌বে। আমি আর এমন দিদি পাব না—এমন লক্ষ্মী সাথী পাব না। বাবা হারিয়েছি, দিদি তুমিও চলিলে।"

সকল দিকে রোদন। জগদম্বা আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি সুভদ্রার মুখ চুম্বন করিয়া, হলায়ুধপত্নীর পদরজ গ্রহণ করিয়া এবং জগন্নাথকে উদ্দেশে ও উপস্থিত দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। শিবিকা চলিল। কৃতজ্ঞতাসূচক সহস্র কথা বলিয়া সকলকে অনেক আশ্বাস দিয়া হরদেব চলিলেন। সজলনয়নে সকলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া সুধীরঞ্জনও "জয় জগন্নাথ" বলিয়া যাত্রা করিলেন। সমবেত নরনারীগণ সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অদৃশ্য হইলে উৎকলের নরনারীগণ ঘোররোলে রোদন করিয়া উঠিলেন। হলায়ুধপত্নী ও সুভদ্রার রোদন ধ্বনি, সকলের রোদনের শব্দ অপেক্ষা উচ্চতর হইল। সুভদ্রা ও তাহার মাতা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার চিল্কাতটে।

হরদেব, সুধীরঞ্জন ও জগদম্বা আবার চিল্কাতটে পাঠান অনীকিনীর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। সেনানায়ক হোসেন সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন ও সযত্নে তাঁহাদিগকে হরদেবের বস্ত্রাবাসে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগের বিশ্রাম, স্নান ও আহারের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইল। হিন্দু দাসদাসীগণ তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সুধীরঞ্জন সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জানাইলেন। হোসেন, স্নান ভোজনান্তে অপরাহ্ণে সেনাপতির সহিত দেখা হইবে, জানাইলেন।

আগন্তুকগণের পক্ষে পাঠান-শিবির যেন কেমন বিষাদ-কালিমায় কলঙ্কিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পটমণ্ডপে পটমণ্ডপে সৈনিকগণের উচ্চ সঙ্গীত নাই, হাস্যধ্বনি নাই, ক্রীড়া কৌতুকের কোলাহল নাই, খেলাধূলার ধুম নাই, সকলেই যেন কেমন্ বিষণ্ণ। এক সৈনিক ধীর ও গম্ভীরভাবে অন্য সৈনিকের নিকট গমন করিতেছে। প্রহরিগণ চিন্তাকুল ও বিষাদে

গম্ভীরভাবে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। সমর-গায়ক ও বাদকের দল নিস্তব্ধ রহিয়াছে। সৈনিকগণের পরিচ্ছদেও যেন কি বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। ছাউনির মধ্যে মধ্যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে, তাহার প্রতি-শাখায় দলে দলে বায়স আসিয়া উচ্চ ও কর্কশ কণ্ঠে কি বিষাদের ধ্বনি করিতেছে। সুস্বর পক্ষীর কণ্ঠস্বর নাই, কূজনশীল পতত্রীর কূজন নাই। এই কালাপাহাড়শাহী উৎফুল্ল সমরবিজয়ী সৈন্যগণের এ বিষাদ মাখা ভাব কেন? যে ছাউনিতে উল্লাসের তরঙ্গ ছুটিত, সঙ্গীতে আকাশ পূর্ণ হইত, বাদ্যে চিল্কার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইত, হাস্য-রব ভাবুকের ভাবনা ভাঙ্গিয়া দিত, সেই কটকের আজ এ অভাবনীয় দশা কেন?

আগন্তুক হিন্দুগণের স্নান, আহার ও বিশ্রাম হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে অনেক কথা হইয়াছে। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। খরকর দিবাকরের কিরণজাল নিস্তেজ হইয়া আসিল। পরাহ্ণিক বায়ু বহিল। নৈশ পুষ্পের কোরক দেখা দিল। সুধীরঞ্জন ভাবিতে লাগিলেন, কতক্ষণে দাদার সহিত দেখা হইবে, ও কত কি কথা দাদাকে বলিবেন। পাটুলী ছাড়া হইতে চিল্কাতটে দুই ভ্রাতার মিলন পর্য্যন্ত দাদার সকল সুখ দুঃখের কথা শুনিবেন। মুসলমান অত্যাচার ত প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর আছে, তাহা বিদূরিত করিতে দাদা অন্য উপায় স্থির করিলেন না কেন? দাদা কি গূঢ় অভিসন্ধিতে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, ভাল করিয়া শুনিবেন। কোন্ মুসলমানকামিনী দাদার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন ও তিনি দাদার সেবা শুশ্রূষা কিরূপ করেন, জিজ্ঞাসা করিবেন। দাদার অনুতাপ-তুষানলে দগ্ধ জীবনে, দাদার বৈর-নির্য্যাতন-ব্যাধি-বিড়ম্বিত মনে শান্তি দান করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এখন দাদার কর্ত্তব্য ও তাঁহার কর্ত্তব্য বিষয়ে কত পরামর্শ করিবেন। বঙ্গের দুর্গতি কিসে যায়, হিন্দুর শরীরে কিসে শক্তির সঞ্চার হয়, হিন্দু সমাজে কিসে একতা আসে,

হিন্দু সমাজের কুপ্রথা কুরীতি কিসে দূর হয়, হিন্দুর শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের কিসে উন্নতি হয়, এই সব বিষয়ে স্বদেশ-হিতব্রত দাদার পরামর্শ লইবেন। সুধীরঞ্জন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হোসেন নিকটে আসিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে সুধীরঞ্জনকে বসিতে বলিলেন। তিনি বসিলে তাঁহার করে হোসেন একখানা পত্র দিলেন।

পত্র খানি এইঃ—

প্রাণাধিকেষু—

সুধীর! অধীর হইও না। পিতামাতা আমাদের শৈশবেই মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়াছেন। পিসীমাতা আমাদের বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা শেষ করিয়াছেন। আমিও চলিলাম। অনুতাপদগ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তি-তেই সুখ। আমি বঙ্গমাতার কুসন্তান। ব্রাহ্মণজাতির কলঙ্ক! বঙ্গের ত্রাস—হিন্দুর আতঙ্ক। এই ঘোর পাপময় জীবন রাখিয়া সুখ নাই। আমি মরিলাম, তুমি কাঁদিও না। আমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিও না। আমি হিন্দু সাধারণের বৈরী; সেই অরি-ভাবে আমাকে ঘৃণা করিও। সংসারে একা আসিয়াছ, একা যাইবে। নশ্বরজগতে অবিনশ্বর কিছু নাই—যশ কিছুদিন মাত্র থাকে। দেশের কার্য্য করিও। এক যুগান্ত অমর থাকিবে।

আমার আর কিছু বলিবার নাই। যত সত্বর পার দেশে যাইবে। দেশে যাইয়াই জগদম্বাকে বিবাহ করিবে। হরনাথ দাদার নিকট হইতে বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইবে। হরনাথ দাদা গরিব, তাঁহাকে পাটুলীর তালুক হইতে দুইশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দিবে। হোসেনের নিকট যে কৌটাটি পাইবে, তাহা তোমার বিবাহের দিনে জগদম্বাকে দিবে।

আমি ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের যে ক্ষতি করিলাম, তাহা আমার চতুর্দ্দশ পুরুষেও পূরণ করিতে পারিবে না। অনিষ্ট করা যত সহজ,

ইষ্ট করা তত সহজ নহে। রাজপুত প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অন্যান্য হিন্দুর শোণিত এখনও কিছু উষ্ণ আছে। বাঙ্গালীর শোণিতে সে উপকরণ নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কিরূপ ঘোর অত্যাচারে বাঙ্গালী হিন্দু উত্তেজিত হইবে, তাহার পরিমাণ আমি বুঝিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি জগতের চক্ষে নিন্দিত, ইতিহাসের পত্রে ঘৃণিত, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড পিশাচ বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়া জীবনকে ক্লেশ-তুষানলে দগ্ধ করিয়াও যখন হিন্দুতে সজীবতার চিহ্ন পাইলাম না, তখন এই গাঢ় নিদ্রিত জাতি আর কখন জাগ্রত হইবে কি না আমার সন্দেহ। ভাবিয়াছিলাম, ধর্ম্মের আঘাতে বাঙ্গালী ও উড়ে বিশেষ ক্ষেপিবে। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া উড়িষ্যা জয় করিতে আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি উড়িষ্যার বন জঙ্গল পাহাড় পূর্ণ দেশে দক্ষিণ হইতে উড়িয়া ও উত্তরদিক হইতে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইব। ঘোড়ার ডাকে সোলেমান সত্বর সংবাদ পাইবেন। নবাবও অবিলম্বে যুদ্ধে আসিবেন। সমবেত উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার সৈন্যের নিকট বঙ্গেশ্বর পরাস্ত হইবেন! এই আশা যখন সফল হইল না, তখন আর আমার আশা সফল হইবার সম্ভব নাই। বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণের দেবভক্তি দেখ্‌লেতো? যে নূতন সম্পত্তির সনন্দ পাইবে, ঐ সম্পত্তির আয় হইতে কাশীতে একটি ছত্র, নবদ্বীপে কয়েকটি চতুষ্পাঠী এবং বাটীতে একটি চতুষ্পাঠী ও একটি মক্তাব করিবে। পাটুলী হইতে কাটোয়া দিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিবে। কাটোয়ায় কয়েকটি পান্থশালা করিয়া দিবে।

আমার ভ্রাতা বলিয়া সমাজে পরিচয় দিলেও তোমায় লোকে ঘৃণা করিবে। হোসেনকে অবিশ্বাস করিও না। হোসেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তুমি আমায় ঘৃণা করিও না। বিদায়—চির বিদায়। যদি পরকাল থাকে, তবে—তাহাতে আমার বিশ্বাস নাই; থাকিলেও তুমি স্বর্গ ও

আমি নরকে যাইব। শরীর অবসন্ন, বিদায়। ক্ষমা করিবে ইতি সন ৯৭৩ তারিখ ১৪ই কার্ত্তিক।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনিরঞ্জন।

সজলনয়নে পত্রপাঠ সমাপন করিয়া সুধীরঞ্জন হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হোসেন! দাদা কি বেঁচে নাই।"

হোসেন সজলনয়নে উত্তর করিলেন—"তিনি নাই। আপনার ঔষধে তাঁহার, রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে ছিল। তিনি আবার আপনা আপনি এক সুতীক্ষ্ণ শর আত্মহত্যার জন্য আপন বক্ষে বিদ্ধ করেন। উহা ঠিক বক্ষে বিদ্ধ হইলে তাঁহার মৃত্যুর বিলম্ব হইত না—উহা বক্ষের এক পার্শ্বে বিদ্ধ হওয়ায় কিছুকাল থাকিয়া মরেন। শর বক্ষঃপার্শ্ব হইতে বাহির করিতে দেন নাই। তাঁহার শব তদবস্থায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঐ চিল্কা-তটে সমাধিস্থ করা হয়েছে। ঐ যে সমাধিস্তম্ভও নির্ম্মিত হয়েছে। আপনাদিগকে নিরাপদে গৃহে পাঠানর ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন।"

এই কথায় সুধীরঞ্জন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"দাদা গো! তুমি আর নাই? গৃহশূন্য হয়ে, কাজির অত্যাচারে মর্ম্ম পীড়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিদ্যার চেষ্টায় বাহির হইলাম; আর তুমি সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় বাহির হইলে। সে আজ দশ বৎসর। সে শেল আজও হৃদয়ে বিদ্ধ আছে। দাদা! আর তোমার সঙ্গে ভালভাবে দেখা হলো না। আর পাটুলীতে দুই ভাই গেলেম না। আর পাটুলীর বকুলমূলে দেবালয়ে ঘুরলেম না। দাদা! এই তোমার মনে ছিল? তোমার সুধীর যে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। শৈশবে পিতৃহীন হয়েছি, তুমিই পিতার কার্য্য, মাতার কার্য্য, দাদার কার্য্য, বন্ধুর কার্য্য ক'রে আমায়

মানুষ করেছিলে। আমি তোমার পা এক দিনও পূজা করতে পারলেম না। দাদা! যে সুধীর চখের জলে কেঁদেছ, যার মাথা ধরলে অস্থির হয়েছ, যার পীড়ায় পাগল হয়েছ, যে চক্ষের অন্তরালে গেলে ছুটাছুটি করেছ, যে বিদেশে পড়তে গেলে কেবল কেঁদেছ, সে আজ সংসারসাগরে একা। সংসারের দয়ামমতা কি দাদা এইরূপ?"

সুধীরঞ্জন এইরূপে কত কাঁদিলেন। হরদেব জগদম্বাও কাঁদিলেন। সুধীরঞ্জন সমাধিস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া কালাপাহাড়কে দেখিতে চাহিলেন। হোসেন তাহাতে নিষেধ করিলেন। হরদেব, হোসেন ও অন্যান্য সেনানায়কগণ সুধীরঞ্জনকে আশ্বস্ত করিলেন। তাঁহারা ২।১ দিন চিল্কাতটে থাকিয়া হোসেনের বন্দোবস্তঅনুসারে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। তাণ্ডা হইতে প্রেরিত উড়িষ্যায় মুসলমান শাসনকর্ত্তার আগমনের অপেক্ষায় মুসলমানবাহিনী কয়েকদিন চিল্কাতটে থাকিলেন। পাঠান শাসন কর্ত্তা নব সৈন্যদলের সহিত উড়িষ্যায় আসিয়া শাসন ও পালনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, সমরবিজয়ী, মুসলমান অনীকিনী হোসেনের কর্তৃত্বাধীনে তাণ্ডায় যাত্রা করিল।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বনে।

শিষ্য। গুরো! আর একটি কথা।

গুরু। তাইতো বলি, তোমার মায়া বন্ধনও কাটে নাই—বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ জন্মে নাই।

শিষ্য আবার কাতরভাবে বলিল—"কি করিব? মনের দোষ। আমিত ভাবি আপনার প্রদর্শিত ও উপদিষ্ট কাজ করি, মনে নানাকথা এক সঙ্গে উদয় হয়। ধ্যান ধারণায় আর কিছুই হয় না।"

গুরু। তোমার ভোগবাসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাই বলি তুমি আর কিছুদিন সংসারে থাবগে।

শিষ্য। কয়েকটি সংবাদ। ভোগবাসনা আর আমার নাই। তবে স্নেহ মমতার হাত এখনও ছাড়াতে পারি নাই।

গুরু। আচ্ছা বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে?

শিষ্য। আমি আপনার কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তাতটে আমার সেই শিবিরে কেমন করে আপনার দেখা পেলেম?

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

গুরু। একথা তুমি এখন ভাল বুঝ্‌বেনা। আমরা যে যোগ করি, সেই যোগের এমন এক শক্তি আছে, তার বলে আমরা বুঝ্‌তে পারি, আমাদের জন্য কে কোথায় ব্যাকুল হ'লো। তোমার ব্যাকুলতায় আমার মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। তাই আমি তোমার পটমণ্ডপে গিয়ে দেখা কর্‌লেম।

শিষ্য। আচ্ছা আপনি আমার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ সঙ্গে নিলেন কেন?

গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ও সন্ন্যাসীর বেশ দুটা একটা আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমি পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, উড়িষ্যাজয়ের পর তোমার যখন নৈরাশ্য আস্‌বে, যখন দেখ্‌বে জগন্নাথ দগ্ধ করাতেও উৎকলবাসিগণ তেমন উত্তেজিত হ'লো না ও বঙ্গালায় উত্তেজনার চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হ'লো না, তখন তুমি নিশ্চয়ই হতাশ হবে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সময়ে তোমাকে ধর্ম্মপথে আন্‌ব। তুমি বড় অন্যায় করেছ। তুমি তোমার শরীর যোগধর্ম্মগ্রহণে অপটু করে ফেলেছ। তোমাকে সন্ন্যাসিবেশে সেই পটমণ্ডপ হ'তে বের ক'রে দিলাম। বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেম, আহার নিদ্রার ব্যাঘাত কর্‌বে না। তুমি এক বেলা নিরামিষ আতপান্ন ও অপর বেলা ফল মূল আহার কর্‌বে, তুমি কিনা অনাহার অনিদ্রায় শরীরটি মাটি ক'রে রাজমহালে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এসে অজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌লে। এখন তোমাকে বনে রেখে সুস্থ কর্‌তে হচ্ছে।"

শিষ্য। কি কর্‌ব গুরো? শিবির হ'তে যে রাত্রিতে বেরলেম তারপর দিন মধ্যাহ্নকালেই দেখ্‌লেম ফকির সলিমসা বৃক্ষ মূলে যায় যায়। তাকে নিয়ে দুই দিন বসে থাক্‌লেম। ফকির আমায় চিন্‌লেনা, আমি তাকে চিন্‌লেম। দেশের জন্যই ফকির ম'রে গেল। হিন্দু মুসলমানে একতা সাধনই ফকিরের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। জীবের প্রতি অত্যাচার না হয়, এই ফকিরের কর্ম্ম ছিল। ফকির অযোধ্যা অঞ্চল হ'তে আমার

উড়িষ্যা যাত্রার কথা শুনে, অযোধ্যা হ'তে পায়ে হেঁটে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে উড়িষ্যা যাত্রা করে। তার আশা ছিল, সে আমার সঙ্গে মিলিয়া উৎকলিগণের প্রতি অত্যাচার করিতে দিবে না। নরহিতব্রত ও বিশ্বপ্রেমিক ফকির অনাহারে অনিদ্রায় ও অতিশ্রমে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। আমার দোষে ফকির ম'লো। কত লোকই ত মেরেছি। তাহাদের গুণাগুণ জানি না। ফকির প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক ছিল। তার মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করা কি আমার উচিত নয়? ফকির আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, নরজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। এমন সুহৃদ— অকৃত্রিম সুহৃদ আর পাব না। ফকিরের কথা শুন্‌লেই ভাল কর্‌তেম। এই বলিয়া শিষ্য কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরু। কি সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে শীঘ্র বল।

শিষ্য। সুধীর আর কোন সংবাদ রাখেন কি?

গুরু। সুধী বাড়ী গিয়েছে। জগদম্বার সঙ্গে তার বে হয়ে গিয়েছে। সুধী বেশ বিষয় কার্য্য কর্‌ছে। সে চতুষ্পাঠী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। হোসেন সসৈন্যে তাণ্ডায় ফিরে এসেছে। নজিরণ তোমার শোকে বড় অধীর আছে। তোমার পুত্রটি নবাবপুত্র দায়ুদের সঙ্গে চলা ফেরা কর্‌ছে।

পাঠক চিনিয়াছেন, গুরু জ্ঞানানন্দ স্বামী ও শিষ্য কালাপাহাড়। কালাপাহাড় প্রকৃত পক্ষে মরেন নাই। হোসেন কালাপাহাড়ের অকৃত্রিম বন্ধু। কালাপাহাড় স্বীয় পটমণ্ডপ হইতে জ্ঞানানন্দের আদেশক্রমে ও তাঁহার প্রদত্ত বেশগ্রহণে, সন্ন্যাসী সাজিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমান আকার বিশিষ্ট যুদ্ধে আহত পরে মৃত একটি মুসলমানের শব তাঁহার পটমণ্ডপে তাঁহার শয্যায় বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া আসেন। হোসেনকে বলিয়া আসেন, সেই শব সেনাপতির শবপ্রকাশে চিল্কাতটে

সমাধিস্থ করিতে হইবে। সেনাপতি আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছেন, ঘোষণা করিতে হইবে। পথিমধ্যে সেনাপতির সহিত মুমূর্ষু সলিমসার দেখা হইয়াছিল। জগৎপ্রেমিক সলিম সেনাপতির অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কালাপাহাড় অনাহার ও অনিদ্রায় কতদিন পথে কাটাইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়েন। তিনি পথে অশেষ ক্লেশ পাইয়াছেন। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রান্তি ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হইয়া রাজমহালের জঙ্গলের নিকটে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। মৃত সন্ন্যাসী বোধে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। জ্ঞানানন্দ স্বামী নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া নিরঞ্জনের অনুসন্ধানে তথায় তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হন। স্বামীর শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হয়; তাঁহাকে সবল ও সুস্থ করিবার জন্য স্বামী তাঁহাকে রাজমহালের এক পর্ব্বত-গহ্বরে রাখিয়াছেন; নিরঞ্জনের কৃত্রিম জটা শ্মশ্রুর পরিবর্ত্তে এখন প্রকৃত জটা শ্মশ্রু হইয়াছে। স্বামী তাঁহাকে ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত হইতে বলিয়াছেন। তিনিই তাঁহার আহার সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেছেন ও তাঁহার মন পরীক্ষা করিতেছেন। কালাপাহাড় বিশেষ অনুতপ্ত হইলেও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভক্তি এখনও প্রবল হয় নাই।

আমরা যে দিনের কথায় এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন স্বামী পূর্ব্ববর্ণিত কথোপকথনের পরই স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। নিরঞ্জন একাকী পর্ব্বত-গহ্বরে থাকিলেন। পৌষমাসের প্রথমভাগ শীত বিলক্ষণ পড়িয়াছে। নিরঞ্জনকে আগুন করিবার জন্য নিকটস্থ বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইতেছে। তিনি সেই দিন অপরাহ্নে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন; এক উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিয়াছেন ও কাষ্ঠ ভাঙ্গিতেছেন। বনমধ্যে বৃক্ষ তলে দুই জন কাঠুরিয়া আসিল। কাঠুরিয়া

দিগের নাম হলা ও জলা। তাহারা নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল :—

হলা। জলা! শুনেছিস, আমাদের সেই সেনাপতিটা,—যে সকলকে যুদ্ধে হারিয়ে কালাপাহাড় নাম পেয়েছিল,—সে উড়ের দেশে যেয়ে, জগন্নাথকে পুড়িয়ে ক্ষেপে ওঠে। পরে কি বক্তে বক্তে আপনার তরালে আপনি কেটে মরে। দেখ ভাই, হিন্দুর দেবতা আছে কিনা?

জলা। ও কথা আমি কবে শুনেছি। তুই একটা নূতন খবর জানিস? সে দিন তাণ্ডার বাজারে কাঠ বেচ্‌তে গিয়েছিলেম, যা দেখে এলেম, তা মনে কর্‌লে এখনও কান্না পায়। সেনাপতির সেই টুক্ টুকে ছেলেটাকে হাতীতে এমন ক'রে আছড়িয়ে মেরেছে যে, মাথাটা ছুটে গ্যাছে, হাত পাও বুক গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে। শুন্‌লেম নবাব বাড়ীতে কতকগুলি নূতন হাতী এসেছিল। নবাবের ব্যাটা আর সেনাপতির ব্যাটা—সেই টুক্‌টুকে ছেলেটা হাতী দেখ্‌ছিল। একটা নূতন হাতা ছেলেটাকে শুঁড় দিয়ে ধ'রে এমন আছাড় দিয়েছে যে, মাথা ছুটে গ্যাছে, হাত, পা ও বুকের হাড় গুঁড়োগুঁড়ো হয়েছে। নজিরণ বিবি—সেই ছেলেটার মা—সেনাপতি মরে গেলে ত হাসে না, খায় না, কথা বলে না। তিনি ছেলেটাকে হাতীতে ধরেছে শুনে উপর হ'তে তাড়াতাড়ি নাম্‌ছিলেন। মারবল পাথরের টল্ টলে পিছ্‌লে সিঁড়ি, হঠাৎ পা পিছলে উপর হ'তে গড় গড় ক'রে নীচেয় এসে পড়লেন। মাথাটা ফেটে ছাতু ছাতু হয়ে গেল। সেই সবরি কলার রঙের বিবি তখনই মলেন। মা আর বেটাকে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। কত ফুলের মালা, কত সুগন্ধ দ্রব্য ছড়াচ্ছে ও লাসের উপর দিচ্ছে। সেই ছেলেটার ফাটা মাথার গুঁড়ো দেখে আমার গা শিউরে উঠ্‌লো, বুক ফেটে গেল। বিবির মাথাটা দেখলেও ভয় হয়। সকলেই কাঁদ্‌ছে। সকলেই হাহাকার

কচ্ছে। বড় বড় সেনার কর্ত্তা গুলোই বড় কাঁদ্‌ছে। রঙ্গীন নিশেন উড়িয়ে দেছে। যুদ্ধের বাদ্যি বাজাচ্ছে।

কাঠুরিয়ারা এই কথা বলিতে বলিতে বনান্তরে গমন করিল। নিরঞ্জন বৃক্ষ শাখা হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন! কতক্ষণ অচৈতন্ত অবস্থায় থাকিবে.। তাহা কেহ জানে না। বহুক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"আমি কোথায়? আমি সেই পাপ তাপ ও অত্যাচারময় পৃথিবীতে, না নরকদ্বারে? মাথা, বুক, পঞ্জর, হাত ও পা যেন নাই বলিয়া বোধ হচ্ছে। এ সব ক্লেশ কি যম দুতের বন্ধনের ক্লেশ? কে বলে পাপ পুণ্য নাই? কে বলে স্বর্গ নরক নাই? কে বলে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নাই? অপরিণামদর্শী তরলমতি স্বার্থপর অসহিষ্ণু মানব, সামান্ত ক্ষতি বৃদ্ধিতে বিকার প্রাপ্ত হ'য়ে বিশ্বপতিকে উড়িয়ে দিতে চায়! ঈশ্বর ত আছেন! পাপপুণ্য ত আছে! নরক ত আছে! তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? আমার কে আছে? ইহলোকে মুখ দেখাইবার স্থান নাই—সম্মুখে ভীষণ নরক। হায়! হায়! আমি কি করি, কোথায় যাই, কাহাকে ডাকি! হতাশ! হতাশ! ঘোর নৈরাশ্য! ঈশ্বরকে মানি নাই। কখনও তাঁকে ডাকি নাই। পাপে ভয় করি নাই—এমন পাপ নাই যা ক'রতে সঙ্কুচিত হয়েছি। দেবদ্বিজের সর্ব্বনাশ করেছি—গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়েছি। পিশাচ, পিশাচ, আমি ঘোর পিশাচ; দানব, দানব, আমি ভয়ঙ্কর দৈত্য। পাপের ফল হাতে হাতে। যোগমায়া তুমি কোথায় গেলে? প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, শুশ্রূষাময়ী, শান্তিময়ী প্রেয়সী! তুমি কোথায়? পাপীর কর তোমার দিকে প্রসারিত হ'লো—আর তুমি বায়ুতে,—আকাশে,—কোথায় মিলিয়া গেলে। তুমি শান্তিমূর্ত্তি দেবী। তুমি মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি। তুমি পাপীর পাপপ্রভাবে

অত্যাচারে ইহলোকে থাকিবে কেন? তুমি স্বর্গাগত—দেবী—কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া স্বর্গে লুকাইলে।

ঐ যে কাশীর আগুন ধূধূ জ্বলিতেছে। ঐ যে জ্ঞান-বাপীতে নিক্ষিপ্ত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি, কালভৈরবমূর্ত্তিতে আমার প্রতি ভ্রুকুটী করিতেছেন। ঐ যে অন্নপূর্ণার ভগ্নমূর্ত্তি হ'তে স্বয়ং সিংহবাহিনী দশভুজা দশ করে দশ প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক আবির্ভূতা হ'য়ে আমাকে অসুরবধের ন্যায় বধ কর্‌তে আস্‌ছেন। ঐ যে দগ্ধ দ্বিজগ্রামে দ্বিজগণ উত্তপ্ত রক্তবর্ণ অগ্নিমান্ কোশা সকল সদর্পে আমার উপর নিক্ষেপ কর্‌ছেন। মলেম, মলেম—শরীর পুড়ে গেলো। য়্যাঁ, একি! জ্বলন্ত গ্রন্থরাশি হ'তে স্বয়ং শূলহস্তে জ্বলন্ত বৈশ্বানর! আমি যাই কোথা? আমি যাই কোথা? আগুন, আগুন, দাবানল। একি আবার? নবদ্বীপের আগুন! সকল জ্বলন্তগৃহ আমার শিরে ভেঙ্গে পড়্‌ছে, তার উপর দ্বিজ-ললনাগণের লাথি? মলেম, মলেম; বুক ভেঙ্গে গেল, মাথা ভেঙ্গে গেল, হাত পা ভেঙ্গে গেল। এ আবার কি! মেরনা, মেরনা, মেরনা। আমায় জ্বলন্ত জগন্নাথ দিয়ে মার্‌ছ কেন? উৎকলিগণ! তোমাদের পায়ে পড়ি। জগন্নাথ নিমের খেটে, তৈলাক্ত কাষ্ঠের ভীষণ অনল! ওরূপ ক'রে আমার পুড়িওনা।”

এইরূপ কত কি বলিতে বলিতে নিরঞ্জন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। আবার বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন—“বাবা মামুদ আমার নাই! হাস্যময়ী, প্রেমময়ী নজিরণ নাই! বাবা মামুদ! পুত্র মামুদ! আর একবার আয়। তোর চাঁদমুখ একবার দেখি, তুই যে পাষণ্ডের এই জীবনমরুর সুশীতল বট। মামুদ! মামুদ! আয় বাপ! আয়! আয় চাঁদ! আয়! আর ত আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে। আমি বঙ্গের পাপ, কাশীর তাপ, উৎকলের রাক্ষস। আমি হিন্দুর ঘৃণ্য, মুসলমানের অবিশ্বাস্য

ও সম্যক্ ঈর্ষ্যা পাত্র। আমার যে কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই রে বাবা! তোর সরল মনের, অকপট হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাসের পীযূষময় বাবা-ডাক, আমার পাপদগ্ধ শরীরে অমৃতবৃষ্টি! তাও আজ ফুরালো। কলঙ্কী পাপীর সে শান্তিটুকু থাক্‌বে কেন? বাপরে! কি বীভৎস মৃত্যু! আমার সোণার চাঁদকে হাতীতে শুঁড় দিয়ে ধরিল। কি বেগেই বাছাকে আছাড় মারিল! আহা, আহা, আমার বাবা, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ননির পুতুলের মাথা ছুটিয়া গেল। বাপরে! তোর সে চাঁদ মুখ আর দেখ্‌লেম না। তোর সুধাময় ডাক আর শুন্‌লেম না। নিন্দা, গ্লানি ও ঘৃণার রবে যাহার কর্ণ বধির, তাহার কর্ণে সেই সঞ্জীবনী সুধাধারা কেন বর্ষিত হ'বে? প্রেমমূর্ত্তি নজিরণ! পতিহিতব্রতা নজিরণ! নজিরণ, নজিরণ! তুমিও পাপীকে ছাড়িলে? তুমি ত এ পাপীকে ঘৃণা করিতে না? অন্যে ঘৃণা নিন্দা করিলে তুমি ত ক্ষুব্ধ হ'তে। তুমিও কি আজ পাপী বুঝে এ অসতের সংসর্গ ত্যাগ কর্‌লে? যাও, যাও তুমি স্বর্গে যাও। আর শোকতাপসন্তপ্ত মনে ইহলোকে থাকিওনা। তুমি স্বধর্ম্মে আছ, তোমার পাপ নাই। তোমার সরলমনের সরল প্রেম-প্রবাহ যে দিকে গিয়াছে, তুমি সেই দিকেই তোমার প্রেমপ্রবাহ প্রধাবিত করেছ; তোমার পাপ নাই, স্বর্গে যাও। আমার বনে থাকিয়াও এক সুখ ছিল। এক সুন্দর হাস্যময় রম্য হর্ম্ম্যে এক সরলমনা, ঘৃণাবর্জ্জিতা রমণীরত্নের হৃদয়সিংহাসনে আমার আসন আছে। এক শুদ্ধমতি সরলপ্রকৃতি বালকের হৃদয়ে আমি পরমশ্রদ্ধাস্পদ আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছি। হায়, হায়! আজ আমার সেই শান্তির আশা-লতিকারও মূল ছিন্ন হলো। আর রোদন পরিতাপই বা কেন? যেমন কর্ম্ম, তার উপযুক্ত প্রতিফল। গুরু ও ফকিরসাহেব নানা চেষ্টায় আমাকে বঙ্গেশ্বরের দরবারে উচ্চ হইতে উচ্চতর আসনে অধিরোহণ করালেন।

তাঁরা আশা করলেন, এই কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণসন্তান বঙ্গেশ্বরকে করায়ত্ত করতে পারলে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ দূর হবে ; হিন্দু মুসলমানে একতা সাধিত হ'বে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের অশান্তি ক্লেশ দূর হ'বে, আমি তার কি করেছি ? ঘোর অশান্তির আগুন জ্বেলেছি। অনৈক্যের ভগ্ন স্থান প্রশস্ত হইতে প্রশস্তত করেছি ও পৈশাচিক অত্যাচারে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় ঘোর অনর্থ বাধিয়েছি। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, আমার সম্যক্ ভ্রান্তি। উপযুক্ত প্রতিফল। না, না, কিছুতেই ত মনকে বুঝাইতে পারি না। ঐ যে চূর্ণীকৃত মামুদের শব চারিদিকে দেখ্‌ছি। ঐ যে আলুলায়িত-কেশা ভগ্নশিরা, বিরসবদনা, শোকতাপ-বিধূরা নজিরণ মূর্ত্তি সর্ব্বদিকে। অশ্রুময়ী নজিরণ! অশ্রুজল সংবরণ কর, আর সহে না। চূর্ণদেহ মামুদ ! আর ছট্ ফট্ করিস্ না। আর ত্রাহি ত্রাহি করিস্ না। বাবা মামুদ ! ভাল মুখ দেখা—বাবা বল। নজিরণ হাস, হাস, আবার সেইরূপ হাস। বাপ মামুদ ! আমার বুকে আয়। নজিরণ ! এস, তোমার উরুদেশে মাথা দিয়া শয়ন করি। নজিরণ ! এলেনা। বাবা মামুদ ! এলি না। আয় বাবা মামুদ ! আয়। এস প্রেয়সি নজিরণ এস। আর সহে না, সহেনা। মলেম, গেলেম।"

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নিরঞ্জন আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কাশীর পথে।

গুরুদেবের মনের ভাব যে, কি তা বুঝি না। যে যোগ শিখাচ্ছেন, তাই শিখান। যোগেই তন্ময় হ'য়ে থাকি। যোগের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকিবার—শান্তিতে থাকিবার—আর অদ্বিতীয় পদ্ধতি নাই। এ ধন সম্পূর্ণ রূপে পেলে সংসারে আর কিছুইত চাই না। মুনি ঋষিগণ এই সুখের এক চেটে অধিকারী থাকায়, অন্য কোন সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। ঠাকুর কি কচ্ছেন বুঝি না। আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেন মন কাঁচা কর্‌ছেন, কেন আমায় দেখাচ্ছেন, তাঁকে বঞ্চনা কচ্ছেন, এসব রহস্য গুরুদেবই জানেন। গুরুদেব যেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী। তিনি যা ভাব্‌ছেন, তিনি যা কর্‌বেন স্থির করেছেন, তা অবশ্যই আমার পক্ষে কল্যাণকর হ'বে। আমার এত ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মহত্যা কর্‌তে চেষ্টা করি নাই। সে পাপে কেন মর্‌ব? পালাতে গেলেম, ভাঙ্গা স্থান দিয়ে গঙ্গায় পড়ে গেলেম, গঙ্গার জলে ভাস্‌তে, ভাস্‌তে চল্লেম, গুরুদেব যেন আমায় ধরবার জন্য গঙ্গার কূলে, গঙ্গার

জলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমায় ধর্‌লেন, উঠালেন, বাঁচালেন, নৌকায় ক'রে নিয়ে এলেন, তারপরে না সেই পাহাড়ের উপর মার কুটীরে রেখে দিলেন। মা সাক্ষাৎ দয়াময়ী মা। মাও যেন আমায় কি বল্‌বেন বল্‌বেন ক'রে বল্‌ছেন না। যা হ'ক কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মা-জি আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী, গুরুদেব সাক্ষাৎ শিব। এক অশ্বত্থ মূলে এক নবীনা সন্ন্যাসিনী আপন মনে আপনি এইরূপ বলিলেন।

একা একা সেই নবীনা তপস্বিনী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আর চারি পাঁচটি সন্ন্যাসিনী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই কাশীযাত্রী। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন প্রবীনা সন্ন্যাসিনী আছেন। তাঁহাকে সকলেই মা বা মাতাজি বলেন। তাঁহার অধীনেই সকল সন্ন্যাসিনী যাইতেছেন।

এই সময়ে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল। গৃহস্থ পল্লীতে প্রতি ঘরে গৃহিণীগণ আলোক জ্বালিতেছেন, শঙ্খ বাজাইতেছেন ও ধূপের সুরভি গন্ধে গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিতেছেন। দেবালয়ে আরতির আয়োজন হইল। আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইল। আরতির ঘটায় ভক্তগণের স্তবপাঠের ছটায় আগন্তুক সকলের মন শান্তি-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কুলবধূ গৃহকর্ম্ম সারিয়া বসন ভূষণে সাজিয়া কবরী বাঁধিয়া রূপের গর্ব্বে প্রস্ফুটিত গোলাপ সুন্দরীর ন্যায় আপনার বসন, ভূষণ ও বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তনয়কে স্তন্য পান করাইতে বসিলেন। শিশু স্তনের এক বোঁটা মুখে দিয়া অন্য বোঁটা হাতে টিপিয়া কখন গাল পুরিয়া চপ চপ করিয়া মুখ পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতেছে, কখন বা মুখ পুরিয়া দুগ্ধ লইয়া কুলকুচো করিয়া মায়ের মুখে ছড়াইয়া দিয়া, মায়ের রূপের গর্ব্ব নষ্ট করিয়া হাসিয়া দেখাইতেছে, সরল শিশুর মত সুন্দর জগতে আর কি আছে? বালকদল খেলা ভাঙ্গিয়া হাসিয়া নাচিয়া সরল

প্রাণের সরলভাব প্রকাশ করিয়া গৃহে ছুটিতেছে। বালিকাদল ফুলের মালা গাঁথিয়া পরস্পরের ফুলের মালা তুলনা করিয়া হয়ত বিনিময় করিয়া একে অপরের কবরীতে সযত্নে পরাইয়া দিতেছে। পবন শীতল হইয়াছেন। ফুলকুল হাসিয়া উঠিতেছেন। এই সময়ে প্রথম সন্ন্যাসিনী মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ আর কতদূর যাইতে হইবে?"

মা'জি উত্তর করিলেন—"ঐ যে বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছে. ঐ বৃক্ষের অদূরে আজ আমরা থাকৃব।"

আবার সন্ন্যাসিনী দল হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। মাতাজি যে বট-বৃক্ষ দেখাইয়াছিলেন, ঐ বটবৃক্ষ-মূলে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জন কাশী যাইতেছেন। তিনি চিন্তা করিতেছেন—জীবন কি স্বপ্ন! জীবনের কি বিষম পরিবর্ত্তন! এই পথ পরিচিত। এই পথেই পূর্ব্বে কাশী গিয়াছি। তখনকার মনে আর এখনকার মনে স্বর্গ নরক প্রভেদ। তখন মন উৎসাহ, উদ্যম, ও আশায় পূর্ণ ছিল; এক্ষণে মনে উৎসাহ উদ্যমের চিহ্ন মাত্র নাই। জীবন নৈরাশ্যময় মরুভূমি। কি ছিলেম আর কি হলেম! আমিই কি সেই নিরঞ্জন? আমিই কি সেই ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীর অলঙ্কার, নবদ্বীপের ছাত্রমণ্ডলীর শিরোমণি, কাশী-বিজয়ী. বিদ্যাসাগর? আমিই কি সেই সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ শুদ্ধচেতা দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ স্মৃতিভূষণ. ন্যায়ভূষণ, বিদ্যাসাগর? আমিই কি সেই পণ্ডিত হিন্দুবীর যার আশা ছিল গোপনে গোপনে ছাত্রসৈন্যদল গঠন কর্‌ব, বন জঙ্গলে পর্ব্বত গহ্বরে স্বদেশহিতব্রত হিন্দুগণকে সমর কৌশল শিক্ষা দিব ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ কর্‌ব এবং পরে প্রাণপণ যত্নে মুসলমান অত্যাচার হ'তে জন্মভূমির রক্ষা সাধন করব, আমিই কি সেই নিরঞ্জন মল্ল? যার ইচ্ছা ছিল নবদ্বীপ সর্ব্ব-বিদ্যার নিকেতন কর্‌ব—বঙ্গদেশ সর্ব্ববিদ্যার আগার কর্‌ব—বঙ্গদেশের

কৃষিকার্য্যের উন্নতি করব—বঙ্গের শিল্প বাণিজ্যের এতদূর উৎকর্ষ সাধন করব যে সমগ্র সভ্যজগৎ বাঙ্গালীকর-প্রসূত শিল্প দ্রব্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করবে—আমিই কি সেই নিরঞ্জন? না না, আমি সে নয়! গৃহশূন্য অবলাসহায় দীনভাবাপন্ন যে ব্রাহ্মণ,তাঙার দ্বারে দ্বারে সম্পত্তির উদ্ধার মানসে পরিভ্রমণ করিত, এ কি সেই নিরঞ্জন? না, না, আমি সে নিরঞ্জনও নহি। যে মল্লযুদ্ধে অদ্বিতীয় হ'য়ে, তীর চলনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়ে, অসি চালনায় অসাধারণ কৌশল দেখায়ে ও অশ্বারোহী সৈনিকের যুদ্ধে সর্ব্ব প্রথমস্থান অধিকার ক'রে, কালাপাহাড় উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে, বঙ্গেশ্বরের একজন প্রধান সৈনিক হয় আমি কি সেই কালাপাহাড়? না না, আমি কালাপাহাড়ও নহি। দম্ভে মত্ত, অহঙ্কারে স্ফীত, ধর্ম্মে নাস্তিক, পাপে নির্ভীক যে বঙ্গত্রাস, বঙ্গের গ্লানি, হিন্দুর আতঙ্ক, সোলেমানের সেনাপতি, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা কাশী বহ্নিমান ক'রে ক্রন্দনের রোল উঠাইয়াছিল আমি কি সেই বঙ্গেশ্বরের দাম্ভিক সেনাপতি। না, তাই বা কৈ? স্বপ্ন—স্বপ্নের পর স্বপ্ন। মায়ার জগতে, সব স্বপ্নের খেলা। অনুতাপে দগ্ধ, শোকে অধীর, নৈরাশ্যে পাগল, ক্ষোভ ও মনস্তাপে বুদ্ধিহীন সন্ন্যাসীর ভেকধারী আমি এক পর্য্যটক। স্ত্রী-ঘাতক, পুত্র-ঘাতক, ভ্রাতৃ পরিত্যক্ত, সমাজ-বিতাড়িত আমি একজন যোগ-ভ্রষ্ট। বা! আমি এ হ'ব কেন? অনুতাপের স্নিগ্ধ সলিলে সকল শোক,তাপ ও পাপ বিধৌত হওয়ায় এখন শান্তির সেবক যোগানুরাগী আমি একজন সন্ন্যাসী। না, আমার যোগসন্ন্যাস কোথায়? সর্ব্বদা মামুদের শোকে, নজিরণের বিচ্ছেদে, যোগমায়ার চিন্তায়,ভ্রাতার শুভাকাঙ্ক্ষায়, স্বদেশের দুঃখভাবনায় যে আমি ব্যাকুল ও উন্মত্ত হচ্ছি, সে আমি কি যোগী? যে শয়নে স্বপ্নে পূর্ব্বকৃত পাপের বীভৎস দৃশ্য দেখছে, কল্পনায় নরক কুণ্ডে পড়ছে, হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ করছে, সে আবার আর যোগ সন্ন্যাস কোথায়? আবার আশা—

আবার দুরাশা। গুরুকে জিজ্ঞাসা করি—'যোগমায়া কি আছে?' 'তিনি বলেন—কাশীতে অভিষেকের দিনে তার সঙ্গে দেখা হবে।' ভাঙ্গাবুক আবার সেই আশায় বাঁধি। আবার মিলন-সুখের বাসরঘর সাজাই। শোক, তাপ, অনুতাপ, কলঙ্ক, গ্লানি দূরে ঠেলিয়া ফেলি। ছি! ছি! আমার আবার যোগ সন্ন্যাস!

পাঠক চিনিয়াছেন, প্রথম সন্ন্যাসিনী যোগমায়া ও দ্বিতীয় সন্ন্যাসী স্বয়ং নিরঞ্জন। যোগমায়ার তাণ্ডা হ'তে পলায়নের পর যাহা ঘটে তাহা যোগমায়ার মুখেই জ্ঞাত হইয়াছেন। যোগমায়া ও নিরঞ্জনের গুরু জ্ঞানানন্দ স্বামী। সেই অজ্ঞান অবস্থা হইতে স্বামীর যত্নেই নিরঞ্জনের সংজ্ঞালাভ হইয়াছে। স্বামী নিরঞ্জনকে যোগধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য কাশী লইয়া যাইতেছেন। কাশীতে নিরঞ্জনের যোগাভিষেক হইবে। এক সঙ্গে মাতাজির অধীনে যোগমায়া প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীদল এবং স্বামীর অধীনে নিরঞ্জন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি কাশী যাইতেছেন। স্বামীর এরূপ বন্দোবস্ত যে, যোগমায়া নিরঞ্জনকে দেখিতে পান, কিন্তু নিরঞ্জন যোগমায়াকে দেখিতে পান না। মাতাজির দল পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও স্বামীর দল অগ্রে অগ্রে এক পথেই যাইতেছেন।

মাতাজির কার্য্যের সংক্ষেপে পরিচয় আবশ্যক। মাতাজি জ্ঞানানন্দ স্বামীর পত্নী নহেন। জ্ঞানানন্দও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। জ্ঞানানন্দ স্বামী যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই দল আছেন। স্ত্রী সন্ন্যাসিনীর দল মাতাজি আখ্যাধারিণী প্রবীণা সন্ন্যাসিনীর তত্ত্বাবধানে থাকেন ও পুরুষ সন্ন্যাসীর দল স্বামীর অধীনে থাকেন। দুই দল এক সঙ্গে থাকেন না। স্বামীর উদ্দেশ্যও নরহিত-সাধন; মাতাজির কার্য্যও নারীহিত সাধন। যে মাতাজির তত্ত্বাবধানে যোগমায়া আছেন, তিনি কিছুদিন রাজমহালের শৈলমালার মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া, মমতা ও বাৎসল্য অসীম ও তাঁহার কথা পীযূষ ভাণ্ডার। যোগমায়া মাতাজির নিকট প্রকৃত মাতৃবাৎসল্য পাইতেছেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অভিষেকে।

সম্মুখে পূণ্যভূমি বারাণসী ; ঐ বিশ্বেশ্বরের রজতমণ্ডিত মন্দিরের শীর্ষস্থিত ধ্বজা উড্ডীন হইতেছে ; ঐ অন্নপূর্ণা-মন্দিরের উচ্চতর শিখরে রক্তপদ্ম-ধ্বজা পত্ পত্ করিতেছে। ঐ ভাগীরথীর জলকল্লোল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। জাহ্নবী পূর্ব্বদক্ষিণগামিনী, কিন্তু এই পবিত্র তীর্থে পূতভোয়া সুরধুনী দেবদেবীগণের উপাসনার জন্য যেন উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঐ বিশ্বেশ্বরের আরতির শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। জ্ঞানানন্দ স্বামী কাশীর পরপারে শিষ্যগণের সহিত উপনীত হইলেন। স্বামীর শিষ্যগণের পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, যাঁহাদের জীবন জগতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, যাঁহাদের জাতিধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগের সহিত পাপী, তাপী ও পাড়িত কত রকমেরই লোক থাকে। তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়-উৎস হইতে যে জীবহিতব্রত-সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলে দেখে না, শুনে না,

অথচ কত নির্জ্জন স্থান পবিত্র করে। এই সকল পবিত্রাত্মা সাধু পুরুষগণ নামের প্রার্থী নহেন, যশের আকাঙ্ক্ষী নহেন, সুখের অভিলাষী নহেন ও সম্পদের উপভোগী নহেন। তাঁহাদিগের নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, শান্তিময় ও সুখময় জীবন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতার সহিত কত কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, অথচ তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। মাতাজির জীবনও সেইরূপ।

কাশীর গঙ্গা-মধ্যস্থ সোপানাবলী, মন্দির সমূহ, অট্টালিকানিচয় ও কাশীপদ-চারিণী স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা দেখিয়া নিরঞ্জন বলিতে লাগিলেন— "গুরো! আমি কাশী যাব না। আমি আর কাশীর পুণ্যক্ষেত্রে পদ বিক্ষেপ করব না। কাশীর দৃশ্য দেখেই আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, মন অস্থির হচ্ছে এবং স্মৃতি আমার মর্ম্মে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন কচ্ছে। আমি কোন্ মুখে কোন্ প্রাণে অন্নপূর্ণার দ্বারে ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করব? আমি ঘোর পাপী—বিষম কলঙ্কী মুসলমান। এই ধন-শ্রী-সমৃদ্ধি সম্পন্ন, অট্টালিকামালায় সুশোভমানা নানাশিল্পকর্ম্মসম্পন্না, নানাশিক্ষা-গারসমন্বিতা বারাণসী না আমি পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিলাম? বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভেঙ্গেছি, অন্নপূর্ণাকে মন্দির সহ চূর্ণ করেছি, সঙ্কটার সর্ব্বনাশ সেধেছি, কালভৈরবের পক্ষে আমিই কাল হয়েছি, তিল-ভাণ্ডেশ্বরের মাথায় পদাঘাত করেছি, কেদারেশ্বরকে উৎপাটন করেছি ও দুর্গা বাড়ী ও দুর্গার দুর্গতির একশেষ করেছি। বিদ্যাগার সকল পুড়িয়েছি; গ্রন্থ সকল ভস্মসাৎ করেছি। এই কাশীতে না আমি ছাত্র ছিলেম? আমারই গুরুর চতুষ্পাঠী ও গ্রন্থালয় কি ছেড়েছি? কৃতঘ্ন! কৃতঘ্ন! পাষণ্ড! পিশাচ! অসুর! রাক্ষস! আমি মায়ের কুপুত্র, দেশের কুসন্তান, স্বদেশ ও স্বজাতির কলঙ্ক, পরিচিত জনের বৈরী ও আশ্রয়-প্রাপ্ত স্থানের মহাশত্রু। লোকের কাহারও এক পাপ থাকে, কাহারও দুই পাপ

থাকে ; আমি সকল পাপে পাপী। অনুতাপ, অনুতাপ তুষানল! কোথায় শিক্ষাগার কাশীর নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর উদ্দেশে প্রণত হইয়া কল্যাণ সাধন করব, তাই না অগ্নিময় জ্বালায় কাশীর ধ্বংস সাধন করেছি। উঃ! কি যন্ত্রণা। কি যাতনা! এই পবিত্র তীর্থ আমি অগ্নি জ্বালায় জ্বালাতন করে—গোরক্তে প্লাবিত করেছিলেম, গোমাংসে সর্ব্বত্র পূর্ণ করেছিলেম, গোমুণ্ড দেবদেবীর আসনে রেখেছিলেম ও আল্লা আল্লা রবে কাশী কম্পিত করেছিলেম। না না এ নাস্তিক পাষণ্ড, এ গোঘাতী ও গোখাদক রাক্ষস কিছুতেই কাশীতে যেতে পার্‌বে না। কোন মুখে যাবে? বিশ্বেশ্বর কি তাঁহার অভয় পদে এই ভীত পিশাচকে আশ্রয় দিবেন? দয়াময়ী মা অন্নপূর্ণা তাঁহার করুণাকণা দানে এই অসুরকে কি উদ্ধার কর্‌বেন? কাশীর অন্যান্য দেবগণ কি এ পাষণ্ডাদপি পাষণ্ডের প্রতি ফিরে চাইবেন? না না, আমি যেন দেখ্‌ছি, ভৈরব কালভৈরব মূর্ত্তিতে চখে আগুন ও হাতে শূল লয়ে আমার দিকে আসছেন। মা সিংহবাহিনীরও ত্রিনয়নের ঊর্দ্ধ্ব নয়নে অনলশিখা, করে কৃপাণ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গার জাটা, গদা ধনু কিনা? ঐ যে চখের আগুন আমায় পোড়াতে এলো। ঐ যে কোন অস্ত্র আমার গায়ে পড়্‌ছে, কোন অস্ত্র আমার মাথায় পড়্‌ছে ও কোন প্রহরণ আমার সম্মুখে ঘুর্‌ছে।'

জ্ঞানানন্দ স্বামী গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিল কালাপাহাড়ের চক্ষে ও মুখে সেচন করিলেন ও বুকে দুই চপেটাঘাত করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"বাবা! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হয়ে বসো। কোন ভয় নাই। কল্য তোমার পূর্ণাভিষেকের দিন। কল্য তুমি যোগরাজ্যে অভিষিক্ত হ'বে। এ রাজ্যে অনেকেই একাকী অভিষিক্ত হ'য়ে থাকেন। তুমি স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে অভিষিক্ত হ'বে, সুতরাং তোমার অভিষেককে পূর্ণাভিষেক

বলা যায়। কল্য মা যোগমায়ার সহিত তুমি মিলিত হ'বে। যোগরাজ্যে তোমরা রাজারাণী হ'বে, তাই তোমাদের অভিষেক পূর্ণাভিষেক। এরাজ্যে জাতিবর্ণ ভেদ নাই, এরাজ্য জাতি ও বর্ণ ভেদের ক্ষুদ্রাশয়তা, কুরীতি ও কুপ্রথার নিকৃষ্টতা, খাদ্যভেদে জাতিপাতের নীচাশয়তা প্রভৃতি হইতে অনেক উচ্চে। বাবা! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। শম্ভু শক্তিকে কেশাকর্ষণে ঝুলিয়েছিল। প্রত্যেক অসুর প্রত্যেক শক্তির বৈরী। রাবণ রামরূপী নারায়ণের দারাপহারক। তাই বলিয়া তাহারা কি মুক্তি পায় নাই? এ সব আখ্যায়িকার মূলে কিছু থাকুক বা না থাকুক, আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যাচ্ছে। শক্তির সুব্যবহার সকলে করতে পারে না। শক্তিমানই পূজ্য। শক্তির অপব্যবহার নিন্দনীয় বটে, তাই বলিয়া শক্তিধর ক্ষমার অযোগ্য নহে। শম্ভু যদি স্বয়ং আদ্যাশক্তির কেশাকর্ষণে ঘুরিয়ে মুক্তি পেয়ে থাকেন, তবে তুমি ভক্তির উদ্রেকার্থ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি অথবা কর্ম্মশিক্ষার চিহ্ন গুঁড়ো করেছ ব'লে কি তোমার ক্ষমা হবে না? যে সকল মূর্ত্তি তুমি ভেঙ্গেছ সে সকল কি দেবদেবী? সেগুলিত কেবল ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠানের উপকরণ, ভক্তিযোগ-উদ্দীপনের বহু উপায়ের এক উপায় ও জ্ঞানযোগের পথে দাঁড়াইবার সামান্য সম্বল। সাধারণ লোকাচরিত ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। তোমাকে আমি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ কিছুই দেই নাই। কেবল তোমার মনোবৃত্তি সংযত করবার চেষ্টা পেয়েছি মাত্র। কেবল ধ্যানধারণায় তোমার মনকে সংযত করছি। প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার ও ধর্ম্মোপদেশের সময় এখনও হয় নাই। বাবা! চল কাশীতে চল।

অনন্তর তরণী-যোগে সশিষ্য জ্ঞানানন্দ স্বামী জাহ্নবী পার হইলেন। সে রাত্রিতে তাঁহারা নিদ্রা গেলেন না। দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া জ্ঞানানন্দ শিষ্যদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। মাতাজিও অপর

তরণীতে শিষ্যাগণের সহিত ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া মণিকর্ণিকায় বসিয়া শিষ্যাদিগকে নানা উপদেশ দান করিলেন। যোগমায়া মাতাজির নিকট যে কথা শুনিবেন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন, অন্য সে কথা শুনিলেন। মাতাজি যোগমায়াকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন—যোগরাজ্যে, উচ্চ ধর্ম্মে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ নাই ও জাতিবর্ণের ভেদাভেদ নিন্দিত ও ঘৃণিত। নিরঞ্জনের সহিত যোগমায়ার এক সঙ্গে যোগ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কোনই দোষ হইবে না। একস্থানে যোগমায়া মাতাজির কথা ও অন্য-স্থানে নিরঞ্জন স্বামীর কথা নীরবে শ্রবণ করিলেন।

উষা আসিল। লোহিতরাগরঞ্জিত অরুণদেব তপনবিরহবিধুরা ধরিত্রীকে হাসাইবার জন্য পূর্ব্বগগনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমানিনী ধরণী প্রফুল্ল হইলেন বটে কিন্তু হাস্য করিলেন না। অরুণ যেন সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। বায়ু হিল্লোলসহকারে মেদিনীর পুষ্পাভরণ ও পত্রবাস দোলাইতে লাগিলেন। তাঁহার কুন্তল স্বরূপ ব্রততীপুঞ্জ ও লোমস্বরূপ ঈষিকা, কুশ, দূর্ব্বাদল সমূহ নাড়িতে লাগিলেন। বসুধার অবগুণ্ঠন স্বরূপ তুষার ধবল মেঘমালা সরাইতে লাগিলেন। বন্দি-স্বরূপে বিহগকুল অরুণের পক্ষে ধরার যশোগীত গাইতে লাগিল। অবনি ক্রমেই হর্ষের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া গৈরিকবসন পরিধান পূর্ব্বক পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া যোগমায়া দণ্ডায়মানা হইলেন। অপরঘাটে নিরঞ্জনও স্নান করিয়া ঐরূপ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে মাতাজি যোগমায়ার হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে নিরঞ্জনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানানন্দ স্বামী তাঁহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেলেন। নিরঞ্জন যোগমায়ার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। স্বামী অঙ্গুলীনির্দ্দেশে দেখাইলেন, এই তোমার যোগমায়া

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

নিরঞ্জন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যোগমায়ার হস্ত ধারণ করিতে গেলেন ও বলিলেন—"মায়া! মায়া তুমি আছ? তোমার হৃদয় এত কঠিন! স্নেহ-মধুর আধারচক্র এত কঠিন! মায়া! তুমি আমায় ছেড়ে থাক্‌লে? আমায় ছেড়ে পলালে? তুমি দেবী না মানুষী? তোমার ভক্তি প্রেম কি দৈবী খেলা, না মানবীর সত্য সত্য করণীয় কর্ম্ম? এ জীবনস্বপ্নে এই মায়াময় সংসারে প্রকৃত বস্তু কি, মায়া কি, কিছুই বুঝিতে পারি না। এ সংসার ভেল্‌কির—যাদুর আগার বলে বোধ হচ্ছে।"

যোগমায়া কম্পিতকণ্ঠে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"নাথ! প্রাণনাথ! ক্ষমা কর্‌বেন। আমি বড় অন্যায় করেছি। বড় জ্বালাও দিয়েছি। আমার পা—পাপে-র প্রা-য়-শ্চিত্ত-না-ই। আ-মি-অব-লা—জ্ঞা-ন-বু-দ্ধি-হী-না-না————"

আর যোগমায়ায় কথা সরিল না। তাঁহার বাক্যে জড়তা হইল। তিনি কম্পিত-কলেবরে বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূতল-শায়িনী হইলেন। স্বামী ও মাতাজি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শিষ্য শিষ্যাগণও শুশ্রূষায় রত হইল। নিরঞ্জন যোগমায়ার মস্তকের নিকটে বসিয়া তাঁহার মস্তক আপন ঊরুতে স্থাপন করিলেন। যোগমায়া একবার মাত্র নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিলেন। হস্ত পদ অসাড় হইয়া আসিল। বুকটা একটু নড়িয়া,—মুখটা একটু কাঁপিয়া—মুখের একটু বিকৃতভাব হইয়া যোগমায়ার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িল। শুশ্রূষায় কোন ফল হইল না। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। নিরঞ্জন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! তাঁহার রক্তবর্ণ বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় স্থির—পলকরহিত!

মাতাজি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন——"আজ আমি একটি রমণীরত্ন হারালেম। আজ আমি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী পতিভক্তিকে মণিকর্ণিকায় বিসর্জ্জন দিলাম। আজ সাক্ষাৎ নারীরূপে সনাতনধর্ম্ম বিশ্বাস, পবিত্র

বিশ্বাস—এস্থলে বিসর্জ্জন দিতে আনিয়াছিলাম। স্বামীজি ও আমার উভয়েরই ভুল হয়েছে।

জ্ঞানানন্দ স্বামীও বিষাদে কম্পিতস্বরে বলিলেন—"যোগমায়া সাক্ষাৎ দেবী। ভক্তির মূর্ত্তি। সাক্ষাৎ নারীধর্ম্ম। প্রকৃত নির্ব্বাক রমণীরত্ন। প্রকৃত আনুগত্যের অমূল্য নিধি। তাঁহার হৃদয় বুঝি নাই, মন পরীক্ষা করি নাই। তাঁহার অগাধ অতলস্পর্শ ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিমাণ বুঝি নাই। আমাদের বড় ভ্রম হইয়াছে। ভ্রান্তি না হইলে ত শিব হইতাম। কেহ ভ্রমে একটা মারে। কেহ ভ্রমে শত শত জীব নষ্ট করে। এইস্থলেই ত মানবত্বে দেবত্বে প্রভেদ। এ ভ্রমের অনুতাপ রাখিবার স্থান নাই।"

কালাপাহাড় বেগে যোগমায়ার মস্তক ভূতলে ফেলিয়া দিয়া লম্ফ প্রদানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমিইত রাজা হরিশ্চন্দ্র! এই মণিকর্ণিকায় একবার আমার ধর্ম্ম পরীক্ষা করেছিলে। আমার শৈব্যা গিয়েছিল—আমার রোহিতাশ্ব গিয়াছিল—আমি ডুঁদোর গোলাম হয়ে ছিলেম।" এবার গেল আমার শৈব্যা। রাজমহিষী শৈব্যা! তুমি গেলে? তুমি মলে? তুমি একেবারে গেলে? না-না, এত শৈব্যা নয়। এ যে আমার অনন্তদুঃখিনী যোগমায়া। এ যে আমার প্রেমপুত্তলি যোগমায়া। এরূপ পতিহিতে রত আর কে? নিজের খাওয়া নাই, পরা নাই, সুখের কামনা নাই, পতিই সর্ব্বস্বধন। ঐ নজিরণ, এই আমি, স্থান কালীমন্দির—তুমি না এই মূর্ত্তিমতী দয়াবেশে তথায় প্রবেশ করেছিলে? তখনও আমার আশা ছিল। আজ আমার কিছু নাই,—কিছু নাই যোগমায়া! কিছুই নাই। আজ নিন্দা, কলঙ্ক, গ্লানি, অপমান, হতাদর, নৈরাশ্য অনুতাপ ও আত্মগ্লানি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই। কালীমন্দিরের সামান্য বিপদে উদ্ধার করলে, সম্মুখে নরক, অসীম নরক, এনরকে আমাকে উদ্ধার করবে না?

তুমি ধর্ম্মপত্নী, তুমি পরামর্শদাত্রী তুমি সঙ্গিনী, তুমি সহায়, ও তুমি সম্বল। এই হিন্দু-সমাজ-পরিত্যক্ত, এই মুসলমান-সমাজ-ঘৃণিত, সমস্ত জগতে নিন্দিত, এই ভ্রান্তিপূর্ণ, অসহায় পাষণ্ডকে ফেলে মায়া তুমি চলে গেলে? এই কি তোমার পতিভক্তি? হায় হায়! হায়! আমি বড় কষ্ট দিয়েছি! আমি বড় কষ্ট দিয়েছি! সতী মুখ ফুটে কথা বলে নাই—পতি-প্রাণার পতিভক্তির প্রগাঢ়তা আমি বুঝিনাই। আমি তার সরল প্রাণে বড় ব্যথা দিয়েছি! বড় ব্যথা দিয়েছি! যার পতি মুসলমান, দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, তার হৃদয়ে এ কি আগুন! যাও মায়া, তুমি যাও। সেই নিত্যধামের অনন্ত সুখের অধিকারিণী হও। পাপী ইহলোকে পাপ-তাপে দগ্ধ হউক।

হো—হো—হো—শৈব্যা উঠ্‌লে না? তুমি ব্রাহ্মণের দাসী, ব্রাহ্মণ তোমায় বড় মেরেছে। আমার দশা দেখ—ধর্ম্মের কঠোর পরীক্ষা! আমি ডুঁদোর দাস, আমার অশন নাই, বসন নাই, মাথায় তৈল নাই—আমি মুদ্দফরাস-বৃত্তি অবলম্বনে এই মহাশ্মশানে বসে আছি না, না, না, আমি মুসলমান সেনাপতি। আমার হস্তী, অশ্ব কত! কত সৈন্য দল! আমি বঙ্গ বেহার ও উড়িষ্যা বিজেতা। আগুন জ্বালব, গ্রামের পর গ্রাম পোড়াব, দেবদেবী পোড়াব, রাশি রাশি গ্রন্থ পোড়াব—এই দেশে প্রলয় কালের প্রলয় ঝটিকার ন্যায় মহা হুল স্থূল ব্যাপার ঘটাব আমি কালাপাহাড় দৈত্য—আমি শুম্ভ দৈত্য! আমি শক্তির কেশাকর্ষণ ক'রে ঊর্দ্ধাকাশে ষষ্টি সহস্র বৎসর ঘুরাব! আমি হিমালয়কে বঙ্গোপসাগরে ফেলব! আর বঙ্গোপসাগরের উচ্ছ্বসিত জলে এদেশ প্লাবিত করব! জাগাব, জাগাব, নিস্তেজ হিন্দুকে জাগাব, হিন্দু মুসলমানে ঘোর সমর বাধিয়ে দিব! আমি বগোল বাজায়ে মজা দেখব। ভারত একছত্রা হিন্দু রাজার অধীন হ'বে—বড়ছাতা উঠ্‌বে, বড় চামর দুল্‌বে—আর দুর্গা দুর্গা

কালী কালী ব'লে হিন্দু সেনা যুদ্ধে বেরবে—এই আমার অশ্বমেধ। আবার রাজসূয়! আবার রথীরথীতে যুদ্ধ—গদাযুদ্ধ। আবার রাম রাজা, রাবণ বধ, কংশ বধ, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। দেখ গো, সকলে দেখ, আমি ভীম হয়েছি। এই যে আমার গদা! ঐ যে আমার দাদা। আর আমি মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারিনে। যুদ্ধের বাদ্য বাজ্‌ছে। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজ্‌ছে। অর্জ্জুন একা যুদ্ধক্ষেত্রেঅন্য দিকে ভীষ্ম,দ্রোণ,কর্ণ প্রভৃতি সেজে এসেছেন। আমি গদা নিয়ে যেয়ে যুদ্ধে পড়ি; আর দুর্য্যোধনের মাথাটা চূর্ণ করি।"

এই বলিয়া কালাপাহাড় দ্রুত বেগে দৌড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। যোগমায়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইল। জ্ঞানানন্দ স্বামী শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া, তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য নিজে নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়া, কোথায় প্রস্থান করিলেন। মাতাজিও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত আশ্রমে যাইয়া শিষ্যাগণকে স্ব স্ব ইচ্ছামত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া একদিন অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন! স্বামী জ্ঞানানন্দ ও মাতাজিকে আর লোকসমাজে দেখা যায় নাই। জ্ঞানানন্দ যাইবার কালে একটি মাত্র কথা বলিয়া গিয়াছিলেন—"ধর্ম্মের পথ বড় বিপদ সঙ্কুল; ইহার পদে পদে ভ্রান্তি।" মাতাজিও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

পাঠককে অনেক বিরক্ত করিয়াছি। এক কথার কত বার পুনরুক্তি করিয়াছি। এখন আর দুই একটি কথার অবতারণা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইব।

যোগমায়ার মৃত্যুর পর হইতে কাশী সহরে মধ্যে মধ্যে এক পাগল আসিত। তাহার আসিবার কালাকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে, সায়ং সময়ে ও নিশীথ সময়ে কাশী সহরে আসিয়া বিষম চীৎকার করিত। সে কখন চীৎকার করিয়া বলিত—"আমার রাজ্য দেও, যান বাহন দেও, আমার মাতঙ্গ তুরঙ্গ দেও, আমার রাজমহিষী ও রাজ-পুত্র দেও, আমি আবার অযোধ্যায় রাজা হ'ব।" সে কখন চীৎকার করিয়া বলিত—"পালাও, পালাও কালাপাহাড় এলো! কাশী—পোড়াবে, গ্রন্থ পোড়াবে, দেবদেবী ভাঙ্‌বে, হুলস্থূল বাধাবে। ভীষণ দানব, ভয়ানক রাক্ষস।" কখনও বলিত—"আমি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্র। আমি সীতা-বিরহে নিতান্ত অনুতপ্ত। আমার অশ্বমেধ হলো না। প্রেয়সী সীতা কোথায়? কোন বনে লুকাইল?" পাগল কখনও, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিত—"ওরে আমার নজিরণ নাই, মামুদ নাই, গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে মরেছে। আমার ননীর পুতুল গ্যাছে। আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা

হায়! হায়! হায়! আমার শেষ আশা যোগমায়াও নাই। প'লো আর ম'লো। হাত বাড়ালেম্, আর মলো। পাপীর করস্পর্শ-ভয়ে সতী পালালো! অমন নারী কি হয় গা? তেমন স্ত্রী পেলে, চাই না অযোধ্যা রাজ্য, চাই না বঙ্গ রাজ্য, চাই না ভারত সাম্রাজ্য; বৃক্ষমূলে ভগ্ন কুটীরে আমি তাকে লয়ে পরম সুখে বাস কর্‌তে পারি। সে আঁধার ঘরের আলোক, সে অশান্তির শান্তি, সে নৈরাশ্যে আশা। এ কলঙ্কী পাষণ্ডের ভাগ্যে সে অমূল্যনিধি লাভ হবে কেন?" কখন বা চীৎকার করিয়া বলিত—"আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান গো, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। কাশীর হরদেব-ন্যায়রত্নের ছাত্র। কাশীর বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর অন্তেবাসী। আমি বেদ, দর্শন, সাহিত্য ও অলঙ্কার সব জানি।" কখন বা সুললিত স্বরে সামগান করিত ও কখন উচ্চরবে নামাজ পড়িত। তাহাকে যে খাইতে দিত, তাহার প্রদত্ত আহারই পরম আগ্রহের সহিত আহার করিত। কখনও কাহাকেও কিছু বলিত না। ছোট বালক বালিকা পাইলে সযত্নে কোলে করিত। বাতুল গঙ্গায় পড়িয়া সাঁতারাইত। সে কাহারও নিকট কিছু চাহিত না। কেহ কোন খাদ্য সামগ্রী দিলে যাহা পারিত, তাহা খাইত; আর সব ফেলিয়া দিত। এক বস্ত্রের বেশী পরিত না। কেহ তাহাকে অধিকবস্ত্রাদি দিলে তাহা ফেলিয়া দিত। সে কোথায় থাকিত, তাহা কেহ জানিত না; অথবা তাহার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। কাশীর লোকে তাহাকে হরে পাগলা বলিত। কেহ বলিত, সে একজন পরম সাধু। কেহ বলিত, সে একজন পাগলের ভাণকারী মুসলমান দূত। তাহাকে কত জনেই কত কি বলিত, কিন্তু তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। শুনা যায়, হরে পাগলা অনেকের অনেক উপকারও করিয়াছে।

নবদ্বীপ অঞ্চলের সুধীরঞ্জন নামক এক ব্যক্তি একবার কাশীতে

আসিয়া দ্বাদশটি শিব ও একটি সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সত্রের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অনেক টাকা কাশীর এক পাণ্ডার হস্তে অর্পণ করিয়া যান! সেই টাকা এক ধনী মহাজনের কারবারে খাটিত ও তাহার সুদ হইতে শিবসেবা ও সত্রের ব্যয় চলিত। সেই শিব ও সত্র প্রতিষ্ঠার দিন হরে পাগলাকে একবার কাশীতে স্থিরভাবে ভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছিল। তৎপরে তাহাকে বা তাহার মৃতদেহ কাশীর কোথাও লক্ষিত হয় নাই। আমাদের কেলো অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বংশ এখনও রাঢ় অঞ্চলে আছে। শুনিতে পাই কৃষ্ণচন্দ্র ও বিন্ধ্যা সুখসচ্ছন্দে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। সোলেমান ও দায়ুদের পরিণাম, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। হোসেন সেনাপতি কালাপাহাড়ের শাসনে বৈর-নির্য্যাতন করিতে পারেন নাই। দায়ুদের সময়ে মোগল পক্ষের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ও গোপনে চরের কার্য্য করিয়া দায়ুদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ছবিরণের ও জিজিরণের বিষয়ে আমরা আর কিছু অবগত নহি। পাটুলী অঞ্চলে যে রায় বংশ আছেন, তাঁহারা নিরঞ্জনের জ্ঞাতি বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন না এবং বর্দ্ধমানের মজুমদার বংশ কালাপাহাড়ের মাতামহ বংশ বলিয়া পরিচয় দেন না। কালাপাহাড়ের দুরপনেয় কলঙ্কই বোধ হয় এরূপ করিবার কারণ।